আমরা কোন্ পথে ?

(প্রথম ভাগ)

ঢাকা, সাধনা ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ—ভাগলপুর কলেজের,
রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী,
এম্-এ, এফ্-সি-এস্ (লণ্ডন), এম্-সি-এস্ (আমেরিকা)
কর্ত্তৃক প্রণীত

মূল্য আড়াই টাকা মাত্র

ঢাকা, সাধনা ঔষধালয় হইতে—
শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সেন গুপ্ত
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ

ঢাকা, উয়ারী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
প্রিণ্টার—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত

১৯৪০

নিবেদন—

পুস্তকে সন্নিবদ্ধ প্রবন্ধগুলি [illegible] বর্ষ ব্যাপিয়া—যুগান্তর, নবশক্তি, সাহানা, সঞ্জীবনী, স্বদেশ, স্বাস্থ্যসমাচার, [illegible]ণিক, আয়ুর্ব্বিজ্ঞান সম্মিলনী, সৎসঙ্গী, সোনার বাংলা, শান্তি প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধগুলিই এক্ষণে—"আমরা কোন্ পথে?"—নামকরণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা হইল।

প্রবন্ধগুলির একটি অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। উহাদের একটি অখণ্ড রূপ আছে। সেই অখণ্ড রূপের সহিত পরিচয় লাভের সুবিধার্থে প্রবন্ধগুলি পর পর যে ভাবে সজ্জিত করা প্রয়োজন, পুস্তকে সেই ভাবেই উহাদিগকে সজ্জিত করা হইয়াছে। অতএব সমালোচক এবং পাঠক মহোদয়-গণের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারাও বিচ্ছিন্ন মনে পুস্তকখানা পাঠ করিবেন না। পুস্তকের শেষ প্রবন্ধের প্রতি তাঁহারা যতই অগ্রসর হইবেন, পুস্তকের অখণ্ড রূপ বা অখণ্ড বিষয়ের সহিত ততই তাঁহাদের পরিচয় সংস্থাপিত হইবে।

পুস্তকের যাহা মোট বক্তব্য বিষয় অথবা পুস্তকের যাহা মর্ম্মকথা, তাহা পরিপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গীণতা প্রাপ্ত হইবে—পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে। দ্বিতীয় ভাগ পরে প্রকাশিত হইবে।

পুস্তক নিহিত কোনও বিষয় উপলক্ষে এস্থলে পৃথকভাবে নিবেদন করিবার কিছু নাই। যে যে বিষয়ে যাহা যাহা নিবেদন করিবার, তাহা যথাস্থানে নিবেদন করা হইয়াছে। এক্ষণে বাংলার জ্ঞানিগুণিজন পুস্তকখানাকে গ্রহণ করিলেই আমাদের সকল নিবেদন কার্য্যতঃ ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া মনে করিব।

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	ছত্র	শুদ্ধ
প্রাপ্ত	১১	১২	প্রাপ্তি
হেকিমিগণ	৩০	১৭	হেকিমগণ
বায়ব	৬৩	৭	বায়বীয়
ভারতয়	৪৯	২৫	ভারতীয়
সেবাই আমাদের প্রশৃতি	৮৮	১৯	সেবাই অর্থের প্রশৃতি
স্তর-পারম্পর্য্যাক	১০৪	১১	স্তর-পারম্পর্য্যকে
জনয়িত্রী	১০৪	১৯	জনয়িতৃ
অভিব্যক্তিদের	১০৫	১	অভিব্যক্তিবাদের
the from the latter	১০৮	১২	from the latter
যুগধর্ম্ম	১৩৭	৮	যোগধর্ম্ম
বনাবলী	২৭৪	২৫	ঘটনাবলী
সাম্রাজ্যর	৩০১	৬	সাম্রাজ্যের
স্বত্বক্রয়	৩০১	৮	স্বত্বক্রয়
পুরষ্কার	৩০১	৯	পুরস্কার
শ্রেষ্ঠীদের	৩০২	২৩	শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের
গগণ	৩৩০	২২	গগন
সে	৩৩৩	৮	যে
স্বাধনতা	৩৩৫	৪	স্বাধীনতা
১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে	৩৪১	৩	১৮৬১ খৃষ্টাব্দে
জীবনবৃদ্ধি	৩৬৫	২০	জীবনবৃদ্ধির

১৭৯ পৃষ্ঠায় ২৫ ছত্রের দাড়ির পরে এইরূপ পাঠ্য—রামায়ণী যুগে সাধন-জগতের ব্রহ্মতত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

আমরা কোন্ পথে ?

নূতন পথ নির্দ্দেশক অভিনব পুস্তক !

—০):(০—

এই পুস্তকের সারমর্ম্ম সংক্ষিপ্ত সময়ে
জানিয়া লইতে ইচ্ছা করিলে

পড়ুন—

স্বাস্থ্য লাভের উপায়

আত্ম-সংগঠন

আমরা কোন্ পথে ?

নব্য ভারতের স্রষ্টাবৃন্দ

এবং

আর্য্যধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিস্তার ।

=তৎপর=

অবকাশ কালে সমগ্র পুস্তক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া
ভারতহিতে, বিশ্বহিতে আপনাকে প্রস্তুত করুন ।

আমরা কোন্ পথে ?

বহু পথের সমন্বয় নির্দ্দেশক অভিনব পুস্তক !!

—:০)০(০:—

এই পুস্তকের সর্ব্বাবয়বের সমৃদ্ধি
পরিবর্দ্ধন সম্পর্কে
সকল প্রকার অভিমত
শ্রদ্ধার সহিত
পরিগৃহীত হইবে।

—:)০(:—

আমরা কোন্ পথে ?-র

= দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশ =

সর্ব্বতোমুখী প্রয়োজনানুকুল্যে
আপনার

অভিপ্রেতকি ?

কাব্যে রবীন্দ্র পরিচয়

(১)

"যদা তমস্ তৎ ন দিবা রাত্রিঃ
ন সন্ ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ।"—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্

যখন তমোময় অন্ধকার ছিল, তখন দিবাও ছিল না, রাত্রিও ছিল ন অস্তিও ছিল না, নাস্তিও ছিল না, তখন কেবলাত্মা শিব বিদ্যমান ছিলেন এই শিবের শিবত্ব যেখানে রূপরংরেখাহীন অনামিত্বে পর্য্যবসিত, যেথা শব্দ-ব্রহ্মের উন্মুখ অবস্থার বিকাশমানতা, সন্তশাস্ত্র সেই স্থানের সে অবস্থাকে 'ধঃধংকার' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই 'ধঃধংকার'এর কেন্দ্রবি হইতে সৃজনধারা অনন্ত পথে বিচ্ছুরিত হইয়া এক মহাবিশাল পরিধি অতিক্রমণে স্থূল পর্য্যানুক্রমিকতায় প্রকটিত হইয়াছে। সেই সৃষ্টি-কেন্দ্রে স্তর-পারম্পর্য্য হইতে ক্রমস্খলনে, যুগযুগানুগত ক্রমাভিব্যক্তির মধ্য দিয়া আমর স্থূল শরীরীরূপে এই বিশ্বনাট্যশালায় অবতরণ করিয়াছি। তাহারই চি রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত করিয়াছেন—

"আজি মনে পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে,
প্রাণ হতে প্রাণে।"—বলাকা

অবতরণে সিদ্ধকাম হইয়াও আমরা সান্ত সীমায় শৃঙ্খলিত হইয়া যা নাই, অসীমের স্মৃতিকে আমরা মস্তিষ্ককোষে চিদায়িত করিয়া লইয়াছি— জানায় এবং অজানায়। আমাদের যে আমি—অসীম, সর্ব্ব সঞ্চরণানুগত

তাহাকে জানায় আয়ত্ত করিয়া সর্ব্বত্র প্রক্ষেপণ করতঃ আমরা তাহার স্বাতন্ত্র্য-লীলাও সন্দর্শন করিতে পারি। তাই, কবি বলিতেছেন—

"যে আমি ঐ ভেসে চলে
কালের ঢেউএ আকাশ তলে,
দূরে রেখে দেখেছি তারে চেয়ে—
ধূলার সাথে, জলের সাথে,
ফুলের সাথে, ফলের সাথে,
সবার সাথে চল্‌ছে ও যে ধেয়ে।"

—প্রবাহিণী

বার তের বৎসর বয়স হইতে বর্ত্তমান বয়স পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বাণীমন্দিরে অজস্র নির্ঝরে কাব্যসুধার অমিয়ধারা ঢালিয়াছেন। গোমুখী উৎসারিত পুণ্য জাহ্নবীর সুবিশাল বিপুলতাই তাহার একমাত্র গর্ব্বের বস্তু নহে; তাহার চলমানতার শ্রেষ্ঠ, সন্দীপ্ত সার্থকতা তাহার সাগর-সঙ্গমে। সাগর যদি তাহার আলিঙ্গনাকুল অস্তিত্ব লইয়া সুবিস্তারিত না থাকিত, তবে জাহ্নবীর চিহ্নের আর অবশেষ থাকিত না। এই উপমাটি রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন, "কাব্য রচনার এক মাত্র উদ্দেশ্য সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধন।" ইংরাজীতে একটি কথা আছে—"Microcosm reflects Macrocosm."—অসীম প্রতিভাসিত হয় সীমায়। যুগমানবগণ সীমায়িত কণ্ঠে আমাদের সকলকেই আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন, তোমরা বৃহতের পুত্র, সর্ব্ব সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া তোমরা প্রসারিত হও। একুশ বাইশ বৎসরের তরুণ যুবক রবীন্দ্রনাথে যে প্রসারণ দেখা দিয়াছিল, তাহারই চিত্র তিনি আমাদিগকে উপহার প্রদান করিয়াছেন—

"জগৎ আসে প্রাণে জগতে যায় প্রাণ
জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে এক গান।"—স্রোত

"কি জানি কি হল আজি,
জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হ'তে শুনি যেন
মহাসাগরের গান।
সেই সাগরের পানে হৃদয়
ছুটিতে চায়
তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন
টুটিতে চায়।"—প্রভাত উৎসব

বাংলার আধুনিক কাব্য-সাহিত্যে ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব প্রতিফলিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শেলী, ব্রাউনিং, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কীটস্‌, টেনিসন, সুইন্‌বার্ণ, সেক্সপিয়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্য জগতের সাহিত্যরথী-বৃন্দের প্রতিভার ছাপ রবীন্দ্রনাথের উপর কতখানি পতিত হইয়াছে, তাহার পরিমাপ শুধু নিষ্প্রয়োজন নয়, নিষ্কারণও বটে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার অন্যনিরপেক্ষতা জাজ্জ্বল্যমানতায় প্রকটিত। তাই, তাঁহাকে বিনীত ভাষণে বলিতে হইয়াছে—

"বাহির হ'তে দেখোনা এমন করে
আমায় দেখোনা বাহিরে।"

নব বরষার আগমনে 'মেঘদূত'এর বিরহব্যথা-ক[illegible]কত যক্ষের কাহিনী কবি-চিত্তে যে ব্যথার আলোড়ন সৃষ্টি করিল, যাহার ফলে কবি লিখিলেন—

"ভাবিতেছি অর্দ্ধরাত্রি অনিদ্র নয়ান,
কে দিয়াছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান ?
কেন ঊর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ ?

সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানস-সরসী-তীরে বিরহ-শয়ানে,
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদী-গিরি সকলের শেষে!”

—তাঁহার এই বিরহকাতর উক্তি আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়, পরিশুদ্ধ, চিৎস্পন্দনময় জগতের কথা যেথায় অফুরন্ত প্রকাশে চিদৈশ্বর্য্য স্বতঃ প্রকটায়িত।

বৈজ্ঞানিকের পরমাণু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র; এত ক্ষুদ্র যে চর্ম্মচক্ষুতে দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু তাহার ভিতর সমাহিত রহিয়াছে অপরিসীম শক্তি। তাই, উহাকে বলা হইয়াছে, মহতোমহীয়ান্, অণোরণীয়ান্। আমাদের শক্তি ততোঽধিক। রবীন্দ্রনাথ ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতায় তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া লিখিয়াছেন—

“আমি—ঢালিব করুণা-ধারা
আমি—ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা,
আমি—জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।
কেশ উড়াইয়া, ফুল কুড়াইয়া
রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া, দিবরে পরাণ ঢালি।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল,
তালে তালে দিব তালি।”

‘বসুন্ধরা’ কবিতায় লিখিয়াছেন—

“ও গো মা মৃণ্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই;

দিগ্বিদিকে আপনারে দেই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত ; বিদারিয়া
এ বক্ষঃ-পঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সঙ্কীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার,—হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকীরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে' যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হ'তে প্রান্ত ভাগে।"

তুলসীদাস আপনি আপনাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"তুলসী য্যাসা ধ্যান ধরো জ্যাসা বিয়ানকা গাই।
মু মে তৃণ চাটা টুটে ওর্ চেৎ রাখয়ে বাছাই ॥"

—নব-প্রসূতা গাভী যেমন বৎসের প্রতি মন নিবদ্ধ রাখিয়া আহারাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তুমিও সেইরূপ তাঁহার প্রতি ধ্যান নিবদ্ধ রাখিয়া সাংসারিক কার্য্য পরিচালনা কর। তুলসীদাসের আত্মপ্রকাশের এক পর্য্যায় সংগুপ্তির আবরণে রবীন্দ্রনাথেও বিরাজমান। নতুবা কবি কি মোহন ঝঙ্কারে বলিতে পারিতেন ?

"বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো ॥" —গীতাঞ্জলি

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার সমৃদ্ধি বাহিরের লোকের পরিমাপ করিবার বিষয় নহে। তিনি নিজেই অনেক সময় নিজের রচনায় পরিতোষ লাভ করেন নাই। সময় সময় তাঁহার মনে হইত, লিখিত রচনা আরও উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত ছিল। তাই, তিনি 'ক্ষণিকা'য় ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন—

"অনেক লেখায় অনেক পাতক,
সে মহাপাপ কর্‌ব মোচন !

আমার হয় তো কর্‌তে হবে
আমার লেখা সমালোচন!
তত দিনে দৈবে যদি পক্ষপাতী পাঠক থাকে,
কর্ণ হবে রক্ত বর্ণ এমনি কটু বল্‌ব তাকে।
যে বইগুলি পড়্‌বে হাতে
দগ্ধ কর্‌ব পাতে পাতে
আমার ভাগ্যে হব আমি
দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচন।"

এই ব্যঙ্গ-কবিতা শুধু তাঁহার কাব্য-প্রতিভার অন্তর্নিহিত সমৃদ্ধির কথাই ঘোষণা করে নাই, তাঁহার মহামানবতার সম্ভাব্য বিপুল প্রকাশের কথাও ঘোষণায় ব্যাপ্ত করিয়াছে। কবি 'উৎসর্গ'এ যথার্থ ই লিখিয়াছেন—

"পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম কস্তুরী মৃগ সম।"

রবীন্দ্রনাথ আশাবাদী, আনন্দবাদী। 'বিশ্বনৃত্য'এ লিখিয়াছেন—

"বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে কে বাজাবে সে বাজনা।
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য, বিস্মৃত হবে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ, নব সঙ্গীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয় সাগরে পূর্ণচন্দ্র, জাগাবে নবীন বাসনা।"

(২)

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক নহেন—কিন্তু, শিক্ষকতুল্য একজন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহ দিবার জন্য মাঝে মাঝে দুই এক পদ কবিতা লিখিয়া তাঁহাকে উহা পূরণ করিতে বলিতেন।

"রবি করে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।"

একদা তিনি ইহা লিখিয়া রবীন্দ্রনাথকে ইহার পাদপূরণ করিতে দি(
রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন—

"মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে,
এখন তাহারা সুখে জল ক্রীড়া করে।"

ইহা লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ অপরিমিত আনন্দ বোধ করিলেন। বালক রবীন্দ্রনাথ তখন ইহা বুঝিতে পারেন নাই যে, উত্তর কালে তাঁহার মহাবিশাল ভাবসমুদ্র মন্থন করিয়া তিনি সু-উচ্চ লোকের যে অমৃত-স্রোত প্রবাহিত করিবেন, তাহাতে আমরা আত্মবৈশিষ্ট্যের সংবেদন লইয়া সুখে জলক্রীড়া করিব। যে কবিতাটি সর্ব্বপ্রথম তাঁহার শিশুমনকে মনোরমতায় সমাকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহার হাস্যকর চরণ দুইটি এই—

"জল পড়ে—
পাতা নড়ে।"

জল পড়িলে পাতা নড়িবে, ইহা একটি খণ্ড সত্য। কিন্তু জগতের কেন্দ্র-সত্তার অমৃত-স্পন্দনের সাথে সাথে তাঁহার পরিবেষ্টনকারী সমুদয় অনুষঙ্গও যে নিয়ত পরিস্পন্দিত হইতেছে, ইহা একটি চিরন্তন, অখণ্ড সত্য। পরবর্ত্তী জীবনে সত্যের মহত্তর সুরকে অন্তর রাজ্যে উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বাভাষ স্বরূপেই কি ঐ জল-পাতার সংযোগের সমসূত্রতা কবির শিশু-চিত্তকে এতখানি আকৃষ্ট করিয়াছিল?

বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথের এক খেলার সঙ্গিনী ছিল। সে রাজার বাড়ীতে খেলা করিতে যাইত। সেই রাজার বাড়ী না কি রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতেই ছিল। বালক সেই রাজার বাড়ী আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। ঘটনা সামান্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইহাকে 'জীবনস্মৃতি'তে স্থান দিয়াছেন। সুতরাং ইহাকে সামান্য বলিয়া গ্রহণ করিব না।

রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে লিখিয়াছেন, "অসম্পূর্ণ রিয়াল এবং পরিপূর্ণ আইডিয়ালের মিলনেই কবিতার সৌন্দর্য্য।" (ছিন্নপত্র) এই আইডিয়ালই মহাচৈতন্য, গীতা যাহাকে বলিয়াছেন 'শুদ্ধপুরুষোত্তম,' আর তাঁহাকেই আমরা

বলিতেছি 'রাজা'। এই রাজার চিৎপ্রকাশ সর্ব্ববস্তুতে অনুস্যূত; রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে যেমন, সকল বাড়ীতেই তেমন, ধূলিকণিকায় যেমন, গ্রহ-উপগ্রহেও তেমন। একটি সরল রেখা কল্পনা করা যাউক, উপলব্ধির অবেষ্টনে যাহা সান্ত, কিন্তু তাহার বাহিরে যাহা অনন্ত। সেই সান্ত, সরল রেখার দুই প্রান্তে 'ক' বিন্দু এবং 'ঙ' বিন্দু পরিস্থাপন করা যাউক। বেদ, উপনিষদ্, তন্ত্র এবং তন্ত্রাতীত শাস্ত্রের ঘোষণা এই যে, বিশ্বস্থিতিরূপ ঐ সরল রেখার 'ক' বিন্দুতে জগৎপিতা বা আমাদের রাজা, আর 'ঙ' বিন্দুতে তাঁহারই চিৎকণা উৎসারিত আমরা মানব। উপলব্ধির পারম্পর্য্যে সেই চিৎস্বরূপ, সেই রাজা অথবা মহাবিশ্বের স্থিতি-রেখার সেই 'ক' বিন্দু কি মানবের অনধিগম্য? রবীন্দ্রনাথের সুমধুরনাদিনী অন্তর বীণা সেই কেন্দ্র-কম্পনের ঝঙ্কার তুলিয়াছে—

"অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই, সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীত স্রোতে কূল নাহি পাই—
কোথা ভেসে যাই দূরে।"—চিত্রা

"আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে,
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হ'তে
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের সাথে
বিরহ-বিধুর নয়ন-সলিলে
মিলন মধুর লাজে।"—মানসী

'উৎসর্গ'এ লিখিয়াছেন—

"আজ মনে হয় সকলের মাঝে
তোমারেই ভালবেসেছি,
জনতা বাহিয়া চিরদিন ধ'রে
শুধু তুমি আমি এসেছি।"

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন, "যেমন নীহারিকাকে সৃষ্টি ছাড়া বলা চলে না, কারণ তাহা সৃষ্টির একটি সবিশেষ অবস্থার সত্য, তেমনি কাব্যের অস্ফুটতাকে উড়াইয়া দিলে সত্যেরই অপলাপ করা হয়। মানুষের মধ্যে অবস্থা-বিশেষে একটা আবেগ আসে, যাহা অব্যক্তের বেদনা, যাহা অপরিস্ফুটতার ব্যাকুলতা। তাহার প্রকাশকে মিথ্যা বলিব কেমন করিয়া ?"

"নয়নে তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে।"

—রবীন্দ্রনাথের সেই অব্যক্তের বেদনা বুঝি ইহারই ভিতর রূপ লইয়াছে ; যেমন, জ্ঞানদাস কান্দিয়া গাহিয়াছিলেন—

"হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নহি বান্ধে॥"

'সোনার তরী'র কবিতাগুলি সম্পর্কে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "ইহাদের মধ্যে কবির বিশ্বানুভূতি ও সৌন্দর্য্যানুভূতি প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কবি যেন তাঁহার অন্তরের অফুরন্ত ঐশ্বর্য তাঁহার চলার পথের দু'ধারে মুঠা মুঠা মণিরত্নের মতন ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়াছেন।" আমাদের আলোচনার বিষয় শুধু মাত্র 'সোনার তরী' কবিতাটি, কবিতাগুলি নহে। এই কবিতাটিতে আমরা শুধু সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত সমাবেশই দেখিতেছি না, দেখিতেছি যে, কবিতাটির প্রতিটি অক্ষর হইতে যেন একটি করুণ সুর ঊর্দ্ধগতিপরায়ণ হইয়া আমাদের চক্ষুর উপর জ্যান্ত মূর্ত্তিতে নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কবি লিখিয়াছেন—

"গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে' আছি নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুর ধারা খর পরশা
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।"

—অর্থাৎ মানব জীবনের যাহা-কিছু দুর্লভ সঞ্চয়, স্নায়ু-শিরা, বলিষ্ঠ বাহু ও উর্বর মস্তিষ্কের যাহা-কিছু সযত্ন আহরণ, তাহারই বিলীনপ্রায় প্রান্তে কবি বরষার অভ্যাগম দেখিলেন; তাহার পর তাহার ঘন কল-রোলের মাঝারে এক নেয়েকেও দেখিতে পাইয়া কবি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,

"ওগো তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে!
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে!
যেও যেথা যেতে চাও,
যারে খুসি তারে দাও,
শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে!"

মানবের জীবন-নাটিকার শেষ অঙ্কে তাহাদের অন্তরতম প্রয়াসের সঞ্চয় সমুদয় নেয়ের হাতে সমর্পণ করিয়া কবি তাহাদের হইয়া সেই নেয়েকে বলিলেন, "এখন আমারে লহ করুণা করে।"

কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলেন যে, সেই নেয়ের তরী একান্তপক্ষেই ক্ষুদ্রকায়; সেথায় মানবের শুদ্ধ আত্মার স্থান হইতে পারে না।

"ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই! ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি'
শ্রাবণ গগন ঘিরে,
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে

শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি'
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।"

'সোনার তরী'র প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তা এইরূপঃ—যে দুইটি শক্তি ক্রিয়মানতার সহিত নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকে ধা করিয়া রহিয়াছে, তাহার একটির নাম—কাল; অপরটির নাম—দয়াল কাল—পরিবর্ত্তনশীল; দয়াল—শাশ্বত, অপরিবর্ত্তনীয়, চিরনিত্য। ধান ক সমাপনে এবং বরষার আগমনে অর্থাৎ জীবনের শেষ বেলায় কালপুরু রূপ নেয়ে যখন তাঁহার সোনার তরী লইয়া আসিয়া দেখা দেন, তখন মা তাহার জীবনের সমুদয় আহরণ তাঁহার তরীতে তুলিয়া দেয় এবং একান্ত অনু সহকারে তাহাকেও তুলিয়া লইতে প্রার্থনা করে। কিন্তু সৃজন-প্রলয়ের চ নিয়ত-পরিভ্রমণশীল কালের দেবতা তাহাকে গ্রহণ না করিয়া অপরিবর্ত্তনী স্থিতিসম্পন্ন, চির নিত্যত্বে বিরাজমান সেই দয়ালপুরুষের কৃ দৃষ্টির উপর তাহাকে সমর্পণ করেন। ভাবার্থ এই যে, "যস্মিন্ গত্বা ন নিবর্ত্ত তৎধাম পরমং 'দিব্যং'—" বলিয়া আমাদের শাস্ত্র বিশ্বস্থিতির যে স্থান নির্দে করিয়াছেন, ইহলোকের পরপারে মানব তৎস্থানেরই যোগ্যতম অধিবাসী হওয় উপযুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ক্ষুদ্র কাব্য নাটিকা 'আবেদন'এর মহামহিমম মহারাণীর নিকট ভৃত্যের প্রার্থনার ভিতর দিয়া সেই দয়াল পুরুষেরই চর আপনাকে নিবেদন করিয়া বলিয়াছেন—

"আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।"

(৩)

রবীন্দ্রনাথ 'বাংলা কাব্য পরিচয়' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "কাব্য শিল্প রচনায় বাঙ্গালীর কল্পনাবৃত্তির স্বাভাবিক আকর্ষণ ও লীলানৈপুণ্য আছে

রূপরস সৃষ্টি করিতে মানুষের যে কল্পনাবৃত্তি আনন্দ পায়, বাঙ্গালীর তাহা যথেষ্ট পরিমাণে আছে।" কথাটি গভীর সত্য। রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিষ্মান্ অন্তর্দীপ্তিকে পুরোভাগে সংস্থাপিত করিয়া আমাদিগকে মধুসূদনের ভাষায় বলিতে হইবে—

"রচিব এ মধুচক্র 'জগ' জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কি আপনাকে আপনি বলেন নাই ?

"ওরে তুই ওঠ আজি ! আগুন লেগেছে কোথা ?
কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি জাগাতে জগৎ জনে ?"

বেদান্তের বজ্রনির্ঘোষ বাণী—

—"ন প্রজয়া ধনেন ন চেজ্যয়া
ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ।"

—সন্তানের দ্বারা নহে, ধনের দ্বারা নহে, যজ্ঞের দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃত অভিলব্ধ হইয়া থাকে। এই ত্যাগ আসে যোগ হইতে। যেমন—কলিকাতায় সুবৃহৎ ব্যবসায় পাতাইয়া তাহাতে যোগ দেওয়া গেল, গ্রামের ক্ষুদ্র মুদীখানা দোকানের বন্ধন ত্যাগ করিয়া। কবি গাহিয়াছেন—

"যুক্ত করহে সবার সঙ্গে
মুক্ত করহে বন্ধ।
সঞ্চার কর সকল কর্ম্মে
শান্ত তোমারই ছন্দ।"—গান

সবার অর্থাৎ নিখিল বিশ্বাত্মার সহিত সংযোগ প্রাত্যহিক জীবন-পরিচালনাতেও অমৃত বর্ষণ করিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোকে ভূলোকে,

তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ,
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া॥ —প্রাণ

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন, "যে সুর অসীম হইতে বাি হইয়া সীমার দিকে আসিতেছে, তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, তাহা নিয়মে বাঁ আকারে নির্দ্দিষ্ট —তাহারই যে প্রতিধ্বনি সীমা হইতে অসীমের দিকে পুন ফিরিয়া যাইতেছে, তাহাই সৌন্দর্য্য, আনন্দ।"—অর্থাৎ পরম পুরুষ হইতে নাদধারা সত্য ও মঙ্গলরূপে নির্গলিত হইয়া নিখিল বিশ্ব সৃজন করিয়াে তাহাই যখন উল্‌টিয়া রাধা হইয়া তাঁহারই প্রতি অভিসার করে, তখনই প্রাণময়ী পদ্মহস্তে সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্য ও আনন্দ বিতরণ করে। মূলতঃ সৃষ্টি সর্ব্বত্রই এই সৌন্দর্য্য ও আনন্দের পরিবেশ। "রসো বৈ সঃ।" সৃষ্টির সূ হইতে স্থূলে ইহার মাত্রার ক্রমিক ন্যূনতা প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র।

মৃত্যু যাহা মহাজীবনের একটি পর্য্যায় বা সংস্থিতি মাত্র, সেখানেও আম আমাদের বোধানুপাতিকতায় সেই সৌন্দর্য্য ও আনন্দেরই অনুভূতি লাভ করি থাকি। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মহাপ্রয়াণে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

"গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সঙ্গীত ধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্য্যে তারায় তারায়।
সেথা তুমি অগ্রজ আমার।"

যাহা দ্বারা আত্মা সমুন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, আত্মার অনাদি, অব্যয় অব জানিবার তৃষ্ণা পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহারই নাম কাব্য। কবিকে কখন নীচবোধপরায়ণ হইতে দেখা যায় না। অনন্যসাধারণ চিত্তপ্রাশস্ত্য কবিতেই দৃ হয়। বিশ্ব-আমি হইতে যখন অহং-আমি স্খলিত হইয়া পৃথক্‌ত্বে সমাসীন হ বোধরাজ্য তখনই সঙ্কীর্ণ হয়, অজানার প্রান্তর চতুর্দ্দিকে সুবিস্তারিত হইয়া রহস্য

বিলাসে অহং-আমিকে লইয়া বিদ্রূপের জাল রচনা করতঃ তাহার সঙ্কুচিত জীবনের ক্ষুদ্রত্বকে ক্রমবর্দ্ধিত করিতে থাকে। এই রূঢ়-বাস্তব, বেড়ায়-ঘেরা সান্ত অবস্থাকে সমগ্র হৃদয়-মন দ্বারা অস্বীকার করতঃ উৎক্রমণ করিবার মানসে কবি চলেন, চিত্ত-বলাকার পাখা উড়াইয়া, মন-গরুড়ের পৃষ্ঠে চড়িয়া অন্তঃ হইতে অন্তর্লোকে ক্রমিক ব্যাপ্তির প্রশস্ত রাজপথে, যে পথের বাঁকে বাঁকে পরম মঙ্গলময় দেবতা মাঙ্গল্যঘট পরিস্থাপন করিয়া, সবিতা-সূর্য্যের আলো জ্বালাইয়া তাহার চলাকে সহজগতিসম্পন্ন করিয়া তোলেন। যাহার জীবনে এই অবস্থার ব্যতিক্রম দূরপনেয়রূপে আবির্ভূত হয়, কবি হওয়ার সৌভাগ্য তিনি লাভ করিতে পারেন না, চিত্তপ্রাশস্ত্যের প্রকাশ তাহাতে সম্ভব হয় না।

মহাজীবনের রক্তমাংসময় সংস্থিতির পটভূমিকায় দণ্ডায়মান হইয়া কবি যখন এই চিত্ত-প্রাশস্ত্যের বোধোদ্দীপন লাভ করেন অর্থাৎ একই প্রাণশক্তির দ্বৈত অবস্থার স্বাতন্ত্র্য অবলুপ্ত হইয়া যখন তাহার বোধকেন্দ্রে এক সত্তারূপে দেখা দেয়, তখন নূতনের আবাহন গীতিই খরতর হয়! রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমলে' লিখিয়াছেন—

"নহে নহে সে কি হয়
সংসার জীবনময়
নাহি এথা মরণের স্থান
আয়রে নূতন আয়
সঙ্গে করে নিয়ে আয়
তোর সুখ তোর হাসি গান।"

মননশীলতার স্তর-পারম্পর্য্য ডিঙ্গাইয়া ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ লাভ করিলেন, প্রজ্ঞার তত্ত্ব, শেলী—প্রেমতত্ত্ব, কীট্স—সৌন্দর্য্যানুভূতি, ব্রাউনিং—বোধশক্তির তীক্ষ্ণতা, টেনিসন্—অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ যাহা লাভ করিলেন, তাহা বাংলার বৈশিষ্ট্যের রূপক প্রতীক একমাত্র তাঁহাতেই সম্ভব। কবি তাঁহার গোপন বীণার তারে ঝঙ্কার তুলিয়াছেন—

"কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে !
আমি যে তোমারে খুঁজি !
রাখো কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী !
আমার অর্থ, তোমার তত্ত্ব
বলে দাও মোরে অয়ি !"—অন্তর্যামী

"পূজাহীন দিন, সেবাহীন রাত
কত বার ফিরে গেছে নাথ,
অর্ঘ্যকুসুম ঝরে পড়ে গেছে
বিজন বিপিনে ফুটি ।
যে সুরে বাঁধিলে বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বার বার,
তোমার রচিত রাগিণী
আমি কি গাহিতে পারি ?
তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া
সন্ধ্যা বেলায় নয়ন ভরিয়া
এনেছি অশ্রু বারি !" —জীবন দেবতা

"সেই মধুমুখ, সেই মৃদু হাসি
সেই সুধাভরা আঁখি
চির দিন মোরে হাসাল কাঁদাল
চির দিন দিল ফাঁকি !" —জীবন দেবতা

"আমার এই দেহখানি তুলে ধরো
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো ।" —চিত্রা

'গীতাঞ্জলি'তে লিখিয়াছেন—

"তুমি যদি না দেখা দাও
করো আমায় হেলা
কেমন করে কাটে আমার
এমন বাদল বেলা।"

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার রূপ-সায়রে ডুব দিয়া আনন্দ-উন্মাদ কণ্ঠে বৈষ্ণব কবিকে প্রশ্ন করিয়াছেন—

"সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম গান
বিরহ-তাপিত?"—বৈষ্ণব কবিতা

আমরা কি রবীন্দ্রনাথকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারি না?

চিত্ত যখন ভাবরাজিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তখন "অসীমতা এবং একটি মনুষ্য উভয়ে পরস্পরের সমকক্ষ—আপন আপন সিংহাসনে পরস্পর মুখোমুখী বসে থাক্‌বার যোগ্য"—তখন ভাবার ছিন্ন নীরব তন্ত্রীই প্রচণ্ডরূপে অনাহত শব্দময় হইয়া উঠে, তখন হৃদয়-সায়রে যে তরঙ্গ উঠে, তাহার রূপ, গতি, চলন, ছন্দকে ভাবার বন্ধনী পরাইয়া প্রকাশ করিতে হয় না। অর্থাৎ উপলব্ধির ক্রমিকতায় মস্তিষ্কে যে আহরণ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে, তাহার প্রান্তদেশে বাক্‌স্ফুরণশীলতা স্তব্ধ হইয়া যায়। তখন মৌনতাই হয় সত্তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধি এবং একমাত্র দেবতার পক্ষেই তাহা হয় গ্রহণযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' কবিতায় লিখিয়াছেন—

"দেবি! আজি আসিয়াছে অনেক যন্ত্রী শুনাতে গান
অনেক যন্ত্র আনি।
আমি আনিয়াছি, ছিন্নতন্ত্রী নীরব ম্লান
এই দীন বীণাখানি।

মনে যে গানের আছিল আভাস,
যে তান সাধিতে করেছিনু আশ,
সহিল না সেই কঠিন প্রয়াস,
ছিঁড়িল তার।
তুমি যদি এরে লহ কোলে তুলি,
তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুলি,
সকল অগীত সঙ্গীতগুলি,
হৃদয়াসীনা।
ছিল যা আশায়, ফুটাবে ভাষায়
ছিন্ন তন্ত্রী বীণা।"

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবিরশ্মি'তে লিখিয়াছেন—"বিশ্ববিধির একটা নিয়ম এই যে, যেটা উপস্থিত সেইটাই মনে হয় আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত ; কিন্তু সেটা যে বাস্তবিক একটা সোপান-পরম্পরার অঙ্গ ও অংশ মাত্র, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। ফুল যখন ফুটিয়া উঠে, তখন মনে হয় ফুলই যেন গাছের একমাত্র লক্ষ্য, যেন সে বন-লক্ষ্মীর সাধনার চরম ধন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সে ফল ফলাইবার একটা উপলক্ষ মাত্র।"

বাংলার কৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যকে মন্থন করিয়া রবীন্দ্রনাথের যে আবির্ভাব সমুদ্ভাসিত, আমরা তাহাকে ফল ফলাইবার উপলক্ষ বলিয়াই মনে করি।

(৪)

পাতঞ্জল দর্শন বলিয়াছেন, "যোগশ্চিত্ত-বৃত্তি নিরোধঃ।" ইহা কোটি-অর্ব্বুদ সত্যের প্রতীক, কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম, ন্যাস, কুম্ভক প্রভৃতি যোগাঙ্গগুলিকে বর্ত্তমান সমাজে প্রচলিত করিবার প্রয়াস করা শ্রেষ্ঠতম বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্র'এ লিখিয়াছেন—"যেই মানুষ চুপ করে, অমনি দেখতে দেখতে নিস্তব্ধ নক্ষত্রলোক হতে শান্তি নেমে এসে হৃদয় পূর্ণ করে তোলে, সে সভার মধ্যে অনন্ত কোটি জ্যোতিষ্ক নীরবে সমাগত, আমিও সে সভার এক প্রান্তে স্থান পাই,

অস্তিত্ব নামক এক মহাশ্চর্য্য ব্যাপারের মধ্যে ওরা এবং আমি এক আসন পেয়ে যাই।" "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—যিনি প্রকাশ বৈচিত্র্যে বহু হইলেও স্বরূপতঃ একক, তিনি আপনাতে আপনি চুপ করিয়াই আছেন। তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে আমাদিগকেও চুপ করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যায়, চুপ হইয়া যাওয়ার যে কৌশল অর্থাৎ যাহা তাঁহাতে যুক্ত করিয়া দেয়—আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম প্রভৃতি তাহারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যতীত আর কিছু নহে। বীজ যদি আমাদের আয়ত্তাধীনে থাকে, তবে বৃক্ষের ডালপালা জন্মাইবার স্বতন্ত্র প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করা একেবারেই অনাবশ্যক নহে কি? সুতরাং ইহা বলিতেই হইবে যে, আনন্দ-সংযোগের কৌশল ঠেলিয়া দিয়া বৈরাগ্যের চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিলে বৈরাগ্য আসে না, তাহাতে অস্তিত্ব আরও ক্ষীণ হইয়াই উঠে। তাই, রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে, গন্ধে, গানে,
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।" —নৈবেদ্য

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অন্তর দেবতার নিকট যে ভক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে ভক্তশিরোমণি বলিতেই সাধ হয়। তিনি লিখিয়াছেন—

"যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য্য নাহি মানে,
মুহূর্ত্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদ-মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল-ফেন ভক্তি মদ-ধারা
নাহি চাহি, নাথ! দাও ভক্তি শান্তি রস,
স্নিগ্ধ সুধা পূর্ণ করি মঙ্গল কলস
সংসার-ভবন-দ্বারে। যে ভক্তি-অমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত,
নিগূঢ় গম্ভীর,—সর্ব্ব কর্ম্মে দিবে বল,
ব্যর্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সুফল
আনন্দে কল্যাণে।" —নৈবেদ্য

রবীন্দ্র প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা রূপরসগন্ধময়তার উর্দ্ধে স্থিত অখিল রসামৃত সিন্ধুর মাতাল বাতাসে নিয়তই আন্দোলিত, কেন্দ্রানুসারী ঝোঁক দ্বারা দীপ্ত ও প্রবুদ্ধ, ইহার প্রাত্যহিক বৈষয়িকতাও উর্দ্ধলোকের চৈতালী হাওয়ার আনাগোনায় পরিস্পন্দিত। সত্য কথাটা ইহাই যে, যে জীবন যত মহৎ—জগতের বিচিত্র ধ্বনি অনাহত শব্দে রূপান্তর লাভ করিয়া তাঁহাতে তত অধিক প্রতিধ্বনিত, দেবতার সিংহাসন পৃথিবীর জনগণ মাঝারে স্থাপন করিতে আগ্রহ-আকুল সংবেদনায় তিনি তত অধিক ব্যাকুলিত। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিয়াছেন—

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?
পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ, মিলন,
বৃন্দাবন গাথা,—এই প্রণয় স্বপন,
শ্রাবণের শর্ব্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে

সরমে সম্ভ্রমে,—একি শুধু দেবতার ?
এ সঙ্গীত-রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেম-তৃষা ?”

—বৈষ্ণব কবিতা

‘এবার ফিরাও মোরে’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে আত্মস্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা আর্ত্ত-আশ্রয়-উদ্ধার ইষ্টের কথাই আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায় কম্পিত করিয়া তুলিতেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

“মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা !
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা ! দুর্দ্দিনের অশ্রু জলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি—তারি মাঝে যাব অভিসারে
তাঁর কাছে, জীবন সর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যাঁরে
জন্ম জন্ম ধরি ! কে সে ? জানি না কে ! চিনি নাই তাঁরে,
শুধু এইটুকু জানি—তাঁরি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানব যাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে,
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি !”

'আত্ম-জীবনী'তে পণ্ডিত জওহরলাল

(১)

রাত্রির তিমির জাল ছিন্ন করিয়া দিক্‌চক্রবালরেখায় উষা দেবী যখন হাস্য-প্রদীপ্তি লইয়া মুখাবরণ উন্মোচন করিতেন, আর্য্য ঋষিগণের প্রাণে তখন আর আনন্দ ধরিত না। তাঁহাদের এই বিহ্বল-করা আনন্দ এবং সংবেদনের প্রাচুর্য্য আলঙ্কারিক ভাষার ভিতর দিয়া বেদসূক্তে রূপায়িত হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে। বিভাবরীকে প্রচ্ছন্নতায় সমাহিত করিয়া সেই উষা থরে বিথরে যে সোনালী সৌন্দর্য্য আহরণ করে, তাহারই সুসমাবেশের অভ্যন্তর হইতে আলোকরাগদীপ্ত সূর্য্যদেবের অভ্যুদয় হয়, যাহার কিরণ-স্নানে প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রাণে নব জীবনের শিহরণ জাগে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী—দুঃখক্লেশ-অপমানের পরিপূর্ণ ডালি সাজাইয়া আমাদিগকে উপহার দিয়াছে, আমাদের হীনগৌরব ভাগ্য লইয়া করুণ অভিনয় করিয়াছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী পরিব্যাপ্ত আমাদের জাতীয় জীবনের রশ্মিচ্ছটাময় উষালোকের অভ্যন্তর হইতে বিংশ শতাব্দী কি ভারতের ভাগ্য-রবিকে প্রকাশমান করিতে সমর্থ হইবে না? সেই রবির পুষ্টি সরবরাহে আমরা কি নব জীবনের স্পন্দন অনুভব করিতে পারিব না? ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতে যে সকল জটিল সমস্যা দেখা দিয়া উহাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার একান্ত স্থূলতায় সংলিপ্ত না হইয়া আমরা ইহা বলিতেছি যে, যে বিংশ শতাব্দী আমাদের জাতীয় জীবনের চলন-ভঙ্গিমার মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছে, আমাদিগকে আত্মস্থ হওয়ার নির্দেশ দিয়াছে, আমাদের মধ্যে গণচিত্তপ্রবোধী এক নেতৃমণ্ডলী সৃজন করিয়াছে, সেই বিংশ শতাব্দী ভারতের সর্ব্বদিক্‌-প্রসারী কল্যাণ ও উন্নয়নে কখনও ব্যর্থতা প্রসব করিবে না, এই ভাব স্বতঃ হইয়া উঠিয়াছে আমাদের চিত্তে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আমাদের সেই নেতৃমণ্ডলীর এক দৃপ্ত তেজঃশালী নেতা। তাঁহার কর্ম্মময়, চলৎশীল জীবন আমাদের আলোচনার বিষয়।

জওহরলাল আজন্ম কর্ম্মী, কর্ম্মের সুদৃঢ় সংস্কার লইয়াই তাঁহার জন্ম। তাঁহার বংশানুক্রমিক আবেষ্টন তাঁহাকে অত্যদ্ভুত কর্ম্মশীল হইতেই প্রেরণা দিয়াছে। নির্ব্বাপিতপ্রায় মোগল-গৌরবের ধূম্র-মলিনতার ভিতরেও সম্রাট ফারুকশায়ার রাজা কাউলকে কাশ্মীরের পর্ব্বতোপত্যকা হইতে সমতল ভূমি দিল্লীতে অবতরণ করিতে আমন্ত্রণ করিলেন এবং রাজ সরকার হইতে তাঁহাকে জায়গীর প্রদান করিলেন। ইহা নিঃসন্দেহরূপে সম্রাট ফারুকশায়ার কর্তৃক রাজা কাউলের কর্ম্ম-প্রতিভার প্রতিদান। রাজা কাউল পণ্ডিত জওহরলালের এক ঊর্দ্ধতন পূর্ব্ব পুরুষ। প্রপিতামহ লক্ষ্মীনারায়ণ মোগল দরবারের আইন সচিবের পদে, পিতামহ মোগল সরকারের কতোয়ালের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারাও ছিলেন উন্নত সংস্কারবাহী, কর্ম্মী। পিতা মতিলালের জীবন-কাহিনী একান্ত আধুনিক, সর্ব্বজনবিদিত।

তাঁহার গৃহশিক্ষক ফার্ডিন্যাণ্ড টি ব্রুক্‌স ছিলেন থিওসফিষ্ট। ব্রুক্‌স সাহেব তাঁহাকে থিয়সফির রাজ্যে লইয়া অতীন্দ্রিয়তা, অবতারবাদ, অপ্রাকৃত জীবত্ব, কর্ম্মবাদ, বৌদ্ধদিগের ধম্মপদ এবং ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির পুস্তকাবলীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। তখন জওহরলালের বয়স এগার। তের বৎসর বয়সে তাঁহারই অনুপ্রেরণায় এবং অ্যানি বেশান্তের দীক্ষা গ্রহণে জওহরলাল থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন। থিওসফি অর্থ—ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ অজানা, বৃহৎ লোকের বিরাট রহস্যতত্ত্ব। চর্ম্ম চক্ষুর সম্মুখে জানার সদর দরজায় দুঃস্থ ভারত আমাদের নিকট যে সাহায্য ও সেবা দাবী করিতেছে, তৎপ্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়া অজানায় ডুবাডুবি করিবার মত মনোবৃত্তিসম্পন্ন জওহরলাল ছিলেন না, এখনও নহেন। ব্রুক্‌স সাহেবের অন্যত্র গমনের

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার থিওসফি চর্চ্চায় যে অবসান দেখা দিল, তাহাতে আমরা ইহাই বুঝি যে, তিনি তরুণ বয়স হইতেই যুক্তি বিচার-অগ্রগামী, প্রত্যক্ষবাদী। উৎসের অনুসন্ধানপ্রিয়তা তাঁহার ছিল না বা এখনও নাই, ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। উৎস নির্গলিত স্রোতের মূল্য বিচারে তিনি বালক বয়স হইতেই অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহাই আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য।

হেরো এবং কেম্‌ব্রিজের শিক্ষা সমাপনান্তে জওহরলাল যখন ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন তিলক কারারুদ্ধ, চরমপন্থীদল নেতৃত্ববিহীন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় বঙ্গদেশ স্তব্ধ, নরমপন্থীদল মলিমিণ্টো শাসনতন্ত্রের গতানুগতিকতায় গা ভাসাইয়া দিয়াছেন। বাঁকীপুর কংগ্রেসে জওহরলাল উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু কর্ম্মের কোন দীপ্ত প্রেরণা তিনি লাভ করিতে পারিলেন না। গোখেলের ভারত-ভৃত্য সমিতিতে যোগদানের আমন্ত্রণ পাইলেন বটে, কিন্তু উহা তাঁহার কর্ম্ম-প্রতিভার বিকাশস্থল বলিয়া বোধ হইল না। ভারতের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ-শক্তিকে পুনরাবাহন করিয়া শাশ্বত মহিমায় দীপ্তিশীল করিয়া তোলাই যাঁহার হৃদয়ের প্রাঞ্জল ও প্রশস্ত আকুতি, তাঁহাকে ধারণ করিয়া বাস্তব কর্ম্ম নিঃস্রাবে পুষ্ট হইতে পারে, এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান বা পারিপার্শ্বিকতা তখনও রচিত হয় নাই। কারাবাসের অবসানের পর তিলক হোমরুল-লিগ প্রতিষ্ঠিত করিলে তিনি উহাতে যোগ দিলেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের বৃহত্তর সমাকর্ষণ বোধ তাঁহার প্রখরতর হইয়াই রহিল। এলাহাবাদ হাইকোর্টে আইনব্যবসায় সুরু করিলেন বটে, কিন্তু তাহাও একান্ত অনিচ্ছায়।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মণ্টেগু চেম্‌সফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর তৎসম্পর্কে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয়, নরমপন্থীদল তাহা সদলবলে বয়কট করেন। উক্ত রিপোর্ট গ্রহণ করিব কি না অথবা প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজেরাই নিজেদের আত্মগঠন রিপোর্ট প্রস্তুত করিব কি না, ইহার আলোচনায় অংশ গ্রহণ না করিয়া তাঁহারা গতানুগতিকতায় আটকাইয়া রহিলেন। জওহরলাল তাঁহাদের প্রশংসা করিতে

পারিলেন না। চলমানতায় ভাসিয়া চলা জওহরলালের তেজোদীপ্ত স্বভাবের একান্ত পরিপন্থী।

প্রতিটি ভারতবাসী দেহমনের ঐশ্বর্য্যে, ধনমানের প্রাচুর্য্যে, স্বাধীন সত্তায় গর্বোন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া মুক্তবায়ু গ্রহণ করিবে কবে—ইহাই জওহরলাল ভাবিতেছিলেন, এমনি সময়ে ভারত গভর্ণমেণ্টের আইনশালায় বিধিবদ্ধ হইল, রাউলাট আইন। সৌরাষ্ট্র হইতে মহাত্মা গান্ধী ঐ আইনের প্রতিবাদে ঘোষণা করিলেন সত্যাগ্রহ ও হরতাল। জওহরলাল ঐ আইনের অমর্য্যাদা হইতে নিষ্কৃতি লাভের পক্ষে উহাকেই উৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়া বোধ করিলেন এবং মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহ-কমিটিতে যোগদানের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। সত্যাগ্রহের নীতির প্রতি তাঁহার এই যে অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ, তন্মধ্যে আমরা তাঁহার গণ-নেতৃত্বের যে প্রস্ফুরণ দেখিতে পাইয়াছি, তাহাই আমাদের চিত্তে তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ছাপ দিয়াছে বেশী, উপলক্ষটা আমাদের চক্ষে বড় হইয়া দেখা দেয় নাই।

জালিয়ানাওয়ালাবাগের শোচনীয় অভিনয়ের পর মহাত্মা গান্ধী যখন আর এক পদ অগ্রসর হইলেন, অসহযোগ ঘোষণা করিলেন এবং ভারতবাসীর স্নায়ুশিরায় বলিষ্ঠ সাহস সঞ্চারিত করিয়া তাহাদিগকে আত্মস্থ হওয়ার বাণী শুনাইলেন, তখন জওহরলালের জীবনে আর এক উন্নততর পরিবর্ত্তন ঘটে। ইংলণ্ড হইতে সদ্যপ্রত্যাগত, তরুণ যুবক, বার-এট্-ল জওহরলাল মহাত্মাজীর মন্ত্রবাণীর প্রতি দেশবাসীর দ্বিধাহীন সাড়ায় অপরিসীম আনন্দ বোধ করিয়াছিলেন।

বাস্তবিকপক্ষেই ভারতের যে রাজনীতি ও কর্ম্মনীতি পাশ্চাত্যের অন্ধ-অনুসরণে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছিল, তাহাকে বিপুল বেগে সংহত করিয়া মহাত্মাজী ভারতবাসীকে আত্মমুখী হইবার যে পন্থা প্রদর্শন করিলেন, পণ্ডিত মতিলাল ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তথা ভারতবাসীকে চলমান গতানুগতিকতা ও অতীতের পটভূমিকা হইতে এক অভিনব পরিবর্ত্তনশীলতায় চালাইয়া লইবার যে অত্যাশ্চর্য্য কৌশল ও অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাব প্রদর্শন করিলেন, তাহা উপমাহীন। সেই উপমাহীন দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উদ্বোধিত হওয়া ব্যতীত

জওহরলালের আর উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু এস্থলেও আমাদের বক্তব্য এই যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ভিতর দিয়া আমরা যে মানুষ জওহরলালকে লাভ করিতে পারিয়াছি, তাহা ঐ আন্দোলন অপেক্ষা বড় হইয়াই আমাদের চক্ষে দেখা দিয়াছে।

সাইমন কমিশন আগমন উপলক্ষে লক্ষ্ণৌতে যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইয়াছিল, সেই অহিংস বিক্ষোভকারীদের সহিত পুলিশের লাঠিপর্বের সংযোগের অবসানে জওহরলাল আপনি আপনাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "ইহার শেষ পরিণতি কোথায় ?"

সি এফ্ এণ্ডরুজ 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স দি ইমিডিয়েট নিড' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "অন্তরলোকের সমুত্থানই আত্মমুক্তির একমাত্র পথ; বাহিরের দান-দাতব্য, অনুগ্রহ-ঘোষণার ভিতর দিয়া আত্মমুক্তি সম্ভবপর নহে।"

জওহরলালের সেই প্রশ্ন আমাদের এই আত্মমুক্তি-রূপ পরিণতিই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। এইজন্যই বলি যে, তাঁহার কেন্দ্রানুগশক্তি প্রতি-নিয়তই তাঁহাকে সংবৃদ্ধি প্রদান করিতেছে। স্বরাজ্যদলে তিনি যোগ দেন নাই, কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সংস্রব নাই; তথাপি তিনি কর্মী। বর্তমান যুগের পঙ্কিলতাময় রাজনীতির উর্দ্ধেও তাঁহার কর্মের অবদানের প্রয়োজন আছে।

(২)

পণ্ডিত জওহরলালের 'আত্মজীবনী'তে মহাত্মা গান্ধীর চিন্তা, চলন ও কর্মের অত্যুজ্জ্বল প্রভাব সমধিকরূপে প্রতিফলিত; অথচ তাঁহাদের উভয়েরই অন্তর্নিহিত ভাবের ব্যঞ্জনা দুই বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। এই নেতৃদ্বয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং বস্তু ও ভাব গ্রহণের বোধভঙ্গীতে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আমরা এই প্রবন্ধে প্রদর্শন করিব।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে মহাত্মাজীর সহিত পণ্ডিত জওহরলালের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। জওহরলাল তখন তাঁহাকে বাস্তবতা হইতে দূরবর্তী

নিস্পৃহ এবং অ-রাজনৈতিক বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন। সত্যাগ্রহ এবং অহিংস অসহযোগ নীতির সক্রিয়তার প্রয়োগ সম্ভাবনা দেখা না দেওয়া পর্য্যন্ত মহাত্মাজীর সহিত জওহরলালের পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠে নাই। ভারতের দুঃখ-দুর্দ্দশার অপনোদন কল্পে মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহ এবং অসহযোগ নীতিই যে কালোচিত পন্থা, ইহা পণ্ডিত জওহরলাল সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে লিখিয়াছি। সেই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের আলোক ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিফলিত হইয়া যখন ভারতবাসীর চিত্তে স্বরাজ-অর্জ্জন-আকাঙ্ক্ষা-মূলে তাহাদের সঙ্কল্পকে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল, নেতৃবৃন্দের কারাবাস ও লাঞ্ছনা, দেশময় বিভীষিকার তাণ্ডবতা যখন তাহাদের সেই সঙ্কল্পের আলো নির্ব্বাপিত করিতে সক্ষম হইতেছিল না, তখন চৌরিচৌরার খণ্ড দুর্ঘটনার পর মহাত্মাজী এক ফুৎকারে তাহা একেবারে নির্ব্বাপিত করিয়া দিলেন। কারাগৃহের নির্জ্জনতায় বসিয়া জওহরলাল তাহাতে চিত্তবৈকল্য বোধ করিলেন। ভারতের মত সুবিশাল দেশে অহিংস আন্দোলনে যদি এজেণ্ট প্রভোকেটিয়ারের প্ররোচনায় বা অপর কোন অবাঞ্ছনীয় কারণে স্থান-বিশেষে হিংসার নগ্নতা প্রকটিত হয় এবং তাহারই জন্য গতিশীল আন্দোলনকে নিস্তব্ধ করিয়া দিতে হয়, তবে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি কি কল্পলোকের দুর্লভ বস্তু হইয়া থাকিবে না?—এই ভাবই তখন জওহরলালের চিত্তে তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছিল। জওহরলাল লিখিয়াছেন, "স্থান-বিশেষের হিংসাত্মক কার্য্যের প্রতিফল যদি ইহাই হয়, তবে অহিংস সংগ্রামের মূলগত দর্শন ও কলাকৌশলে নিশ্চয়ই অপূর্ণতা আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিবার পূর্ব্বে আমাদের তিন সহস্র লক্ষ লোক এবং তাহার অংশ-বিশেষকে কি অহিংস সংগ্রামের তত্ত্বে ও ব্যবহারিকত্বে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে?"

পরবর্ত্তী কালে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আলীপুর কারাগৃহে অবস্থান কালে জওহরলাল যখন শুনিতে পাইলেন, মহাত্মাজী কোনও নেতৃ-বিশেষের অ-সত্যাগ্রহী

জনোচিত আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া অসহযোগ আন্দোলন পুনরায় স্থগিত করি দিয়াছেন (যদিও সেই সময়ে আন্দোলনের সক্রিয়তা মন্দীভূত অবস্থায়ই ছিল তখনও পণ্ডিত জওহরলাল অত্যন্ত মানসিক বিপর্যয় বোধ করিয়া এই প্রক ভাবিয়াছিলেন, "মহাত্মাজীর উদ্দেশ্য কি ? অনেক বৎসরের ঘনিষ্ঠ সহবাসের ফলেও তাঁহার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আমি স্বচ্ছ রকমে বুঝি পারিলাম না। মহাত্মাজী নিজেও তাহা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিতেছেন কি —এতৎসম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে।"

জওহরলাল 'আত্মজীবনী'র অন্যত্র লিখিয়াছেন,—"মহাত্মাজীর চলন চরিত্রে এমন একটা অজ্ঞাত শক্তি প্রসুপ্ত আছে, যাহা চৌদ্দ বৎসরে ঘনিষ্ঠতাতেও আমি বুঝিতে পারিলাম না বলিয়া শঙ্কাগ্রস্ত। গান্ধীজী নিজে মধ্যেও এই অজ্ঞাত শক্তির বিদ্যমানতা স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছে যে, তিনি নিজে সেই শক্তিকে বহন করিতেছেন না, সেই শক্তিই তাঁহাকে বহন করিয়া চালনা করিতেছে এবং উহা যে তাঁহাকে কোন্ রহস্যলোকে লইয়া যাইবে, তাহা তিনি নিজেও বলিতে পারেন না।"

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে মহাত্মাজী এইরূপ অভিম প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, শুধুমাত্র গণচিত্তের কল্যাণপরায়ণ জাগরণশীলতা উপর যে কংগ্রেস সৌধের ভিত্তি সংস্থাপিত, সমষ্টি-চিত্তের ইচ্ছাই ঘনীভূ হইয়া যাহার শাখা-প্রশাখা নির্মাণ করিয়াছে, তাহা কোন কালেই ভাঙ্গি দিবার বস্তু নহে। স্বরাজ বা স্বাধীনতা অধিকৃত হলেও ইহা তাহার কর্মময় লইয়া বিদ্যমান থাকিবে। মহাত্মাজীর চিন্তাধারার এই অভিনবত্ব জওহরলালে মনে এক বিস্ময় মাত্রেরই সৃষ্টি করিয়াছিল।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মহাত্মাজী লিখিয়াছিলেন, "বিগত পঞ্চাশ বৎসরে ভারতবাসী যাহা-কিছু শিক্ষা করিয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাওয়ার ভিতরেই তাহাদের মুক্তি নিহিত। যন্ত্রগুণে পৃথিবীর সংস্কার-সাধনের প্রয়াস পাওয়া আর অসম্ভ সাধনে আত্মনিয়োগ করা একই কথা বলিয়া মনে করিতে হইবে।"

জওহরলাল মহাত্মাজীর এই অভিমতকে ভ্রমপূর্ণ এবং অনিষ্টকর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

জীবনপথে দুঃখ-দারিদ্র্যের অভিনন্দন মহাত্মাজীর কাম্য, জওহরলালের নহে। জনগণের পাপাচারের ফলে ভূমিকম্প এবং তত্তুল্য প্রাকৃতিক বিপর্যায়ের উদ্ভব হয়, ইহা মহাত্মাজীর অভিমত, জওহরলালের নহে। পাপ বা পাতিত্যের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভই মানবের স্বাধীনতা, মহাত্মাজী ইহা স্বীকার করেন, জওহরলাল করেন না। মহাত্মাজী ব্যক্তির আত্মিক উন্নয়ন দ্বারা তাহার বাহ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি বিধান করিবার অভিলাষী, জওহরলাল তাহা সম্ভবপর বলিয়া বিবেচনা করেন না। মহাত্মাজী জমিদার এবং তালুকদারশ্রেণীকে প্রজাসাধারণের স্বার্থের অছিস্বরূপ গঠন করিতে ইচ্ছা করেন। জওহরলাল তাহাও সম্ভবপর কার্য্য বলিয়া মনে করেন না।

অহিংসা সম্পর্কে মহাত্মাজী নানা প্রকারেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎ-সম্পর্কে জওহরলাল লিখিয়াছেন, "হিংসা আমার স্বভাবের বিরোধী বস্তু হইলেও আমি হিংসায় পূর্ণ। জানায় বা অজানায় আমি অপরকে পীড়ন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু মহাত্মাজীও অত্যধিকরূপে লোকের মানসিক পীড়ন করিয়া থাকেন। মহাত্মাজীর অহিংসার ভিতরে অপরকে বাধ্য করিবার ভাব শক্তিশালীরূপেই বিদ্যমান, যদিও তাহা অত্যধিক সুসংস্কৃতরূপে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।"

অসহযোগ আন্দোলনে মৌলবী এবং স্বামিবৃন্দ যোগ দিয়া এবং মহাত্মাজী ঐ আন্দোলনকে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার সোপান বলিয়া ঘোষণা করিয়া উহার বহিরঙ্গে ধর্ম্মের যে ছাপ প্রদান করিয়াছিলেন, জওহরলালের তাহা রুচিসম্মত হয় নাই, যদিও তিনি লিখিয়াছেন, "ধর্ম্মের বৃহত্তর বোধ হইতে রাজনীতিকে ধর্ম্মভাবাপন্ন করিয়া তুলিবার ভাব অতীব সুন্দর।"

মহাত্মাজী আপনাকে একজন ডেমোক্রেট বলিয়া ঘোষণা করেন, কিন্তু জওহরলাল লিখিয়াছেন, "আপন অভিলাষ ক্রমে কার্য্যসাধনের বিঘ্ন উপস্থিত হইলে

গান্ধীজী ডেমোক্রেসীর বিধানাবলীকে কদাচিৎ মর্য্যাদা দান করেন।" গান্ধী বলেন, জোর করিয়া ডেমোক্রেসী গঠন করা যায় না, বাহ্যবস্তুর উপর উ নির্ভরশীল নহে। ইহা একান্তপক্ষেই অন্তরের বস্তু। এই তত্ত্ব জওহরলাে নিকট দুর্ব্বোধ্য। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ম্যাকডোনাল্ড এওয়ার্ডের ধা বিশেষের পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য মহাত্মাজী যখন আমরণ উপবাসের সং ঘোষণা করিলেন, জওহরলাল ভাবিলেন, ইহা দ্বারা কি উক্ত এওয়ার্ডকে স্বীকৃ দান করা হইল না ? তিনি লিখিয়াছেন, "ধর্ম্মানুষিক্ত বোধভঙ্গী লইয়া রাজনৈতি প্রশ্নে আগমন করায় এবং তৎবিষয় সম্পর্কে মুহুর্মুহুঃ ঈশ্বরের নাম উল্লেখ কর আমি মহাত্মাজীর প্রতি রাগান্বিত হইয়া উঠিলাম। মহাত্মাজী এইরূপও বলি ইচ্ছা করেন বলিয়া বুঝা যাইতেছে যে, ঈশ্বরই তাঁহার উপবাসের তারিখ ধা করিয়া দিয়াছেন ! কি ভয়ানক কথা !"

গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন সংবাদ ঘোষণার পর দিল্লীতে সর্ব্বদ সম্মেলনের সিদ্ধান্তে জওহরলাল একমত হইতে না পারিয়া উক্ত সম্মেলন কর্তৃ প্রদত্ত বিবৃতিতে (সুভাষ বাবু ব্যতীত মহাত্মা গান্ধী এবং আরও কয়েক কংগ্রেস নেতা যাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন) স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইে এবং লাহোর কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি মহাত্মাজীর নিকট এক পত্র লিখিলেন। কিন্তু মহাত্মাজীর উত্তর পাওয়ার তাঁহার সকল বিরুদ্ধ ভাবই প্রশমিত হয়। পরবর্ত্তীকালের গান্ধী-আরুই প্যাক্টের ধারা-বিশেষেও মহাত্মাজীর সহিত তাঁহার প্রবল মতানৈক্য ছি যদিও তিনি কার্য্যতঃ মহাত্মাজীর অভিমতকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত জওহরলালের চিন্তাধারায় সুদারুণ পার্থক্য থা সত্ত্বেও বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া আমরা ইহা দেখিতেছি যে, মহাত্মা সচ্ছন্দ প্রয়াসেই পণ্ডিতজীকে আপন ব্যক্তিত্ব দ্বারা সমাকর্ষণ কর জাতীয় জীবন-পথের এক বিশেষ লক্ষ্যে পরিচালিত করিয়া লই যাইতেছেন।

(৩)

বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে গভর্ণমেণ্টের সহিত বঙ্গীয় জনসাধারণের যে প্রাদেশিক সংঘর্ষ ঘটে, তাহাই অহিংসার ভিত্তিতে সর্ব্বভারতীয় রূপ লইয়া পরবর্ত্তীকালে দেখা দেয়, স্বরাজ আন্দোলনে। স্বরাজ-অর্জ্জন-প্রয়াস-মূলে পণ্ডিত জওহরলাল পৌনঃপুনিক কারাবাসের ভিতর দিয়া যে আত্মনিগ্রহ বরণ করিয়াছিলেন, এই প্রবন্ধে আমরা তাহারই বর্ণনা প্রদান করিব।

আসমুদ্র ভারতের আনুমানিক ৩০ হাজার নরনারীর কারাবরণের পর ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সংযুক্ত প্রদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সমুদয় সদস্য সদলবলে ধৃত হন। জওহরলালও ধৃত হইয়া লক্ষ্ণৌ জেলে প্রেরিত হন। পরবর্ত্তী মার্চ্চ মাসে মুক্তি পাইয়া পুনরায় তিনি এপ্রিল মাসে ধৃত হন এবং লক্ষ্ণৌ জেলেই তাঁহাকে প্রেরণ করা হয়। লক্ষ্ণৌ জেলের একটি শোচনীয় ব্যাপার সম্বন্ধে জওহরলাল এইরূপ লিখিয়াছেন যে, জেলের নিয়ম ভঙ্গের অপরাধে আজাদ নামক ১৫।১৬ বৎসরের একটি বালককে বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল এবং প্রতি বেত্রাঘাতে বালক মহাত্মা গান্ধীর নামে জয়ধ্বনি করিয়াছিল। বালকের নিবেদিত বেদনা-বার্ত্তা যথাস্থানে পৌছাইয়াছিল কি না, তাহা জওহরলালের চিন্তাধারায় স্থান লাভ করে নাই বটে, কিন্তু শাস্তি প্রয়োগের ঐ বর্ব্বর প্রথায় তিনি অতি মাত্রায় বিচলিত হইয়াছিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জওহরলাল লক্ষ্ণৌ জেল হইতে মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি লাভের পর বিশুদ্ধ বায়ু, উন্মুক্ত প্রান্তর, সচল জনতা এবং সহকর্ম্মিগণের সহিত সাক্ষাৎকার তাঁহার অন্তরে আনন্দ উন্মাদনার সঞ্চার করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই; কেননা, তখন কাউন্সিল প্রবেশ লইয়া দুই দল কংগ্রেসসেবীর মধ্যে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়া গিয়াছিল।

১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে যে আন্দোলন চৌরিচৌরার দুর্ঘটনার জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছিল, তাহাই পুনরায় সক্রিয় হইয়া উঠিবার লক্ষণ দেখা দিল ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। গান্ধীজী আশ্বাস দিলেন যে, হিংসার ভাব আন্দোলনের সামগ্র্যকে স্পর্শ না করিলে উহাকে চলমান অবস্থায়ই রাখা হইবে। তদবস্থার ভিতরেই লবণ

আইন ভঙ্গের অপরাধে জওহরলালের কারাবাসের আদেশ হয়, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। এবার তিনি নাইনী জেলে স্থান পাইলেন। জওহরলাল লিখিয়াছেন, "নাইনী জেলের নৈশ পাহারাওয়ালাগণ পারস্পরিক হাঁকাহাঁকি গুলিকে নিরর্থকরূপে প্রলম্বিত করিয়া এবং বন্দীগণনার সংখ্যা নির্দ্দেশক ধ্বনিকে অনাবশ্যকরূপে উচ্চ এবং কর্কশ করিয়া তুলিয়া রাত্রির প্রশান্ত আবহাওয়াকে একান্তরূপে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিত; তদুপরি পরিদর্শক মহাশয়গণ উহাকে আরও বিচিত্র রকমের পরিদর্শনের প্রমাণ-প্রদানোপযোগী চীৎকার সংযোগ করিয়া বন্দীনিবাসকে এমনি একটা পর্য্যায়ে রূপান্তরিত করিয়া তুলিতেন, মনে হইত, যেন আমি এক ঘন-নিবিড় জঙ্গলের প্রান্ত সীমায় বাস করিতেছি এবং গৃহপালিত পশুগণ বন্য শত্রুর মুখব্যাদান হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সভয় চীৎকার করিতেছে; কখনও বা মনে হইত, নাইনী জেলখানাই যেন একটি বাস্তব অরণ্য এবং অরণ্যের হিংস্র পশুগণ নিস্তব্ধ রাত্রির বিশ্রম্ভালাপের অপূর্ব সুখ রস আস্বাদন করিতেছে।"

এই বর্ণনার স্থূলতাই লক্ষ্য করিবার বিষয় নহে, বর্ণনার অন্তরালে জওহরলালের মানসিক পীড়নের যে কাহিনী আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে তাহাই গূঢ়ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

১১ই অক্টোবর পণ্ডিত জওহরলাল নাইনী জেল হইতে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন তখন ভৈরব ছন্দে প্রবাহিত হইতেছিল বলিয়া এবং লর্ড আরুইনের দরবারে সাপ্রু-জয়াকরের শান্তি-দৌত্য নিষ্ফল হইয়াছিল বলিয়া জওহরলাল খুব বেশী দিন কারাগারের বাহিরে থাকিতে পারিবেন—এরূপ বোধ করিলেন না। প্রকৃতপক্ষেও তাহাই হইল। আট দিন পর তিনি ২ বৎসর ৫ মাসের জন্য পুনরায় নাইনী জেলে ফিরিয়া গেলেন। ডিসেম্বর মাসে সংযুক্তপ্রদেশের কতিপয় জেলে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে বেত্রাঘাত দণ্ড প্রদান করা হয়। এই সংবাদে জওহরলালের চিত্তের শান্ত ভাব একেবারে বিনষ্ট হইল। তিনি অপর তিনজন সহকর্মীর সহযোগে গভর্ণমেণ্টের নিব

এই বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করিলেন। তাহার কোন উত্তর না পাইয়া তাঁহারা ৭২ ঘণ্টা উপবাস করিয়া কার্য্যতঃ গভর্ণমেণ্টের নৃশংস আচরণের প্রতিবাদ জানাইলেন। পূর্ণ-দণ্ড-ভোগের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে (পণ্ডিত মতিলালের পীড়া বশতঃ) তিনি নাইনী জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী গ্রেফ্‌তার ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২৬শা ডিসেম্বর। ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে নাইনী জেলে নব-গঠিত ইউ পি অর্ডিন্যান্স অনুসারে তাঁহার বিচার হয়। বিচারের ফল দুই বৎসর কারাবাসের দণ্ড। তখন লর্ড উইলিংডন অত্যন্ত কঠোর হস্তে ভারত শাসন করিতেছিলেন। ৬ সপ্তাহ পর নাইনী জেল হইতে বেরিলি জেলে, তাহার ৪ মাস পর তাঁহাকে দেরাডুন জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। তখন রঞ্জিত পণ্ডিত এলাহাবাদ জেলে। স্বরূপরাণী নেহ্‌রু এবং কমলা রঞ্জিতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া অপমানিত হওয়ার ফলে জওহরলাল দেরাডুন জেলে বাহিরের কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শা আগষ্ট তিনি পুনরায় নাইনী জেলে স্থানান্তরিত হইলেন।

সেই সময়ে কংগ্রেস বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত। মহাত্মাজী মুক্ত বটে, কিন্তু তিনি হরিজন উন্নয়নে ব্রতী। জাতীয় উন্নয়নের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশই হরিজন উন্নয়ন, এই দৃষ্টিভঙ্গীতে জওহরলাল হরিজন আন্দোলনের স্বাতন্ত্র্য কার্য্যতঃ স্বীকার করেন নাই, এক্ষণেও করেন না। সুতরাং নাইনী হইতে কারামুক্তি পাইলেও তখনও যে তাঁহার মস্তকে পুনঃ গ্রেফ্‌তারের সম্ভাবনা ঝুলিতেছিল, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী; অস্তকরুণ রবির সোনালী রশ্মি মেঘের কোলে, গাছের মাথায়, দালানের চূড়ায়; জওহরলাল এলাহাবাদের নিজ ভবনে চা পানে রত। এমনি সময়ে তথায় পুলিশ সুপারের আবির্ভাব। জওহরলাল দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইলেন এবং বলিলেন, "আমি আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছি।" পুলিশ সুপার বিনম্র

ভাবে তাঁহাকে কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বাক্ষরযুক্ত গ্রেফ্‌তারী পরওয়ানা দর্শাইলেন। অপরাধ—কিছুদিন পূর্ব্বে প্রদত্ত কলিকাতা-বক্তৃতা দ্বারা তিনি জনসাধারণের শান্তি ভঙ্গ করিয়াছেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি কোর্টে তাঁহার দুই বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ হইল। জওহরলাল আলীপুর জেলখানায় প্রবেশ করিলেন। ৭ই মে তাঁহাকে আলীপুর হইতে দেরাদুন জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ১১ই আগষ্ট তাঁহাকে পীড়িতা কমলাকে দেখিবার জন্য এলাহাবাদে আনয়ন করা হয়। তাহার ১১ দিন পর তাঁহাকে নাইনী জেলে, তৎপর আলমোরা জেলে প্রেরণ করা হয়। অসহযোগ আন্দোলনে আলমোরার কারাবাসই পণ্ডিত জওহরলালের সর্ব্বশেষ কারাবাস। পৃথিবীর প্রখর-ব্যক্তিত্বশালীরূপে গণনীয় মানবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্‌রুর উচ্চ প্রেরণাদীপ্ত জীবনের ন্যূনাধিক আট বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, ভারতীয় কারাপ্রাচীরের নির্ম্মম আবহাওয়ায়। কারাকর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁহার কোনপ্রকার ব্যক্তিগত অভিযোগ নাই। কিন্তু ভারতবাসীর স্বরাজ-অর্জ্জন-প্রয়াস-মূলে কারাগৃহসমূহের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সংযোগ সময়ের এক সকরুণ, খণ্ড পরিণতিই বটে!

(৪)

পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্‌রুর 'আত্মজীবনী' সমালোচনা সম্পর্কিত বর্ত্তমান সর্ব্বশেষ প্রবন্ধে আমরা তাঁহার ব্যক্তিত্ব-বিকাশ-মূলে দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়াস পাইব।

জওহরলালের বাল্য শিক্ষক থিয়সফি বিদ্যানুসন্ধিৎসু এফ্‌ টি ব্রুক্‌স তাঁহাকে থিয়সফি চর্চ্চায় সমাকৃষ্ট করিয়া রাখিতে না পারিলেও তাঁহার বয়সের তারুণ্যে যে একটা বৃহত্তের বোধ উপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা তিনি সকৃতজ্ঞ-ভাবেই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার বাল্য বয়সে রুষ-জাপান যুদ্ধ এবং বোয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। সেই যুদ্ধ তাঁহার বালক মনকে যুদ্ধরত দুর্ব্বল

পক্ষদ্বয়ের প্রতিই সহানুভূতিপরায়ণ করিয়া তুলিয়া আর্ত্ত ও পীড়িতের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিবার একটা মানসিক ভাব তাঁহার চরিত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়াছিল।

১৫ বৎসর বয়সে জওহরলাল ইংলণ্ডে গমন করেন। হেরোতে পাঠরত অবস্থায় তাঁহার সহপাঠী ইংরাজ বালকদের সম্বন্ধে তিনি এক বার পিতাকে লিখিয়াছিলেন যে,—তাহাদের সাধারণ বোধশক্তি মোটেই প্রখর নহে, তাহারা শুধু খেলার কথাই চিত্তাকর্ষকভাবে আলোচনা করিতে পারে। তাহা হইতে আমরা ইহাই বুঝি যে, জওহরলালের সহপাঠিগণও তাঁহাকে স্বতন্ত্র উপাদানে চরিত্র-গঠন করিবার অবকাশ দিয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্টের যে সাধারণ নির্ব্বাচন হয়, উহা জওহরলালকে অত্যধিকরূপে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার স্কুলের শিক্ষক ছাত্রদিগকে নূতন গভর্ণমেন্ট সম্বন্ধে কে কত দূর জানে জিজ্ঞাসা করায় জওহরলাল তদানীন্তন ক্যাম্পবেল-বানারম্যান্‌স মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের নামের তালিকা সহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংবাদ জানাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পার্লামেন্টের উক্ত নির্ব্বাচনই সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞানে অনুসন্ধিৎসু করিয়া তুলিতে সাহায্য করে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি একবার আয়র্লণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। আমরা বলিব, আয়র্লণ্ডের জাতীয় আন্দোলন তাঁহার তরুণ মনকে প্রভাবান্বিত করিয়া তাঁহার চরিত্রে আত্মসংগঠনশক্তির বীজ উপ্ত করিয়াছিল।

ইংলণ্ডে অবস্থান কালেই লাজপত রায় এবং অজিত সিংহের বহিষ্কার, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, বয়কট, মহারাষ্ট্রে তিলকের রাজনৈতিক কার্য্য-কলাপ ইত্যাদি তাঁহাকে ভাবকেন্দ্রমুখী করিয়া তুলিতে সাহায্য করে; তাহারই ফলে জাতীয় জীবনসংগ্রামে সংঘাতশূন্য ও নির্দ্বন্দ্ব হইয়া কাল যাপন করিবার আকাঙ্খা তাঁহার হ্রাস পাইতে থাকে, 'এক্‌ষ্ট্রিমিজম্‌' বা গতানুগতিকতাবর্জ্জিত ভাব তাঁহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আধুনিক যুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের কর্ম্মগুঞ্জনময় ইংলণ্ডীয়

ভূমি জীবন-পরিচালনার নব দৃষ্টি-ভঙ্গীতে সমৃদ্ধ করিয়া তাঁহাকে নূতন ছন্দে আন্দোলিত করিতে প্রভূত পরিমাণেই সহায়তা করিয়াছে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া সেই বৎসরেই ডেলিগেট হিসাবে তিনি সর্ব্বপ্রথম বাঁকিপুর কংগ্রেসে যোগদান করেন। সেই কংগ্রেসের প্রাণপুরুষ গোখেলের অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব তাঁহাকে অত্যধিকরূপে আকৃষ্ট করিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলন ভারতে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা জওহরলালকে ভারতের কল্যাণ-চিন্তায় আত্মগত হওয়ারই শিক্ষা দেয়।

এফ্ টি ব্রুক্স, অস্কার ওয়াইল্ড, ওয়াল্টার পেটার, বার্ণার্ড শ প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিবৃন্দ এবং পিতা মতিলাল, অ্যানি বেশান্ত, তিলক, গোখেল, মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি প্রাচ্য মনীষিবৃন্দের ব্যক্তিত্বের পরিবেষ্টনে তাঁহার ব্যক্তিত্বের যে সহজাত সংস্কার পোষণ-উদ্দীপনা লাভ করে, তাহাই ক্রমে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের পর তাঁহারই ব্যক্তিত্বের পোষণ-ছায়ায় আশ্রয় লাভ করে। মহাত্মাজী তাঁহার যে অহিংস-নীতিকে মৌলিক মতবাদ আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন, সেই অহিংস নীতিকে সাময়িক সমস্যা সমাধানের একটা কৌশল হিসাবে গ্রহণ করিয়াও পণ্ডিত জওহরলাল আপন বৈশিষ্ট্যানুপাতিকভাবে মহাত্মাজীর ব্যক্তিত্ব হইতে যে পরিপুষ্টি গ্রহণ করিতেছেন, ভারতবর্ষ তাহার পরিণত ভাবরাজ্যের কোন্ উন্নত লোকে অবলোকন করিবে, তাহা ভবিষ্যতের কথাই বটে!

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে জওহরলাল ইউরোপ ভ্রমণে গমন করেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মনীষিবৃন্দের সহিত পৃথিবীর নানা সমস্যা লইয়া তাঁহার আলোচনা হয়। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জর্জ্জ ল্যান্সবারীর অধিনায়কতায় ব্রুসেল্স নগরীতে নির্য্যাতিত জাতি-সমূহের যে সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যোগদান করেন এবং প্রত্যক্ষভাবে তাহার সহিত যুক্ত হন। পরবর্ত্তী নভেম্বর মাসে তিনি সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের

দশম বার্ষিকী প্রতিষ্ঠার উৎসবেও যোগদান করিয়াছিলেন। সমগ্র পৃথিবীর সমস্যার সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় জওহরলালকে আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে।

বংশানুক্রমিক যে ধর্ম্ম-সংস্কারের প্রেরণা পণ্ডিত জওহরলালকে পরিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে, সেই ধর্ম্ম-সংস্কার ভারতীয় বৈশিষ্ট্যে শোভমান হইলেও তৎবৈশিষ্ট্য ভুলিয়া গিয়া এক্ষণে আমরা ধর্ম্মকে পোষাক-পরিচ্ছদ ও রহস্যময় আচরণের ভিতর দিয়া বুঝিবারই প্রয়াস করিতেছি। যে ধর্ম্মবোধ জওহরলালের ব্যক্তিত্বকে গঠন করিয়া ক্রমবিকাশমানতার ভিতরে চালনা করিতেছে, তৎসম্পর্কে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, ধর্ম্ম তাহাই যাহা মানুষের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উন্নতি বিধান করিয়া তাহাকে বর্দ্ধনশীলতায় প্রতিষ্ঠিত করে। বাহ্যকে অবহেলা করিয়া অন্তরকে যেরূপ উৎপ্রগতিপন্ন করিয়া তোলা যায় না, সেইরূপ অন্তরকে অগ্রাহ্য করিয়া বাহ্যের পরিপুষ্টি বিধানও সম্ভবপর নহে। সুতরাং বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক প্রগতিপরায়ণতা অভিলব্ধ হইবে যে পন্থায়, সেই পন্থা এইরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়, যাহাতে আসল উদ্দেশ্য বিফল হইয়া না যায়। তাহা হইলেই সেই পন্থাকে প্রকৃত ধর্ম্মপন্থা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

যে উপনিষদ্ ও গীতা বালক বয়সে তাঁহার সহিত কৌতুক করিত, তাহাই পরিণত বয়সে তাঁহাকে ভারতের আত্মলোকে টানিয়া লইয়া অন্তর্মুখীন করিয়াছে। জওহরলাল লিখিয়াছেন, "ভারতের আত্মায় এখনও তাহার শাশ্বত গরিমা প্রকাশমান। যে সুমহতী সংস্কৃতি স্মৃতির স্পর্শশূন্যতা লাভ করিয়াছে, ভারতবর্ষ ক্রম-বিবর্দ্ধনের দীর্ঘ পথ বাহিয়া সেই সংস্কৃতির সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়াই চলিয়াছে এবং তাহা হইতে উৎফুল্ল জীবন এবং সংযমপূত শক্তি আহরণ করিয়া অপরাপর দেশেরও পুষ্টি বিধান করিয়াছে।"

পণ্ডিত জওহরলাল বৃটিশ শাসন সম্পর্কে যে উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সূত্র ধরিয়া তাঁহার বিকারবিহীন ভাবরাজ্যের অন্তর্লোকে প্রবেশ

করিলে তাঁহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের গোড়ায় সকল বিষয়ের কারণ-জ্ঞানের বিদ্যমানতাই দেখিতে পাওয়া যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের ত্রুটি-বিচ্যুতির বিরুদ্ধে আমাদের কি অভিযোগ থাকিতে পারে? তাহা কি আমাদের নিজেদেরই অকৃতকার্য্যতার ফল নহে? ঝড়ের বিরুদ্ধে আমরা কোনও অভিযোগ করি কি? অতীতের কার্য্যকলাপে অবসন্নতা বোধ না করিয়া এক্ষণে আমাদের ভবিষ্যতের সম্মুখীন হওয়াই কর্ত্তব্য।"

পণ্ডিত জওহরলাল নিম্নোক্ত লেখায় আপন ব্যক্তিত্বকে নিঃশেষে উদ্ঘাটিত করিয়া আত্মস্থিতিলাভের যে এক অনির্দ্দেশ্য পটে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা আমাদের বিবেচনায় নির্দ্দেশ্য লোকের এক সুমহান্ স্থিতিপটই বটে! তিনি লিখিয়াছেন, "কলমুখরিত জনতা, অবসাদ ও ক্লান্তি-উৎপাদক গণ-অনুষ্ঠান, সীমাহীন বিতর্ক এবং রাজনৈতিক ক্লেদ-পঙ্ক আমার আত্মস্থিতির বাহিরের পটকেই স্পর্শ করে মাত্র। আমার জীবনের প্রকৃত দ্বন্দ্ব আমার অভ্যন্তর প্রদেশেই অবস্থিতি করিতেছে; আভ্যন্তরিক ক্ষুধার প্রশান্তিবিহীনতা হইতে সমুৎপন্ন সেই দ্বন্দ্ব বহু ভাব, বহু আকাঙ্খা ও শ্রেষ্ঠের প্রতি আনুগত্য প্রকাশশীলতায় বিজড়িত হইয়া বাহিরের জগতের বাহ্য ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।"

সত্য ও অহিংসা

(১)

রাজনৈতিক জগতে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা বলিতে হইবে। কেননা, যে অর্থে বর্ত্তমানে রাজনীতি শব্দ ব্যবহার করা হইতেছে, সেই অর্থে মহাত্মাজীকে রাজনৈতিক নেতা বলিয়া গণ্য করিলে তাহা শোভন হয় না। তাঁহার কর্ম্ম, চরিত্র এবং চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার ভিতরকার যে মানুষটির পরিচয় পাওয়া যায়, সেই মানুষটি নেভিল চেম্বারলেন, লর্ড হ্যালিফক্স জাতীয় মানুষ নহেন। বৃটিশ মন্ত্রিসভার (তদানীন্তন) প্রধান মন্ত্রী অথবা অপর কোন সদস্যের সহিত এস্থলে মহাত্মাজীর তুলনা করিতেছি না। মহাত্মাজীর প্রকৃত স্বরূপ যদি একজন ধর্ম্মনীতিবিৎ মনুষ্য বলিয়া অবধারিত করা যায়, তবে বৃটিশ মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ অথবা ভারতের বড় লাট ও ছোট লাট মহোদয়গণকে অধার্ম্মিক মনুষ্য বলিয়া ধরিয়া লইবার কোনই কারণ নাই। বস্তুতঃ ধর্ম্ম-সাধন বলিতে লোকালয়ের বাহিরে যাইয়া চক্ষু মুদিয়া ভগবানের ধ্যান করা, এরূপ আমরা বুঝি না। বৃটিশ সাম্রাজ্য বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে একটি বড় সংসার, ভারতবর্ষ বড়লাট মহোদয়ের পক্ষে একটি বড় সংসার ; এমনি প্রকারের সংসারের পরিচালনা, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা-বিধানের ভার যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যে শ্রেণীর লোক, সেই শ্রেণীর লোকদিগকে যদি অধার্ম্মিক বলিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে সরাইয়া রাখা যায়, তবে যাঁহারা তথাকথিত ধার্ম্মিক অর্থাৎ যাঁহারা লোকালয়ের বাহিরে বা গিরিগুহায় আছেন, তাঁহাদের দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিতে বিলম্ব হইবে না। মোটকথা, ধর্ম্ম অর্থ যদি সদবলম্বন বুঝায়, এবং সৎকে অবলম্বন করিবার উপায় দেখাইয়া দিবার জন্য দেশে বা সমাজে কোন প্রতিভাশালী মনুষ্যের বিদ্যমানতা সকল সময়েই থাকা বাঞ্ছনীয় হয়, ইহা যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তবে কাহারও সহিত তুলনা না করিয়াও ইহা বলা যাইতে পারে যে, গান্ধীজী সত্য ও অহিংসার বাণী দ্বারা মনুষ্য-সমাজকে সদবলম্বনের পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন বটে। এইখানেই মহাত্মাজীর চরিত্র বা ব্যক্তিত্বের সুমহান্ বৈশিষ্ট্য।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জগতে মহাত্মাজীর আবির্ভাব ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে; দীর্ঘ ১৮ বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষ তাঁহার কণ্ঠ হইতে সত্য ও অহিংসার বাণী শুনিতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাহা ১৮ বৎসর যাবৎই প্রচার করিতেছেন না। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি যে অহিংস-সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার সত্য ও অহিংসার বোধ সেই সময়েরও পূর্ব্বেকার। মূলতঃ এই সত্য ও অহিংসার বোধকে তাঁহার আজন্ম সহজাত সংস্কার বলিয়া গণ্য করাই সঙ্গত। গোলটেবিল বৈঠক উপলক্ষে বিলাতে গিয়া তিনি যেমন বৃটিশ জনসাধারণকে সত্য ও অহিংসার বাণী শুনাইয়াছিলেন, ভারতবর্ষের লাট-প্রাসাদের অভ্যন্তর হইতে অ-ভারতীয় সমাজকেও তিনি একাধিক বার সত্য ও অহিংসার বাণী শুনাইয়াছেন। এই কথাটি বলিবার আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার আবিষ্কৃত সত্য ও অহিংসার কথা অ-ভারতীয় লোকেরও শ্রবণযোগ্য করিয়া তুলিয়া এবং সর্ব্বত্র তাহার একটা গৌণ ফল বিতরণ করিয়া তিনি নিজের যে ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

বস্তুতঃ পক্ষেই এই মুণ্ডিত মস্তক, খর্ব্বকায় মানুষটির আহার-বিহার, চালচলন, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং ধর্ম্ম-বিশ্বাসে একান্ত অদ্ভুত রকমের বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও কর্ম্মজগতে প্রবেশের পর হইতেই তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াই আসিয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত সত্য ও অহিংসার বাণীকে মনে-প্রাণে একটি মনুষ্যও উপলব্ধি করিয়াছেন কি না অর্থাৎ তাঁহার সত্য ও অহিংসারূপ ধন যাহাতে কালের ফুৎকারে বাতাসে মিশিয়া না যায়, আচরণের ভিতর দিয়া তাহার বিহিত উপায় অবলম্বনের জন্য কেহ প্রস্তুত হইয়াছেন কি না, অথবা হইবেন কি না, সে বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। আবিষ্কারকের সহিত তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ সাধন করিতে যাইয়া আমরা যে অবস্থায় উপনীত হইলাম, সেই অবস্থায় সত্য ও অহিংসা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত তিনটি সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে:—

(১) এই সত্য ও অহিংসার কোন মূলগত ভিত্তি নাই।

(২) ইহার ভিত্তি আছে বটে, কিন্তু ইহাকে যত বড় বস্তু বলিয়া প্রচার করা হয়, আসলে উহা তত বড় নহে।

(৩) ইহাই আধুনিক মানব-সমাজের সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশের পক্ষে একমাত্র উৎকৃষ্ট পন্থা।

আমরা দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি।

যে যে দেশ তাহাদের সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা হইতে অপর দেশের কর্ত্তৃত্ব অপসারিত করিয়াছে, সেই সেই দেশ সশস্ত্র পন্থার প্রয়োগ দ্বারাই তাহা করিতে সক্ষম হইয়াছে। যে দেশ সশস্ত্র পন্থা অবলম্বন করে নাই, অথচ সম্পূর্ণ বা আংশিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, সেই দেশও সশস্ত্র আবহাওয়ার ভিতর দিয়াই তাহা লাভ করিয়াছে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে আপোষনামা রচনা তখনই সম্ভবপর হয়, যখন সশস্ত্র যুদ্ধের অপরিসীম ক্লেশ ও ক্ষতি সুস্থ বিচারের বিষয়ীভূত হয়। ইহা সত্য হইলেও এই প্রকারের আপোষ-নামা রচনা দ্বারা সশস্ত্র যুদ্ধের সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া যায় না। মোটকথা, সত্য ও অহিংসার প্রয়োগ দ্বারা কোন জাতি যে অপর জাতির কর্ত্তৃত্ব দূর করিতে পারে, ইহা ইতিপূর্ব্বে আর কেহ শুনে নাই। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার ইতিহাস বেদগ্রন্থেও মারামারি, হানাহানির পরিচয় আছে। বস্তুতঃ পক্ষে, জীব-বিজ্ঞান যে কালে মনুষ্যেতর জীবের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করেন, সেই কাল হইতে জীবে জীবে যে মারামারি, হানাহানি সুরু হইয়াছে, তাহাই ক্রম-বিবর্ত্তনে বর্ত্তমান মানব-সমাজ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছাইয়াছে; নখ-দন্ত, হস্ত-পদ, ইট-পাথর, তীর-ধনুক—বুলেট, মেসিনগান, বোমা নিক্ষেপকারী এরোপ্লেন ইত্যাদিতে রূপান্তর লাভ করিয়াছে। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতি সত্য ও অহিংসার বাণী প্রকারান্তরিতভাবে প্রাণপাত সাধনায় প্রচারিত করিয়াও মানব-সমাজকে সত্যব্রতী ও অহিংসব্রতী করিতে সক্ষম হন নাই। অতীত যুগের মনুষ্যের এই মারামারি-হানাহানির ইতিহাস চক্ষুর উপর ন্যস্ত রাখিয়াও এবং বিগত মহামানবগণের সাধনার

আংশিক ব্যর্থতা দর্শনেও যে যে দেশ সশস্ত্র যুদ্ধ বা যুদ্ধাভিনয়ের সহায়তা ব্যতীত যে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারে নাই,—একান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, মহাত্মাজীর সত্য ও অহিংসার প্রয়োগ দ্বারা আমরা ভারতবাসী—সেই সেই দেশের দৃষ্টান্তে কিছুমাত্র গুরুত্ব আরোপ না করিয়া সহজ বিশ্বাসে ইহা গ্রহণ করিয়াছি যে, আমরা সেই স্বাধীনতা আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইব।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা দেশে যে আন্দোলন দেখা দিয়াছিল, তাহা ছিল সহিংস। বঙ্গভঙ্গ রদ করায় তাহা নির্ব্বাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মহাত্মাজী আমাদিগকে সত্য ও অহিংসার বাণী না শুনাইলে স্বাধীনতা অর্জ্জনের উপলক্ষ ধরিয়া তৎ-প্রকারের সহিংস আন্দোলনই আসমুদ্র-ভারতে বর্ত্তমান কালে দেখা দিত। ভারতবর্ষের যৌবন বিশ্বযৌবনের অংশ বিশেষ এবং ব্যবহার ও আচরণ বস্তুটি একান্তপক্ষেই সংক্রামক। স্বাধীনতা-অর্জ্জন-কল্পে যুদ্ধবিগ্রহরূপ যে সংক্রামক ব্যবস্থা বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে দেখা দিয়াছিল, তাহা হইতে আমাদের অব্যাহতি পাওয়ার কিছুমাত্র উপায় ছিল না, যদি মহাত্মাজী আমাদের মধ্যে আবির্ভূত না হইতেন। অবশ্য যে সময়ের মধ্যে আমরা স্বরাজ পাইব বলিয়া তিনি ভরসা দিয়াছিলেন, সেই সময়ে আমরা স্বরাজ পাই নাই, নিকট ভবিষ্যতেও পাওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। কেন আমরা সেই স্বরাজ লাভ করিতে পারি নাই, তাহার যুক্তি মহাত্মাজী এইরূপ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে,—তোমরা আমার নির্দ্দেশ মত কাজ করিতে পার নাই, কাজেই স্বরাজ পাও নাই। এই যুক্তি অযৌক্তিক। মূল নির্দ্দেশ যে ত্রুটিশূন্য হইয়াছিল, তাহার কোনই অভ্রান্ত প্রমাণ নাই। তবে কি আমরা তাঁহার প্রচারিত সত্য ও অহিংসাকে অনুসরণ করিয়া আমাদের শ্রেষ্ঠতম চাহিদাকে জলাঞ্জলি দিবার উপক্রম করিয়াছি ?

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের যে বাৎসরিক অধিবেশন হয়, তাহাতে মহাত্মাজীর অধিনায়কতায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয়

হ, 'বৈধ ও শান্তিপূর্ণ' উপায়ে স্বরাজ লাভই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। পরবর্ত্তী কালে 'বৈধ ও শান্তিপূর্ণ' বাক্যের স্থলে 'সত্য ও অহিংস' বাক্য প্রয়োগ করিতে মহাত্মাজী চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার অনুগামীদের ওজর-আপত্তিতে তিনি তাহা কংগ্রেসে গ্রহণ করাইতে পারেন নাই। আপত্তি-কারীদের হেতু এই যে, উদ্দেশ্য সাধনের কৌশল হিসাবে 'বৈধ ও শান্তিপূর্ণ' বাক্যকে মানিয়া লইয়াছি, কিন্তু বাক্যে আচরণে ও মননে 'সত্য ও অহিংস' হওয়া যখন সম্ভবপর হইবে না, তখন উহাকে গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া কংগ্রেস দরকারে লিখাইয়া লইয়া আত্মপ্রতারণা করিয়া লাভ কি? অবশ্য সত্য ও অহিংসাকেও উদ্দেশ্য সাধনের কৌশল হিসাবে আমরা ত মানিয়াই চলিয়াছি। এখানেও সেই চির পুরাতন ব্যবহারিকতা। আদিম মানব সমাজও বলিয়াছে, আমরা সত্য ও অহিংস হইতে পারিব না, মধ্যযুগের মানব সমাজও তাহাই বলিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের মানব সমাজও তাহাই বলিতেছে। অথচ এই সত্য ও অহিংসার আবিষ্কর্ত্তা গান্ধীজীর নেতৃত্বও আমরা পরিহার করিয়া চলিতে পারিতেছি না।

সুদীর্ঘ আঠার বৎসর ব্যাপিয়া কংগ্রেসের আঠারটি বাৎসরিক অধিবেশনে যে কণ্ঠে সত্য ও অহিংসার যশোগীতি গান করা হইয়াছে, বিগত ত্রিপুরী কংগ্রেসে সেই কণ্ঠ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিপুল সমস্যা ঘনাইয়া তুলিয়াছে।

(২)

ত্রিপুরীতে সত্য ও অহিংসা লইয়া যে অশোভন অভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহা অনিবার্য্যরূপে সুরাটের স্মৃতিকেই জাগরিত করিয়া তোলে। সুরাট কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, ত্রিপুরী কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যাইবার মত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও ভাঙ্গিয়া যায় নাই বটে, কিন্তু তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার গ্লানি অপেক্ষাও অধিকতর গ্লানিতে প্রলিপ্ত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ জগৎ হইতে আমাদের দৈনন্দিন

কর্ত্তব্যের মূলসূত্র আহরণ করা কঠিন, প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পশ্চাতে যে সূক্ষ্মজগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে, একমাত্র সেখানেই আমাদের ন্যায়নিষ্ঠ কর্ত্তব্যনীতির সন্ধান মিলিতে পারে, ইহা একটি দার্শনিক তত্ত্ব। মহাত্মা গান্ধীর আবিষ্কৃত সত্য ও অহিংসা আমাদিগকে ইহাই জানাইয়া দেয় যে উহা ঐ সূক্ষ্মজগতেরই বস্তু; কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেস তাহার যে ব্যবহারিক পরিচয় প্রকাশ করিয়াছে, তাহা উহার বিপরীত কথাই ঘোষণা করিয়াছে।

গান্ধী-সুভাষ পত্রাবলীর ভিতর দিয়া আমরা নিশ্চিতভাবে জানিতে পারিয়াছি যে, মহাত্মাজী পন্থ-প্রস্তাবের পক্ষেও ছিলেন না, বিপক্ষেও ছিলেন না। তথাপি আমাদের সুনিশ্চিত অভিমত ইহাই যে, ত্রিপুরীতে মহাত্মাজী উপস্থিত থাকিলে উহা ততখানি বিষাক্ততা সৃজন করিত না, যতখানি বিষাক্ততা সৃজন করিতে উহা সক্ষম হইয়াছে। ত্রিপুরীতে মহাত্মাজীর উপস্থিতির পক্ষে যে বিঘ্ন প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছিল, তাহা রাজকোট সমস্যা। কিন্তু উহা যে আদতে কোন সমস্যাই নহে অর্থাৎ অহিংসার সক্রিয়তা লইয়া উহার সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়ার পক্ষে যে বিশেষ কারণ ছিল না, তাহা আমরা তাঁহার পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপে স্পষ্টই জানিতে পারিলাম। সুতরাং মহাত্মাজীর ত্রিপুরীতে অনুপস্থিত থাকিবার কারণ অন্যত্র খুঁজিয়া দেখা প্রয়োজন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার 'আত্মজীবনী'তে মহাত্মা গান্ধীকে ভারতের জনসাধারণের আদর্শ প্রতীক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই কথার মূল্য বর্ত্তমান মতসংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক আবহাওয়ার ভিতরেও যদি যাচাই করিয়া দেখিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে লঘু বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তা লইয়া তাহার বিচার করিলে সঙ্গত হইবে না। মহাত্মাজীর বর্ত্তমান রাজনৈতিক কর্ম্মধারা আমাদিগকে স্বরাজ-সৌধের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইতেছে কি না, এই দুরূহ প্রশ্ন এখানে না তুলিয়াও আমরা ইহা অকুণ্ঠিত-চিত্তে বলিতেছি যে, ব্যক্তি-বিশেষের অখণ্ড জীবনের বিচারে তাহার খণ্ড কার্য্যকলাপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। এমনও হইতে পারে যে, মহাত্মাজীর বোধবুদ্ধি

যে উচ্চ লোকের সংস্কার দ্বারা অলঙ্কৃত, তাহা প্রস্ফুরণশীল হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইতেছে না বলিয়াই বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা যেমন তাঁহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, তিনিও তেমনি তাঁহার কর্ম্মনীতির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার সেই উচ্চ সংস্কারের মূল্য প্রদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়াও আমরা ইহা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য যে, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ার পর মহাত্মাজী যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহা তাঁহার পদমর্য্যাদার উপযোগী হয় নাই। সমাজে বা দেশে যাঁহারা বড় হইয়াছেন, তাঁহাদের বড়ত্বের একটি গুণ এবং একটি দোষ ইহাই যে, উহা যেমন কল্যাণ প্রসব করিতে সক্ষম, অকল্যাণকে আবাহন করিতেও তেমনি অপারগ নহে,—যদিও তাঁহাদের কর্ম্মনিঃসৃত শেষোক্ত বস্তুর প্রভাব সাময়িক মাত্রই হয়। ইহা লিখিয়া আমরা কখনও ইহা বুঝাইতেছি না যে, কংগ্রেসে বর্ত্তমানে যে দ্বৈত মনোভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, অর্থাৎ মহাত্মাজী যে কংগ্রেস নেতৃমাত্রকেই আপন চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত করিয়া চালাইয়া লইয়া যাইতে পারিতেছেন না, ইহা তাঁহার ঐ বিবৃতি রচনারই ফল।

আমরা ইহা জানি যে, বস্তুই শুধু অবিনশ্বর নহে, চিন্তাও অবিনশ্বর বটে। বাহির হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে আঘাত-প্রত্যাঘাত পাওয়ার ফলে আমাদের চিৎশক্তিতে যে কম্পন জাগে, তাহার আলাদা আলাদা ব্যষ্টি কম্পনের নাম চিন্তা এবং এই চিন্তার পর্য্যায়ক্রমিক যে চলন তাহাই মন। রাজকোট সমস্যার কারণে মহাত্মাজীর নিজেকে আমরণ উপবাস-ক্লেশে নিক্ষেপ করিবার সঙ্কল্প বা গভীর মননশীলতার উৎপত্তি স্থলে যাইয়া আমরা যদি ইহা আবিষ্কার করি যে, সভাপতি নির্ব্বাচন সম্পর্কিত তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বিবৃতি হইতে উদ্ভূত দেশময় এক প্রবল বিরুদ্ধ সমালোচনাই তাঁহার তৎসঙ্কল্পের উৎপত্তির একমাত্র হেতু, তবে তাহা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশুদ্ধই হয়। চিৎকম্পন বা চিন্তা যখন বিনাশশীল নহে, তখন তাহার উৎপত্তিতে কোন-না-কোন দিকে তাহার ক্রিয়াশীলতা প্রকাশ পাইবেই। আমরা যে কোন কর্ম্মই করি না কেন, তাহার উৎপত্তির পশ্চাৎপটে

পারিপার্শ্বিকের আঘাত-প্রত্যাঘাত জনিত আমাদের চিৎকম্পন থাকেই। পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা মহাত্মাজীর সত্য ও অহিংসার বোধকে তাঁহার আজন্ম সহজাত সংস্কার বলিয়া গণ্য করিয়াছি। যিনি বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনিতে একেবারেই অভ্যস্ত নহেন অর্থাৎ যিনি আপন প্রখর ব্যক্তিত্ব দ্বারা সমষ্টি মানবের এক বিরাট অংশকে তাঁহার মতাবলম্বী করিয়া চালাইয়া লইবার সক্ষমতা এক্ষণেও অন্তরে পোষণ করিতেছেন, তিনি স্ব-রচিত পূর্ব্বোক্ত বিবৃতির বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতিক্রিয়ায় তাঁহার সহজাত সংস্কার সত্য ও অহিংসার বোধ হইতে উদ্ভূত উপবাসাদি ক্লেশে বা আত্মপীড়নেই যে আপনাকে নিপাতিত করিবেন, তাহার বিরুদ্ধ ব্যবস্থায় আপনাকে নিক্ষেপ করিতে পারেন না, ইহাও তাঁহার মননধারারই বিজ্ঞানসিদ্ধ একটা পরিণতি মাত্র। সুতরাং তাঁহার সেই বিবৃতির পশ্চাদ্বর্ত্তী ঘটনাসমূহে না যাইয়াও আমরা ইহা বলিতেছি যে, উক্ত বিবৃতিমূলে তাঁহার যে মানসিক বিপর্য্যয় ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই তাঁহার ত্রিপুরীতে উপস্থিত হইতে না পারিবার পক্ষে প্রধান কারণ ছিল বটে।

অবশ্য যাঁহারা দ্রষ্টাপুরুষ, যাঁহারা অন্তর জগতের স্তর-পারম্পর্য্যকে বাস্তব বোধে অতিক্রমণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বলা চলে না যে, পারিপার্শ্বিকের সংঘাতজনিত সকল প্রকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতেই তাঁহারা আন্দোলিত হইয়া উঠেন। অন্তর্জগতে অগ্রগমনশীল হইয়া চলিবার অনুপাতে তাঁহারা তাঁহাদের চিত্তবিক্ষেপের লয় সাধন করিয়া দিতে পারেন। মহাত্মাজীকে সর্ব্বান্তঃকরণে একজন শ্রেষ্ঠ মনুষ্য বলিয়া স্বীকার করা সত্বেও আমরা তাঁহাকে দ্রষ্টাপুরুষ আখ্যা দিতে সঙ্কুচিত। বোম্বাই হইতে লণ্ডনে গমনশীল জাহাজকে সাধারণ মানবীয় স্তর হইতে দ্রষ্টাপদবীতে পৌঁছিবার যান বলিয়া যদি কল্পনা করা যায়, তবে আমরা ইহা বলিতেছি যে, মহাত্মাজী উক্ত জাহাজের টিকেট ক্রয় করিয়াছেন বটে।

এই বিংশ শতাব্দীর প্রত্যক্ষ পট-ভূমিকায়! মানুষের সহিত মানুষের

যে রেষারেষি, দ্বন্দ্ব, হিংসাপরায়ণতা—এক কথায় মানুষের যে পাশব কদর্য্যতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহারই আঁধার-ঘেরা অমাবস্যার বক্ষে মহাত্মাজীর আবিষ্কৃত সত্য ও অহিংসা জগৎকে প্রকৃত পথ-নির্দ্দেশের আলোক প্রদান করিবে কি না, এক্ষণে তাহার আলোচনায় আমরা প্রবেশ করিব না। কিন্তু তাঁহাকে ঘিরিয়া যে ঘটনাবলী প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, তাহার উপর স্বচ্ছ দৃষ্টিপাতে আমরা যাহা বুঝিতেছি, তাহা আমাদের নিকট অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক বলিয়াই বোধ হইতেছে। মহাত্মাজী সম্প্রতি দেশের আবহাওয়ায় যতই হিংসার গন্ধ পাইতেছেন অর্থাৎ দেশের জনসাধারণের এক অংশ-বিশেষ যতই তাঁহাকে দুর্ব্বোধ্য ভাবিয়া তাঁহার প্রচারিত সত্য ও অহিংসাকে যথোচিত মর্য্যাদা দানে কৃপণতা করিতেছেন, ততই তিনি স্বয়ং সত্য ও অহিংসায় গভীরভাবে আস্থাশীল হইয়া উঠিতেছেন এবং যদি বা তাঁহার সেনাপতিত্ব পদ ভারতক্ষেত্রে অবনমিত হয়, তদ্দরুণ তিনি রাজকোট সমস্যার সমাপ্তি-সাধন-ব্যাপারে তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুগামীদিগকে ইহাও জানাইয়া দিয়াছেন যে, সত্য ও অহিংসার প্রয়োগ কৌশল লইয়া তিনি যে পরীক্ষা চালাইতেছেন, তাহারা যদি উহাকে তাঁহার (মহাত্মাজীর) খামখেয়ালী বলিয়াও সিদ্ধান্ত করেন, তথাপি তিনি সত্য ও অহিংসার আবিষ্কারক বলিয়া তাঁহার (মহাত্মাজীর) প্রতি তাহাদের আস্থা রাখিতেই হইবে। আপনাকে কেন্দ্র করিয়া মহাত্মাজী ভারতকে কোন্ দিকে চালনা করিয়া লইয়া যাইতেছেন, এতৎ জ্ঞানের তিনি পর্য্যাপ্ত আলোক পাইয়াছেন কি না, আমরা জানি না; কিন্তু আমরা ইহা বুঝিতেছি যে, বর্ত্তমান কালে মহাত্মাজীর সুমহান্ জীবন এই ঘনীভূত আকাঙ্খার ভিতর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, ভারতবাসীর চিন্তায় ও কার্য্যে হিংসার ভাব যেন কখনও জাগরিত না হয়; তবেই অহিংসা ক্রমে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্তি লাভ করিতে পারিবে।

সত্য ও অহিংসা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য কি—তাহা লিখিবার পূর্ব্বে আমরা সত্যাগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রাখি।

(৩)

অহিংস সত্যাগ্রহের অর্থ, আত্মনিগ্রহ দ্বারা অন্যায়কারীর চিত্তশুদ্ধি ও কর্ম্মশুদ্ধি। সত্যাগ্রহের ব্যবহারিক পরিচয় দ্বারা আমরা তাহার অর্থ ঐরূপই বুঝিতে পারি। মহাত্মাজীর পারিবারিক আবেষ্টনের ভিতরেই এই সত্যাগ্রহ সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তি লাভ করে। ইহা সর্ব্বপ্রথম ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়। তৎপর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারত-গভর্ণমেণ্ট রাউলাট আইন রচনা করিলে উহারই বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহকে প্রয়োগ করা হয়। পরবর্ত্তী স্বরাজ আন্দোলনেরও মূল ভিত্তি ছিল ঐ সত্যাগ্রহ। মোটের উপর মহাত্মাজী আমাদিগকে যে নূতন ভাবধারা ও কর্ম্মধারা দান করিয়াছেন, তাহা হইতে অহিংস সত্যাগ্রহকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়ার উপায় নাই। পণ্ডিত জওহরলাল তাঁহার 'আত্মজীবনী'র এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, মহাত্মাজী সংস্কারতঃ প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার বিরোধী বলিয়া এবং ভারতের স্বরাজ অর্জ্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলিয়া আমাদের স্বরাজ লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অনমনীয়ভাবে এবং একান্ত অভিনব উপায়ে ভারতের জনশক্তিকে বাস্তবভাবে সক্রিয় করিয়া তুলিবেন এবং স্বয়ং আপন লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। পণ্ডিত জওহরলাল মহাত্মাজীর সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, মহাত্মাজীর অবদান-বৈশিষ্ট্য হইতে অহিংস সত্যাগ্রহকে খসাইয়া লইলে সেই অভিমতের কোনই মূল্য থাকিবে না, মহাত্মাজীও আত্মসম্পদে রিক্ত হইয়া পড়িবেন।

মহাত্মাজীর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ভারতের সমষ্টিগত জনসঙ্ঘের উপর যে কল্যাণ বর্ষণ করিয়াছে, তাহা আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিয়াও এবং মহাত্মাজীর গাঢ় মননশীল অবস্থার নির্দ্দেশাবলী তাঁহার যে একটা বিশেষ অন্তর্বিকাশমূলক লক্ষ্যের নির্দ্দেশ করে, তাঁহাকে সেই লক্ষ্যের দিক্‌পালরূপে অভিহিত করিয়াও আমরা ইহা বলিতেছি যে, তাঁহার আবিষ্কৃত অহিংস সত্যাগ্রহকে আমরা বর্ত্তমানে যে আকারে পাইতেছি, তাহা দ্বারা যদি আমরা

উহাকে মানবের শাশ্বত-কল্যাণ বিধানোপযোগী একটি বস্তুর পূর্ণতম অভিব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করি, তবে মানব-জীবনের মূলতত্ত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞানেরই পরিচয় দেওয়া হইবে। সমষ্টির আকারে আকারিত জনসঙ্ঘ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ছিল, সহস্র সহস্র বৎসর পরেও থাকিবে। মানব-জীবনের এই যে চিরন্তন প্রবাহ, তাহার মৌলিক দুঃখের গোড়া বিনাশ করার পক্ষে ব্যক্তি-বিশেষ, দল-বিশেষ, জাতি-বিশেষ বিরোধী হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা কি প্রকারে চিন্তনীয় হইতে পারে? মানবগোষ্ঠীর বহিরঙ্গে আমরা যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করিতেছি, সেই সাম্যবাদের আসল রূপ কি সমষ্টি-মানবের অস্তিত্বের সহিত সংগ্রথিত নহে? মোটের উপর, মানবের মস্তিষ্ককোষ হইতে বিকৃত গ্রন্থির মূল উৎপাটনের প্রয়াস না করিয়া অপরের আত্ম-নিগ্রহ দ্বারা তাহার কর্ম্মশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? এক ব্যক্তি ঔষধ সেবন করিলে অপর ব্যক্তির ব্যাধি নিরাময় হয় কি? এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং ভারতবর্ষেও সত্যাগ্রহ যে সাময়িক ফল প্রসব করিয়াছে, তাহা আমরা মোটেই বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু সেই সাময়িক ফল স্থায়ী ফলে পর্য্যবসিত না হওয়ায় অর্থাৎ একই ব্যক্তি বা একই জনসঙ্ঘ দ্বারা অপর ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সঙ্ঘের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের পৌনঃপুনিক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দূরীভূত না হওয়ায় একের সত্যাগ্রহ যে অপরের গ্রন্থিমোচনজনিত চিত্তশুদ্ধি ও কর্ম্মশুদ্ধির পক্ষে সহায়কারী নহে, তাহাই প্রমাণিত হয় না কি? অধিকন্তু সত্যাগ্রহের যে একটি ব্যষ্টিরূপ আছে, তাহার অভিব্যক্তিতে সংখ্যাতীত অপব্যবহার হওয়ারও সম্ভাবনা আছে না কি? মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করা হয় নাই কি?

মহাত্মাজীর আচরণে যখন সঙ্কট উপস্থিত হয়, তখন গীতা হইতেই তিনি তাহার সমাধান বাহির করেন বলিয়া 'অনাসক্তিযোগ' নামক গীতাভাষ্যে লিখিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে ইহা একান্তপক্ষেই স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ না হইলেও অপ্রত্যক্ষ অধিনায়কতায় অনুষ্ঠিত কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকে হৃদ্‌গত যুদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইয়া তিনি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণকে আসুরী-বৃত্তি এবং

পাণ্ডু পুত্রগণকে দৈবী-বৃত্তিতে ভূষিত করিয়াছেন। ধার্ত্তরাষ্ট্র এবং পাণ্ডবগণকে রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিলে শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতাকেও উড়াইয়া দেওয়া হয় কি না, তাহার বিচার মহাত্মাজীরই আত্মবোধের উপর অর্পণ করিয়া ইহা লিখিতেছি যে, তিনি বিবৃতি-বিশেষের ভিতর বানর-সেনার সাহায্যে শ্রীরামচন্দ্রের সমুদ্র লঙ্ঘন স্বীকার করতঃ প্রকারান্তরে রাবণের সহিত নিখিল বিশ্বাত্মার প্রাক্ প্রকাশরূপ শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বটে। হজরত মোহাম্মদের যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িত হওয়া এবং স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ঘটনা। এতৎ সম্বন্ধে মহাত্মাজীর অভিমত কি, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু বন্দুক-বেয়োনেট লইয়া যে যুদ্ধ করে এবং যে তাহার যুদ্ধ-কার্য্যে সাহায্য করে, অহিংসার দৃষ্টিতে তাহাদের দুই জনের ভিতরে কোন পার্থক্য নাই, এতৎ-প্রকারের যুক্তিতে সৈন্যদের শুশ্রূষায় নিযুক্ত ব্যক্তিও যুদ্ধের দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারেন না, ইহা স্বীকার করিয়াও মহাত্মাজী বোয়ার যুদ্ধে এবং বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে আহত সৈন্যদের শুশ্রূষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপর্যুক্ত মহাপুরুষদ্বয়ের প্রত্যক্ষভাবে এবং তাঁহার নিজের অপ্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কথার উল্লেখে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, অহিংস সত্যাগ্রহের অন্তরালে স্থিত একমাত্র আত্ম-নিপীড়নকে সম্বল করিয়া লইয়া পারিপার্শ্বিক ঘটনার স্রোতমুখে [illegible] বিরোধী হইয়া চলা মানব-স্বভাবের প্রতিকূল। প্র[illegible] লাভ করিয়া মানসিক আক্রোশবিহীন হইয়া থাকা জীব-স্বভাবের প্রতিকূল ত বটেই। মহাত্মা যীশুখৃষ্টের সকলের সহিত সম আচরণের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, সত্তার ক্রমাভ্যন্তরে গমন করিলে স্থিতিবিন্দু-বিশেষ হইতে সর্ব্বমানবে যে একত্ব অনুভূত হয়, মহাত্মা যীশুখৃষ্টের চরিত্রগত সেই একত্বের অনুভূতি হইতেই তাঁহার সেই আচরণ উদ্ভূত হইয়াছিল।

অহিংস সত্যাগ্রহ সম্পর্কে একান্ত আধুনিক কালের নিখিল ভারতীয় ঘনাবলী এই যে, মহাত্মা গান্ধী আপনারই ভিতরে এবং বাহ্য পারিপার্শ্বিকে

হিংসার বিদ্যমানতা অনুভব করিয়া হায়দরাবাদের আর্য্য সত্যাগ্রহে কোনপ্রকার সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই, বরঞ্চ তাহা বন্ধ করিয়া দিবারই চেষ্টা করিয়াছেন, প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির অনুমতি ব্যতীত প্রদেশের কেহ সত্যাগ্রহ করিতে পারিবে না, এইরূপ বিধি কংগ্রেসের উর্দ্ধতন পরিষদে পাশ করাইয়া লইয়াছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট রচিত 'এসিয়াটিক-বিল'এর বিরুদ্ধে তথাকার ভারতবাসিগণ বিগত ১লা আগষ্ট (১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ) তারিখে যে সত্যাগ্রহ প্রবর্ত্তন করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্থগিত রাখিবার উপদেশ দিয়াছেন অর্থাৎ যে অহিংস সত্যাগ্রহের সক্রিয়তা দ্বারা জগতে অখণ্ড শান্তির রাজ্য স্থাপিত হইবে বলিয়া মহাত্মাজী সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন, সেই সত্যাগ্রহকে তিনি আপন নিয়ন্ত্রণ-আবেষ্টনের ভিতরে একেবারেই নিষ্ক্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা ভাবিতেছি, ইহা কি মহাত্মাজীর ক্রমবৃদ্ধিগত মনীষিজনোচিত আচরণ প্রকাশশীলতার সমান্তরালে সত্যাগ্রহের প্রকৃত অর্থ আবিষ্কারে আমাদের ভিতর চেষ্টাশীলতার জাগরণ আনয়ন করিবারই লক্ষণ ?

সত্যাগ্রহের অন্যতম অস্ত্র উপবাস। ১৯১৪ হইতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মহাত্মাজী প্রকাশ্যভাবে আট বার উপবাস করিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বশেষ পাঁচ দিনের উপবাস রাজকোট দরবার কর্ত্তৃক তাঁহার দাবী গৃহীত না হওয়ার দরুণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উপবাস যে আর্য্যঋষিদের সাধনার একটি অঙ্গ-বিশেষ ছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা অবশ্যই জ্ঞাতব্য যে, অন্তর্জগতে অনু প্রবেশের ক্রমিকতার সহিত দৈহিক স্বাস্থ্যের যোগাযোগ সংরক্ষণ করিয়া চলিবার জন্য যখন প্রয়োজন হইত তখন তাঁহারা উপবাস করিতেন। ইহা ব্যতীত তাঁহাদের নিকট উপবাসের আর কোন প্রকার ব্যবহার ছিল না।

(৪)

পৃথিবীর ঐতিহাসিক যুগের মনুষ্যের ক্রিয়া-কলাপের সারভূত যে অবদান নশ্বরাকারে কালজয়ী হইয়া বলিষ্ঠ হইতে বলিষ্ঠতররূপে অভিব্যক্ত হইতেছে,

মূলতঃ ইউরোপীয় হইলেও তাহা প্রতি দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো। প্রাগৈতিহাসিক আর্য্য-যুগেও ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় কাঠামো বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাহার সহিত বর্ত্তমান যুগের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পার্থক্য এই যে, আর্য্যযুগে প্রকৃত আত্মোৎকর্ষ-লিপ্সু জননায়কগণই তৎযুগের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিচালক ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিচালকগণের সমষ্টি তৎতুল্য জননায়কগণ নহেন। আধুনিক যুগের রাষ্ট্র-পরিচালকগণের কাহারও কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা শুধু ইহাই বলিতে চাই যে, আধুনিক কালের সত্যানুসন্ধিৎসু অর্থাৎ সত্যেরই জন্য সত্য প্রতিষ্ঠায় অভিলাষী জননায়কগণ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিচালনা হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম প্রকটিত হইতেছে, মহাত্মা গান্ধীর মননে ও কার্য্যে। ইটালীর আবিসিনিয়া এবং জার্ম্মানীর চেক ও পোলাণ্ড অধিকার কালে মহাত্মাজী আবিসিনিয়া, চেক ও পোলাণ্ডের অধিবাসিগণকে অহিংস থাকিবার উপদেশ দিয়াছিলেন; ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশকেও শত্রুর আক্রমণ হইতে অহিংসভাবে রক্ষা করিবার কথা বলিতেছেন। গোলাগুলির বিরুদ্ধে মহাত্মাজীর অহিংসার মূল্য কতখানি, তাহা মহাত্মাজী ব্যতীত আর কেহই বুঝিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু রাষ্ট্রবিশেষের সঙ্ঘবদ্ধ হিংসাকেও অহিংসা বলে প্রতিহত করা যায়, এবম্প্রকার মত প্রকাশ করিয়া তিনি এই অভিমতই ব্যক্ত করিতেছেন যে, শুধু সমাজেই নহে, রাষ্ট্রেও সত্য ও অহিংসাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। পৃথিবীর যাবতীয় দেশের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মধারায় প্রকৃত আর্য্যনীতির অন্তর্নিকীর্ষা গ্রথিত করিয়া দেওয়ার এই যে প্রয়াস, তাহা দ্বারা মহাত্মাজী এক বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিগণের কর্ম্ম-প্রতিভা বিনিয়োগের জন্য যে ক্ষেত্র রচনার সূচনা করিতেছেন, তাহা যদি কোন অনাগত দিনে সার্থক হইয়া উঠে তবে বলিতে হইবে, ভারতীয় আর্য্য-যুগের রাষ্ট্রীয় কাঠামোই সময়ানুকূলতায় সুসমৃদ্ধ হইয়া বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

যখন দেখি, মহাত্মাজীর সত্য ও অহিংসা সম্পর্কিত অভিমতের অভিনব

তাঁহার মর্য্যাদা কিছুমাত্র হ্রাস করিতেছে না, অধিকন্তু রাষ্ট্র-বিশেষের কার্য্যানুকূলেও তাঁহার ব্যক্তিত্বের মূল্য বর্ত্তমানে বিশেষভাবেই উপলব্ধ হইতেছে, যখন দেখি, সত্য ও অহিংসার প্রচারে তিনি এমন একটি পৃথিবীব্যাপী আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার ফলে জ্ঞানী-গুণী মনুষ্যমাত্রই অখণ্ড মানবজাতির পক্ষে একটা সন্নিকটবর্ত্তী কল্যাণজনক ভবিষ্যতের কল্পনা করিতেছেন, তখন মহাত্মাজীর অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যসমন্বিত ব্যক্তিত্বের তুলনা খুঁজিয়া পাই না।

সত্য ও অহিংসার ক্রমিক আলোচনায় যে যে বিষয়ে মহাত্মাজীর সহিত আমাদের মতানৈক্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অপেক্ষা যে যে বিষয়ে তাঁহার মহত্ত্ব বিচারে আমরা নূতন আলোক লাভ করিয়াছি, তাহাতেই আমরা গুরুত্ব আরোপ করিতেছি বলিয়া—দৃশ্যতঃ তাঁহাকে যাহারা সর্ব্বাংশে মানিয়া চলিতেছেন, তাঁহার (মহাত্মাজীর) সহিত তাহাদের অপেক্ষা আমাদেরই সূক্ষ্ম সংযোগ দৃঢ়তর বলিয়া আমরা দাবী করি। এই দাবীমূলেই মহাত্মাজী আপন বোধ-রাজ্যে যে অনাগত ভবিষ্যতের ছবি অঙ্কিত রাখিয়াছেন, যদ্দৃষ্টে তিনি কোন কারণেই তাঁহার মনন-নীতি ও কর্ম্ম-নীতি পরিচালনায় নিরুৎসাহ বোধ করেন না, সেই অনাগত ভবিষ্যতের বোধ সম্বন্ধে আমরা মহাত্মাজীর সহিত একাত্মতাই অনুভব করিতেছি ; এবং ঐ অনাগত ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই প্রথম প্রবন্ধে আমরা মহাত্মাজীর সত্য ও অহিংসা সম্পর্কে এইরূপ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলাম — "ইহার ভিত্তি আছে বটে, কিন্তু ইহাকে যত বড় বস্তু বলিয়া প্রচার করা হয়, আসলে উহা তত বড় নহে"—সেই সিদ্ধান্ত এক্ষণেও আমরা সমর্থন করিতেছি।

এক্ষণে সত্য ও অহিংসার মর্ম্মার্থ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।

নামাত্মক বস্তু ও ভাব মাত্রেই রূপাত্মক—এই সত্যমূলে সত্য ও অহিংসাও আসলে রূপাত্মক বটে, ইহা মানিয়া লইলে আমাদের সত্তার কোন্ স্তরে সত্য ও অহিংসার স্থিতি, তাহা সর্ব্বাগ্রে অবধারণ করা প্রয়োজন। তাহা হইলেই আমাদের সকল বক্তব্য অতি সংক্ষেপেই সমাপ্ত হইয়া যায়।

সত্য অর্থ—যাহার অস্তিত্ব এবং বিকাশ আছে; আর অহিংসা বা হিংসাশূন্যতা বলিতে আমাদের সত্তার এরূপ একটা অবস্থা বুঝায়, যে অবস্থায় আমরা অপরকে ক্ষয় করি না, নিজেও ক্ষয়িত হই না। তাহা হইলে দেখা যায়, সত্য এবং অহিংসা বা হিংসাশূন্য-অবস্থা একই অর্থবাচক হইয়া দাঁড়ায়; অর্থাৎ আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের সত্তার যে স্তরে আমরা সর্ব্বকালেই বিরাজমান থাকিয়া বিকশিত আছি, যে স্তরে আমরা সকল প্রকার ক্ষয়মান ও পরিবর্ত্তনশীল পরিস্থিতিকে ডিঙ্গাইয়া অজর ও অমররূপে গ্রথিত আছি, সত্তার সেই স্তরে সত্য ও অহিংসা সমার্থবাচ্যতা লইয়া অবস্থিতি করিতেছে। দ্রষ্টাপুরুষগণ সেই স্তরকে সত্যস্তর (সত্যলোক) নামে অভিহিত করিয়াছেন। নিম্নাঙ্কিত চিত্রে আমাদের সত্তার বিভিন্ন স্তরের অবস্থিতি প্রদর্শিত হইতেছে।
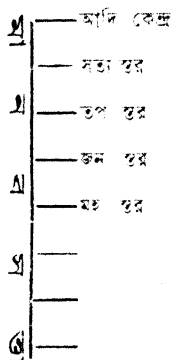
আমাদের বিভিন্ন শারীরিক বিধানকে ক্রম-পর্য্যায়ে ভাগ করিলে হৃদপিণ্ডে প্রাধান্য দেখিতে পাই এবং স্নায়বিক বিধানকে তাহার চালক বলিয়া জানিতে পারি। এই স্নায়বিক বিধানের কেন্দ্র মস্তিষ্কই যে আমাদের সকল শক্তির আধার, তাহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও প্রচার করিয়াছেন। আর্য্যঋষিগণ মস্তিষ্ক সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার, অনুধাবন, পর্য্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া মস্তিষ্ক

শক্তি-সমূহের ক্রমোন্নত অবস্থা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতা পারম্পর্য্যে যথাক্রমে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারকে স্থান দান করিয়াছেন। মানব সত্তার নিম্ন স্তরে এই অহং মানবের জন্মজন্মান্তক্রমিক সংস্কার (চিন্তা ও কর্ম্মের ছাপ) দ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত, সত্য স্তরের নিম্নে এই অহং সংস্কার-বিমুক্ত, বিশুদ্ধ এবং সত্য স্তরে তাহা বিশুদ্ধতম অবস্থার সংস্পর্শপ্রাপ্ত অর্থাৎ এই সত্য স্তরেই আমাদের অহং নিত্য বিকাশশীল এবং সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনশীলতা বা ক্ষয় করা ও ক্ষয়িত হওয়ার অবস্থার উর্দ্ধে থাকিয়া সত্য ও অহিংস-ভাবের প্রকৃত কর্ত্তা।

বিষয়টি প্রকারান্তরেও বলা যাইতে পারে। পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব যে প্রকারেই হইয়া থাকুক না কেন, প্রকৃতির সাহচর্য্যে উহা সর্ব্বপ্রথম এমিবা বা প্রটোপ্লাজম নামক আদিম প্রাণীতে পর্য্যবসিত হইয়া এবং বিবর্ত্তনবাদ দ্বারা চালিত হইয়া ক্রমে উন্নত প্রাণী পরম্পরায় রূপান্তর লাভ করিয়াছে। এই তত্ত্ব দ্বারা প্রাণীর জন্মান্তরবাদ এবং প্রাণের অমরত্ব স্বতঃই বিঘোষিত হয়। ভাব বা বস্তু মাত্রই যখন বিনাশশীল নহে, তখন মানব জন্মজন্মান্তক্রমিকভাবে যে চিন্তা ও কর্ম্মের ছাপ তাহার অমর সত্তায় জমায়েৎ করিতেছে, তাহাকেও বিনাশশীল বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। এই অবস্থায় প্রতিটি মানুষকে তাহার জন্মজন্মান্তক্রমিক চিন্তা ও কর্ম্মফলের একটি জীবন্ত চলচ্চিত্র ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? যে আদি প্রাণ হইতে নিগলিত হইয়া মানবীয় প্রাণ জগৎ-প্রেক্ষাগারে মানব-জীবনের যে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করিতেছে, সেই আদি প্রাণের সন্নিকটবর্ত্তী প্রকাশ—সত্য ও অহিংসা,—সেই চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত হইতে পারে না—যদি তাহার জন্ম-জন্মান্তক্রমিক চিন্তা ও কর্ম্ম এবং তদন্তঃস্থিত শক্তিসমূহের চিত্র প্রদর্শনে নিয়োজিত হইয়া আদি প্রাণের সন্নিকটবর্ত্তী না হয়। বিষয়টি পরিস্ফুট করিবার জন্য নিম্নে তাহার একটি চিত্র অঙ্কিত করা হইল।

এই চিত্রে মানব-সত্তার যে স্থিতিপটে আমরা সত্য ও অহিংসার অবস্থান দেখিতে পাইতেছি, তাহাই পূর্ব্বাঙ্কিত চিত্রের সত্য স্তর বটে।

আমরা সত্য ও অহিংসা সম্পর্কে আমাদের সকল বক্তব্য শেষে ইহাই লিখিতেছি যে, আমাদের সত্তা-নিহিত এই স্থিতিপট বা সত্য স্তরকে অধিগত করিবার কৌশল-জ্ঞান আয়ত্ত না করা পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষে কায়মনোবাক্যে সত্যব্রতী ও অহিংসাব্রতী হওয়া অসম্ভব। মহাত্মাজী যে সত্য ও অহিংসার আন্দোলন পরিচালনা করিতেছেন, সেই আন্দোলনের ক্রম-বিস্তারে আমরা উৎফুল্লচিত্তে সংলিপ্ত থাকিব বটে, কিন্তু তাহার তত্ত্বঘটিত অন্তর্মুখীন বিকাশমানতায় আমরা বিশেষভাবেই লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিব।

আত্ম-সংগঠন

(১)

স্বাস্থ্য ও শক্তি :—১৯১৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের পুনরভিনয়ে বিগত ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯৩৯ খৃঃ) জার্ম্মাণীর সহিত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধ বাঁধিয়া গিয়াছে।

যুদ্ধবিগ্রহ মানব-সমাজ হইতে চিরদিনের তরে তিরোহিত হউক, ইহা আত্মোৎকর্ষলিপ্সু মনুষ্যের কামনার বিষয় হইলেও আমরা দেখিতেছি, যুদ্ধবিগ্রহ ও তাহার অনিবার্য্য ফল নরহত্যার উৎসব মানবীয় যুগের প্রভাত হইতেই চলিয়া আসিতেছে। যুদ্ধের মূলে যদি আত্মরক্ষা বা দেশরক্ষার শুভ ব্রত জড়িত থাকে এবং যদি আক্রমণকারীর জিঘাংসাবৃত্তিকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রবোধিত করিবার উপায় না থাকে, তবে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবীরূপেই দেখা দেয়। ভারত যুগে যুগে ভারতেতর দেশে সভ্যতা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অভিযান প্রেরণ করিয়াছে, অপর দেশের স্বাধীনতা অপহরণের প্রয়াস করে নাই,— প্রাচীন ইতিহাসে আমরা তাহারই পরিচয় পাই বটে, কিন্তু পর-রাজ্যের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বা দেশের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য ভারতের ক্ষত্রিয়-নামক শ্রেণী-বিশেষ রণবিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করিয়া সততই শক্তি প্রয়োগে প্রস্তুত থাকিত, ইতিহাসে আমরা তাহারও পরিচয় পাই। কিন্তু বৃটিশ জাতির অভিভাবকত্ব লাভের পর হইতে পর-রাজ্যের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা ও দেশের শাসন-শৃঙ্খলা-রক্ষার দায়িত্ব হইতে বিমুক্ত হইয়া আমরা যে একটি মন্দ ফল আহরণ করিয়াছি, তাহা এই যে—ভারতের জনসমষ্টিগত স্বাস্থ্যের ক্রমোৎকর্ষতা সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা একেবারে অচেতন হইয়া পড়িয়াছি। স্বদেশ-রক্ষার প্রয়োজন কোন্ সময়ে উপস্থিত হইবে, তাহা পূর্ব্বনির্দ্ধারণযোগ্য নহে বটে, কিন্তু স্বদেশ-রক্ষার দায়িত্ব সর্ব্বকালেই বহন করিবার বিষয় বলিয়া প্রয়োজন কালে যাহাতে সেই দায়িত্ব বীরোচিতভাবে প্রতিপালন করিয়া দেশের সম্মান, মর্য্যাদা ও শক্তির অধিকতর

বিকাশ সাধন করা যায়, তৎপ্রতি যে দেশের অধিবাসিগণ পূর্ণরূপে সচেতন, তাহারা তাহাদের জনসমষ্টিগত স্বাস্থ্যের ক্রমোৎকর্ষতা সাধন কার্য্য হইতে বাধ্যানুবাধকভাবেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে পারেন না। আমাদের ইহা বলিবার উদ্দেশ্য নহে যে, দেশের জনসমষ্টিগত স্বাস্থ্যের উৎকৃষ্টতার মূল্য শুধুমাত্র সঙ্ঘটিত বা সম্ভাবনীয় যুদ্ধে জয়লাভ দ্বারাই নিরূপিত করিতে হইবে। মূলতঃ, আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্যের ক্রমোৎকর্ষতা-সাধন-আকাঙ্ক্ষা যুদ্ধনিরপেক্ষ বা স্বতঃ হওয়াই উচিত বটে।

রোগ-বীজাণুর দ্বারা ব্যাধির সৃষ্টি হয়, না—রোগবীজাণু আক্রমণের সহন-শক্তি হারাইয়া ফেলিলে দেহে ব্যাধির সৃষ্টি হয়, এতৎ সম্পর্কীয় বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন। সূক্ষ্ম-দৃষ্টি-প্রয়োগ-সক্ষমতার যদি যান্ত্রিক দৃষ্টি হার মানে, তবে দৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ের বাহ্য দেশে দুই মতের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী বটে। ব্যাধির উৎপত্তি-মূলে মত যাহাই থাকুক না কেন, ভারতবর্ষ যে নানা জাতীয় ব্যাধির বিলাসভূমিতে পরিণত হইয়া মৃত্যু-অর্দ্ধমৃত্যু-অপমৃত্যু ও অকাল মৃত্যুর পীঠস্থান-বিশেষ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রোগপূর্ণ বা রোগপ্রবণ অথবা প্রফুল্লতা-বর্জ্জিত দেহমনকে বোঝার মত বহন করিতে করিতে যিনি সহসা এক দিন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পরলোকে প্রস্থান করেন, আমরা তাহাকে ভব-বৈতরণী অতিক্রান্ত ভাগ্যবান্ মনুষ্য বলিয়া মনে করিলেও যথার্থতঃ তিনি ভাগ্যবান্ নহেন। মনের জীবন তত্ত্বতঃ পূর্ণ ও আবর্ত্তনশীল একটি ভাবপ্রবাহ। মানসিক ভাবের ক্রমান্বয়তা যদি সত্য হয়, তবে জীবনের ক্রমান্বয়তাও সত্য। সুতরাং দৈহিক জীবনে স্বাস্থ্যের অনাবিলতা জনিত প্রশান্তি উপভোগ করিতে না পারিলে বৈদেহিক জীবনে তাহা কি প্রকারে উপভোগ করা যাইবে? প্রসঙ্গক্রমে লিখিতেছি যে, আত্মার কর্ম্মসংস্কার-ক্ষয়-জনিত উৎকর্ষতা একমাত্র দেহধারণ কালেই সম্ভব হয়। এই জন্যই অকাল মৃত্যুকে ভারতীয় প্রাচীন আর্য্য নরপতিগণ সর্ব্বপ্রকারে প্রতিরোধ করিবার প্রয়াস করিতেন। শ্রীরামচন্দ্রের শাসন-কালে একটি মাত্র শিশুর অকাল মৃত্যুতে অযোধ্যার রাষ্ট্র কি বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল না?

আমরা যাহারা বাঁচিয়া আছি ও চলাফেরা করিতেছি,—গ্রামে সহরে, হলকর্ষণ মাঠে, বিদ্যায়তনে, সচল জনতায়, পণ্যশালায়, পিতামাতার অভিভাবকতায় —সেই আমাদের ভিতর হইতে প্রকৃত সুস্থতাব্যঞ্জক, অঙ্গসৌষ্ঠবজ্ঞাপক, সুমার্জ্জিত পেশীপ্রপেশী ধারক, প্রশস্ত বক্ষ ও সমুচিত দৈর্ঘ্য প্রকাশক একটি মনুষ্য খুঁজিয়া বাহির করা এক কঠিন ব্যাপার বিশেষ। বাস্তবিক পক্ষে আধুনিক জগতের তথাকথিত সভ্য ও অসভ্য কোনও দেশের সহিতই ভারতের জনগণের কলঙ্কসম অস্বাস্থ্যের তুলনা হইতে পারে না। বলা আবশ্যক যে, আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধানের মূলে যে সমস্ত অন্তরায় আছে বলিয়া আমরা নিত্যই শ্রবণ করিতেছি, তদ্বিষয়ে আমরা পূর্ণ সচেতন।

স্বাস্থ্য ও তদ্ভূত শক্তি-লাভ অনেকাংশে বংশানুক্রমের উপর নির্ভরশীল। কোন ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তি যদি জীবন ব্যাপিয়া লুপ্ত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়াস করেন, অথচ বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিতে সক্ষম না হন, তথাপিও তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না; তাহা পরবর্ত্তী কালে তাঁহার বংশে প্রতিমূর্ত্ত হইবেই। প্রফেসার লামার্ক (Lamarc) বলেন, জীব আপনার অবস্থায় পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে যে চেষ্টা ও উদ্যম বিনিয়োগ করে, তাহা বংশানুক্রমে সংক্রামিত হয়। তিনি একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখে এইরূপ বলিয়াছেন যে, কোন আদিম যুগে জিরাফ হয়ত দেখিতে হরিণসদৃশই ছিল, কিন্তু কালক্রমে যখন বনের বৃক্ষগুলি লম্বা হইয়া গেল, তখন উহাদের ঐ সকল লম্বিত বৃক্ষের পত্র খাইবার ক্রমাগত চেষ্টা বংশানুক্রমিকতায় পর্য্যবসিত হইয়া ক্রমে জিরাফ-কুলের গলার দীর্ঘতা সম্পাদন করিয়াছে।

যে ইংরাজ জাতি আমাদের অপেক্ষা স্বাস্থ্য ও শক্তিতে বলিষ্ঠতর, তাহা তাহাদের জাতিগত বংশানুক্রমিক প্রয়াসের ফল; অর্থাৎ তাহাদের পুরুষপরম্পরানুক্রমিক সমষ্টিগত প্রয়াসের ভিতর এমন কোন অবকাশ থাকে না বা কমই থাকে, যাহাতে রোগপ্রবণ, স্বভাবদুর্ব্বল, স্বতঃক্ষীণ সন্তানসন্ততি জন্ম গ্রহণ করতঃ তাহাদের জাতিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতে

পারে। আমরাও যদি একটা পরিকল্পনা লইয়া আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে, রোগ ও অকালমৃত্যু দূরীকরণে সচেষ্ট হই, তবে আমাদের বর্তমান স্বাস্থ্য ও শক্তির কথঞ্চিৎ উন্নয়ন হইবে বটে, কিন্তু যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূলতায় সন্তানসন্ততির জন্ম গ্রহণ করিবার মৌলিক বিধি সংগ্রথিত, আমাদের সেই চেষ্টা দ্বারা সেই অবস্থার উন্নত পরিবর্তন সাধন হইবে বলিয়া এবং সেই চেষ্টা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়গণে সংক্রামিত হইবে বলিয়া আমাদের অপেক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ অধিকতর উত্তম স্বাস্থ্য ও বলিষ্ঠতর শক্তি লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিবে এবং তাহার সংরক্ষণে ও উদ্বর্দ্ধনে আমাদের অপেক্ষা অধিকতর চেষ্টা ও উত্তম বিনিয়োগ করিতে সক্ষম হইবে।

অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে দেশের জিলা-বিশেষ—যেখানে জনসংখ্যা ২৫।৩০ লক্ষ, সেই জিলায় নর্দ্দামা পরিষ্কৃতকরণ, সুপেয় পানীয় বিধান, ম্যালেরিয়া ও সংক্রামক ব্যাধি দূরীকরণ, রোগে ঔষধ ও পথ্যের সুলভতা সাধন, জীবন-যাত্রা-প্রণালীতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিধান, মৌলিক স্বাস্থ্য-নীতির প্রতিপালন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান প্রভৃতি ব্যবস্থামূলে একটি পরিকল্পনা লইয়া অবিলম্বেই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা যাইতে পারে। এই পরিকল্পনার কার্য্যে জিলার প্রত্যেক ব্যক্তির যে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা লাভ রহিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিলে বা বুঝাইতে পারিলে, বৃহৎ আঙ্কিক চেষ্টা ত স্বতঃই উদ্ভূত হওয়ার কথা। নিজের স্বার্থ চায় না—এমন মানুষ দুনিয়াতে কে আছে ?

(২)

বিবাহ ও সমাজ :—নরনারীর মিলন দুর্নিবার প্রাকৃতিক ক্ষুধা। ক্ষুন্নিবারণের অভাবে যেরূপ, ক্ষুন্নিবারণের স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘিত আহার্য্য গ্রহণেও সেইরূপ দেহে পরিপোষণের ব্যাঘাত ঘটে। এই বোধের উন্মেষের পর হইতেই জ্ঞানী মানবগণ সমাজের আদি বিবর্তনে, নরনারী একে-অপরের

দুনিবার মিলনক্ষুধা পরিপূরণে যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল না হয়, তজ্জন্য বিবাহকে ধর্ম্মের একটি অঙ্গ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। মানবের উন্নয়ন যাহা ধরিয়া রাখে, তাহাই যদি ধর্ম্ম হয়, তবে বাস্তবিক পক্ষেও বিবাহ ধর্ম্মের একটি অঙ্গই বটে। তাই, আমরা দেখিতেছি, প্রীষ্ট বা পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে, চার্চ্চে বা মন্দিরে, ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সম্পাদিত যজ্ঞ বা কার্যাস্থলে নরনারীর বিবাহ সভ্যজগতে সাধিত হইয়া আসিতেছে।

ক্ষেত্র ও বীজের সংযোগে বৃক্ষের অঙ্কুর উদ্গম হয়, এই তত্ত্বের সহিত নরনারীর মিলন-জাত সন্তানের আবির্ভাব সর্ব্বতোভাবে তুলনীয়। মানব-সমাজে এই সন্তান-স্রোত কোন্ অতীত কাল হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, তাহা প্রত্নতত্ত্বের বিষয়। কিন্তু এই অপরিসংখ্যেয় নরসন্তানের মধ্যে যাহারা—যে কয় সহস্র বা লক্ষ ক্ষেত্রের সহিত বীজের বিধিমাফিক সম্মিলনের ফলে শরীরীরূপে উদ্গত হইয়া পূর্ণমানবরূপে অভিব্যক্ত হইতে পারিয়াছে, তাহারাই দেশে দেশে সমাজ ও সভ্যতা গঠন করিয়াছে, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বিদ্যা উদ্ভাবিত করিয়াছে, বিজ্ঞানের জন্ম দান করিয়া তাহার জয়ধ্বজা উড়াইয়াছে। এই তত্ত্ব হইতে এই সিদ্ধান্তই গঠিত হয় যে, হস্তে প্রবেশ-নিদর্শন না থাকিলে চিত্র-প্রদর্শনী-গৃহে যেরূপ প্রবেশ-নিষেধ, সেইরূপ উৎকৃষ্ট সংস্কারসম্পন্ন না হইলে পিতামাতার সংযোগের ভিতর দিয়া ভাব-বিশেষের সংসার-মঞ্চে মূর্ত্ত হওয়ার পক্ষেও নিষেধ থাকাই উচিত। এই স্থলে চিত্র-প্রদর্শনী-গৃহের দ্বারীর সহিত সংসারমঞ্চের পিতামাতাকে তুলনা করা যায় এবং চিত্র-প্রদর্শনী-গৃহে অনধিকার প্রবেশকারীদের জন্য যেরূপ দ্বারীকে দায়ী করা যায়, সেইরূপ হীন সন্তানগণের আবির্ভাবের জন্য তাহাদের পিতামাতাকেও দায়ী করা যায়।

পতঞ্জল ঋষি সুক্ষণেই লিখিয়াছিলেন, "ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।" কিন্তু কুক্ষণেই এদেশে তাহার অর্থকে বিকৃত করা হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যের

প্রকৃত অর্থ বৃংহ বা বৃদ্ধিতে চরণ এবং তাহাতেই অভিলব্ধ হয় বীর্য্য বা প্রতিষ্ঠা। শুক্ররোধ করিয়া নীচমনা হইয়া চলিলে ব্রহ্মচারী হওয়া যায় না। নরনারীর মিলনে নর ও নারী যে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, ইহা অধুনা যৌন-বিজ্ঞানেও সত্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। বিবাহকার্য্য হইতে দূরে থাকিয়া শুক্ররোধ করিয়া চলাই যদি ব্রহ্মচর্য্যের মুখ্য অর্থ হয় অর্থাৎ দেশ ও জাতি পরিপুষ্ট হয়, সভ্যতা ও জ্ঞানের ক্রমবিকাশ ঘটে নর নারীর যে মিলন কার্য্যে, তাহাকে প্রতিহত করিয়া রাখাই যদি ব্রহ্মচর্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে পতঞ্জল ঋষিকে একজন বড় রকমের অবৈজ্ঞানিক বলিতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে খ্যাতনামা ঋষিগণও একাধিক নারীকে বিবাহ করিয়াছেন। মহামতি অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ উহাকে এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া এদেশের যে হিত সাধন করিয়াছিলেন, তাহারই অন্তরাল হইতে এই একটি অহিত উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়াছিল যে, দেশের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ ব্যষ্টি-বিশেষের জন্য নির্দ্দেশিত প্রব্রজ্যাকে সমষ্টির আকারে অবলম্বন করতঃ ভারতের জ্ঞান-গরিমার উন্নতি প্লাবনকে অবরুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারই ফলে ভারতে অবনত যুগের ক্রমাবতরণ সম্ভব হইয়াছিল। মানবীয় যোগ্যতায় যাহারা হীনতর, তাহাদের সন্তান-সংখ্যা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিগণের অপেক্ষা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেশী হইয়া থাকে, ইহা লোকতথ্য-গণনায় প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এদেশে ধর্ম্মসেবা ও দেশসেবার নামে দেশের যে কৃতী সন্তানগণ বিবাহযোগ্য বয়সেও অবিবাহিত রহিয়াছেন এবং ধর্ম্মসেবা ও দেশসেবার সহিত অবিবাহিত থাকার সম্বন্ধ সংযোগ করিয়া একটা অস্বাস্থ্যকর দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, তাহাদের কার্য্য আমরা কোনও প্রকারেই সমর্থন করিতে পারি না।

বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর বয়সে দশ হইতে পনর বৎসর পর্য্যন্ত পার্থক্য থাকা উচিত। পার্থক্য তদপেক্ষা কম থাকিলে বা স্বামী-স্ত্রী সমবয়স্ক হইলে উভয়েরই দেহ-মনের পরিপোষণে ব্যাঘাত জন্মে। এইস্থলে স্ত্রীর অকালবৈধব্য কল্পনা

অযৌক্তিক। আন্তর সংযোগের ভিতর দিয়া স্বামীর পরিপোষণ দান করাই যে স্ত্রীর বৈধানিক বৈশিষ্ট্য, স্বামীর সহিত তাহার বয়সের সমুচিত পার্থক্য হইতে স্বামীর দীর্ঘতর জীবন-লাভেরই সম্ভাবনা জন্মে। ক্ষেত্র চাষের অনুপযোগী এবং বীজের অপরিপুষ্ট অবস্থায় সবল বৃক্ষশিশুর উদ্গম যেরূপ সম্ভব হয় না, অনুপযোগী ও অপরিপুষ্ট বয়সে নরনারীর পক্ষেও সেইরূপ উৎকৃষ্ট সন্তানের জন্ম দান করা সম্ভব হয় না। এদেশে বিবাহযোগ্য পুরুষের বয়স পঁচিশ এবং বিবাহ-যোগ্যা নারীর বয়স পনর ইহাই নিম্নতম বয়স বলিয়া নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। বয়স তাহার উর্দ্ধে হইলে লাভ ব্যতীত ক্ষতি হইবে না। ক্ষেত্রের কার্য্য অঙ্কুরকে পরিপোষণ দান করা, আর বীজের কার্য্য তাহার দেহ হইতে অঙ্কুরকে উদ্ভিন্ন করা। বীজের এই প্রাধান্য বশতঃ এই সিদ্ধান্তই গঠিত হইয়াছে যে, পুরুষ উচ্চবংশীয় (higher cultural heredity) হইবে এবং স্ত্রী তাহার অপেক্ষা উচ্চ বংশজাত না হইয়া নিম্ন বংশ বা নিম্ন বর্ণের হইবে। অর্থাৎ বিবাহ কার্য্য অনুলোম অসবর্ণ বিধি অনুসারে সাধিত হইবে। প্রতিলোম কখনও হইবে না। অনুলোম অসবর্ণ বিবাহে সন্তান পিতৃবর্ণই প্রাপ্ত হইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ দ্বারাই নারী সমাজকে সংশোধিত করিয়া দেশকে তমোচ্ছন্ন অবস্থায় উত্তোলন করিতেন। প্রাচীন ভারতের যোগ্য পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিকৃত সংস্কার যেরূপ পরবর্ত্তী কালে কৌলিন্যসূচক বহু বিবাহ প্রথায় দৃষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ পতি অপেক্ষা নিম্নতর যে কোন বংশ বা বর্ণ হইতে স্ত্রী গ্রহণের বিকৃত সংস্কার পরবর্ত্তী কালে 'ভরার মেয়ে' নামধেয় মেয়ে গ্রহণ প্রথায় দৃষ্ট হইয়াছে। প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহ যেরূপ, সগোত্র বিবাহও সেইরূপ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

কন্যার স্বয়ং নির্ব্বাচন বা সম্মতি ব্যতিরেকে তাহার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাতকুলশীল বরে তাহাকে সমর্পিত করার যে পদ্ধতি অধুনা আমাদের সমাজে বদ্ধমূল, জাতির পোষণ-বর্দ্ধনে তাহা অত্যন্ত অহিতকর। অবিবাহিত নরনারীর মধ্যে যে সম্মানযোগ্য ব্যবধান থাকা উচিত, তাহা বজায় রাখিয়াও তাহাদের মধ্যে

পারস্পরিক সঙ্কোচবিহীনতা সৃষ্ট হইতে পারে, এইরূপ আবহাওয়া যদি সমাজে জিয়াইয়া তোলা যায়, আর নারী যদি স্বয়ং পতি নির্ব্বাচনকারিণী হয়, তবে তাহাদের বিবাহিত জীবনের পারস্পরিক ভাবসচ্ছন্দতা এবং ক্রমোদ্বর্দ্ধনমূলক বহন সমর্থতায় তাহাদের চিত্তে যে ভাবসাম্য উৎসৃষ্ট হইবে, তাহা তাহাদের সন্তানসন্ততিগণেও বিসর্পিত হইয়া তাহাদের চরিত্র, সংস্কার, বোধ, কর্ম্ম, চলন অলঙ্কৃত করিবে। আমাদের দেশের বিরাট শিশু-সমাজে, বালক-বালিকা-সমাজে, যুবক-যুবতী-সমাজে বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশে, চিন্তায় ও কর্ম্মে যে বৈচিত্র্যবিহীন নিস্তেজ নিয়মিতভাব পরিলক্ষিত হয়, যাহা প্রগতি-লাভেচ্ছু যে কোন দেশের পক্ষে একটা অভিশাপ বিশেষ, তাহাকেও যদি আমাদের জাতীয় জীবন হইতে অপসারিত করিতে হয়, তবে অবিবাহিত নরনারীর জীবনকে শিক্ষাদীক্ষামূলে বৈচিত্র্যময় করতঃ সমাজ হইতে 'ঘটিদান'রূপ কন্যাদান-প্রথাকে দূর করিতেই হইবে।

ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্বের ভিতর দিয়া মানবের প্রসুপ্ত সহজাত সংস্কারগুলি প্রধান চারিটি ভাগে অভিব্যক্ত হয়। চারিবর্ণ প্রতি দেশেই বিদ্যমান। প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহ ধরিয়া যৌনবিজ্ঞানে কোন প্রকার গবেষণা হইয়াছে কি না, আমরা জানি না। তবে "উচ্চতর প্রাণীদিগের মধ্যে ক্রমাগত নিকট সম্পর্কীয়দের মিলনের ফলে একটা সাধারণ অপকর্ষ ও সন্তানহীনতা ঘটে"—এই জাতীয় বহু তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানি। পাশ্চাত্য মতে ইহাই সমরক্ত মিলন, আমাদের সগোত্র মিলনের অংশ-বিশেষ। আমাদের দেশের ন্যায় কন্যা-সম্প্রদান-পদ্ধতি পাশ্চাত্যে অবিদ্যমান। তাই, তদ্দেশসমূহে তেজীয়ান সন্তান-সন্ততির আবির্ভাব সম্ভব হয়। তথাকার আধুনিক বিবাহ-পদ্ধতিকে যদি অধিকতর উৎকর্ষতা লক্ষ্যে সুনিয়ন্ত্রিত করা হয়, তবে সেই সেই দেশ উল্লম্ফনের তালে অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারিবে। মোটকথা, বিবাহ-ব্যাপারে আমাদের আর্য্যশাস্ত্রে যে সকল নির্দ্দেশ আছে, তাহা উড়াইয়া না দিয়া আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে তাহার বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারি, সম্ভব হইলে তাহার আরও উন্নত পরিপূরণ করাও চলিতে পারে।

সমাজ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আমাদের সমাজ কাঠামোর স্তরে স্তরে যে মালিন্য ও গলদ যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা দূরীভূত করিয়া উহাতে বলিষ্ঠ ও সতেজ ভাব সঞ্চারিত করতঃ জীবনীয় স্পন্দন-বিকাশে উৎকর্ষে উদ্‌গ্রীবপ্রাণ করিয়া তোলা প্রয়োজন। কি কি পন্থায় তাহা সাধন করা যাইতে পারে অর্থাৎ কি কি পন্থায় আমাদের সমাজ শনৈঃ শনৈঃ শুচিতায়, কর্ম্মে ও গুণে শোভান্বিত হইয়া প্রগতির পথে পরিধাবিত হইতে পারে, তাহা শুধু অবধারণ করিলেই চলিবে না, অবধার্য্য বিষয়কে কি প্রকারে সমাজে মূর্ত্ত করিয়া তোলা যাইতে পারে, তৎচিন্তায় মনোনিবেশ করতঃ একটি যান্ত্রিক পরিকল্পনাকে উদ্ভিন্ন করিয়া লওয়াও আমাদের অবিলম্বেই প্রয়োজন।

(৩)

শাসন ও সংরক্ষণ:—মুাস্পিপালিটি-সমূহে আমরা আত্মশাসন ও আত্মসংরক্ষণ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি। এই অধিকার-ভূষিত অঞ্চলে আমরা কতখানি আত্মসংগঠন করিতে পারিয়াছি বা করিতে পারি, আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। আমরা ঢাকা সহরের অধিবাসী। ঢাকা সহরের ম্যুস্পিপালিটিকে কেন্দ্র করিয়াই আমরা তদ্বিষয়ের আলোচনা করিব।

সর্ব্বাগ্রেই বলা আবশ্যক যে, আমাদের অ-দৃষ্ট লোক হইতে ব্যাধি ও দারিদ্র্যের যে অংশ আমাদের ম্যুস্পিপালিটি-সমূহের এলাকায় বর্ষিত হইয়াছে বা হইতেছে, তাহার সহিত আমরা বর্ত্তমান যুদ্ধ-বিগ্রহের দিনে সহরের উপর শত্রুপক্ষীয় এরোপ্লেন হইতে বোমা-বর্ষণের সহিত তুলনা করিতেছি এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে সহরবাসীদের আত্মরক্ষার জন্য যে কঠোর বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে, আমাদের ম্যুস্পিপালিটি-সমূহের জনগণের ব্যাধি ও দারিদ্র্যের কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্যও সেইরূপ কঠোর বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক—এই বোধে চালিত হইয়াই আমরা মুাস্পিপাল শাসনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

শয্যা-গ্রহণ না-করাই উত্তম স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে। আমরা সাধারণতঃ শয্যা-গ্রহণ না করিলে চিকিৎসকের উপদেশ লই না বা হাঁসপাতালের আশ্রয় গ্রহণ করি না। স্বাস্থ্যোন্নতিব্যঞ্জকতা আমাদের দেহমনের আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি ছাপাইয়া প্রবাহিত হইবে, ইহাই যদি হয় আমাদের জীবনধারণের মৌলিক ভিত্তি, তবে কার্য্যতঃ আমাদের যে মনোবৃত্তি তাহার বিপরীতমুখী-গতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে, তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার একটা ব্যবস্থাকে প্রতি মুন্সিপালিটিতেই উদ্ভিন্ন করিয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন। বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির তাণ্ডবতা সুরু হইলেই সহরে ভেক্‌সিনেশন, ইনোকুলেশন, ডিসিনফেক্‌সন, আইসোলেসন প্রভৃতি আড়ম্বর সহকারে আরম্ভ করা হয়। কিন্তু সহরের মলমূত্র-আবর্জ্জনাদি দূর করিবার (Conservancy works) বন্দোবস্ত ব্যতীতও যদি সহরের করদাতাগণকে স্বাস্থ্যোৎকর্ষপরায়ণতায় গ্রথিত করিয়া লওয়ার একটা অনুপ্রেরণা মুন্সিপাল-কর্ত্তৃপক্ষগণ বোধ করেন, তবে সমগ্র সহরখানাকেই একটি স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত করিয়া তুলিতে হয় না কি এবং তৎকল্পে গতানুগতিক চিন্তাধারা বর্জ্জনে আমাদের মস্তিষ্কবৃত্তির অধিকতর অনুশীলনের প্রয়োজন আছে না কি ? প্রতি ওয়ার্ডের করদাতাগণের নাম স্বাস্থ্য-রেজেষ্ট্রীতে ভুক্ত করিয়া তাহাদের স্বাস্থ্যের ক্রমোৎকর্ষতা-বিধান-কল্পে আধুনিক যুগোপযোগী পন্থা গ্রহণ, বিশুদ্ধ খাদ্যখাবার যাহাতে তাহাদের সহজলভ্য হয়—খাদ্যসামগ্রীবিক্রেতাগণের উপর শুধুমাত্র জরিমানা আরোপ না করিয়া তাহার মৌলিক বিধান অবলম্বন প্রভৃতি ব্যবস্থা যদি মুন্সিপ্যালিটি-সমূহে অবলম্বিত হয়, তবেই বলা যাইতে পারে যে, সহরের অস্বাস্থ্য ও ব্যাধিরূপ শত্রুর আক্রমণ হইতে মুন্সিপাল কর্ত্তৃপক্ষগণ সহরবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃত দরদ অনুভব করিতেছেন।

অর্থের প্রশ্নই বড় প্রশ্ন নহে। সেবাই যে অর্থের প্রসূতি, অর্থ আহরণের এই মৌলিক তথ্যকে জানিয়াও আমরা না জানিবার ভাণ করিয়া

চলিবে আর কত কাল? প্রতি দিনের পানীয় জলের সরবরাহ ও ময়লা নিষ্কাষণের প্রয়োজনের তুলনায় সহরবাসিগণের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানের প্রয়োজনও কোনও অংশে কম নহে। সুতরাং সহরবাসীদিগকে স্বাস্থ্যনৈতিক সেবায় মহিমান্বিত করিয়া জল-কর ও পায়খানা-করের ন্যায় তাহাদের মধ্যে স্বাস্থ্য-করের প্রবর্ত্তনা করিবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ১৯৩৬—১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকা ম্যুনিসিপালিটি সহরবাসিগণের নিকট হইতে জল-কর বাবত ১০৭৪৮৭৲ টাকা এবং মল নিষ্কাষণ বাবত (scavanging and latrine works) ১১২৬৪৬৲ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই পরিমাণ বা ততোঽধিক পরিমাণ স্বাস্থ্য-কর দ্বারা ঢাকার সহরবাসিগণের স্বাস্থ্যশক্তি প্রবর্দ্ধনে বিজ্ঞানসম্মত কার্য্যকলাপে আত্মনিয়োগ করা যাইতে পারে না কি?

বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে রক্ষা করিবার জন্য কোন কোনও ক্ষেত্রে সংরক্ষণ শুল্ক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ, অনাবশ্যক প্রতিযোগিতা হইতে দেশের চলমান শিল্প-বাণিজ্যকে রক্ষা করিবার জন্য কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে না কি? এই আলোকে ম্যুনিসিপালিটির এলাকাভুক্ত চলমান শিল্প-বাণিজ্যকে অনাবশ্যক প্রতিযোগিতা হইতে বাঁচাইয়া ক্রমো-দ্বর্দ্ধনশীল করিয়া তুলিবার জন্য কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তাও স্পষ্টই উপলব্ধ হয়। কিন্তু দেখিতেছি, ঢাকাতে বোর্ডিং বা হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট, খাবারের দোকান প্রভৃতি যাহা ম্যুনিসিপালিটির লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, একে অন্যকে বিনষ্ট করিবার প্রবৃত্তি লইয়া যত্রতত্র (খাবারের দোকান—লক্ষ্মীবাজারস্থ ঘোড়ার আস্তাবলের নিকটতম স্থানে) প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং হাটে চাহিদার তুলনায় সরবরাহের আয়োজন অধিক হইলে সরবরাহকারিগণের যে অবস্থা হয়, তাহাদেরও সেই অবস্থা হইয়াছে; অধিকন্তু আহার্য্য পরিবেশনরূপ ব্যবসায়ের যাহা প্রধান বিষয়—অকৃত্রিম আহার্য্য প্রস্তুত, সর্ব্বত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা,

শালীনতাসূচক ব্যবহার, তাহা হইতে স্খলিত হইয়া তাহারা নানা প্রকার অপগুণে ভূষিত হইতেছে। যে সমস্ত ব্যবসায়ী ফার্ম্মের প্রতিষ্ঠায় মুন্সিপালিটির লাইসেন্সের আবশ্যক করে না, তাহাদের মধ্যেও যে অন্যায় প্রতিযোগিতা পরিদৃষ্ট হয়, তাহার প্রতিকারের জন্যও একটা নিয়ন্ত্রন-বিধি গঠন করিয়া লওয়া আবশ্যক। মোটকথা—চাহিদার অনুপাতে সহরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহে যথাসম্ভব সুশৃঙ্খলা বিধান করা এবং সরবরাহকারিগণও যাহাতে অর্থে পুষ্টতর হইয়া আর্থিক সচ্ছলতা হইতে সাধারণতঃ যে সদ্গুণাবলী উৎপত্তি লাভ করে, তাহা আপন আপন চরিত্রে গ্রথিত করতঃ সহরের শ্রীবৃদ্ধিসাধনেও যত্নপর হইতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করার কর্তৃত্বভার মুন্সিপালিটিসমূহ যদি গ্রহণ করিবার পন্থা আবিষ্কার না করিয়া লইতে পারেন, তবে কে পারিবে? নিকট পারিপার্শ্বিকে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার করাই বিশুদ্ধ স্বাদেশিকতা। বিদেশ বা দেশের অপরাপর প্রদেশ বা জিলা হইতে সহরে কি কি দ্রব্যের আমদানী হয়, তাহার হিসাব লইয়া সেই সহর ও তাহার বহির্ব্বর্ত্তী অঞ্চলে যাহাতে সেই সেই দ্রব্য চাষাবাদ, গৃহশিল্প বা মাধ্যমিক শিল্পের মধ্য দিয়া উৎপন্ন হইতে পারে, আবশ্যক হইলে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সহায়তায় মুন্সিপালিটি সমূহকেই তাহারও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। মোটকথা—কাহারও সহিত নির্ব্বিরোধীভাবে এমনি সুকৌশলে নূতন নূতন কর্ম্মপন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে, যাহাতে সহরের শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের পরিপোষণ কার্য্য চলিতে পারে। স্বাস্থ্যের ন্যায় অর্থেও মুন্সিপালিটি-সমূহ যদি সহরখানাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারেন, তবেই স্বায়ত্তশাসনের একটা বাস্তব মূর্ত্তির সহিত আমরা পরিচিত হইতে পারি, তবেই মুন্সিপাল কমিশনারগণ সহরের উন্নতি-উদ্দীপনার কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতে পারেন। ১৯৩৬—১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকা মুন্সিপালিটি ব্যবসায়-বাণিজ্য খাতে (trades and profession) ১৪৭৪৲ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঢাকার মুন্সিপাল কর্ত্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য-বিভাগের ন্যায় মুন্সিপালিটিতে একটি শিল্প বাণিজ্য বিভাগ

খুলিয়া এবং শিল্প-বাণিজ্যজীবীদের স্বার্থবৃদ্ধিসাধনে রত থাকিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য খাতের উক্ত আয়কে ১০০ গুণে বর্দ্ধিত করিতে পারেন। প্রচলিত প্রবচন "পেটে খাইলে পিঠে সয়"—তাহার প্রাঞ্জল অর্থ পুষ্টি দান করিয়া পুষ্টি আহরণ। সহরের শিল্পী-ব্যবসায়িগণের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের সহিত আমাদেরই প্রতিনিধি পরিচালিত মুন্সিপালিটির আয় বৃদ্ধির পন্থা-বিশেষকে সংযোজিত করিয়া লওয়ার চেষ্টায় আমাদের আত্ম-অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের বীজ অবলুক্কায়িত।

নাগরিক কর্ত্তব্য, সুনীতি, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, শিল্পবাণিজ্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সহরবাসীদিগকে শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক। তজ্জন্য প্রতি মুন্সিপালিটিতে একটি প্রচার বিভাগ এবং মুন্সিপালিটির একটি নিজস্ব সভাগৃহ থাকা আবশ্যক। পিচ-ঢালা রাস্তায় আমের আটি, কলার খোসা জাতীয় বস্তু নিক্ষেপ না করা, ডাষ্টবিন ব্যতীত যেখানে সেখানে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ না করা, ড্রেণে বা রাস্তায় ছেলেমেয়েদিগকে বাহ্য-প্রস্রাব ত্যাগ করাইবার অভ্যাস বর্জ্জন করা ইত্যাদি এবং স্বাস্থ্যনৈতিক অপরাপর বিষয়াদি সম্পর্কে প্লাকার্ড, পোষ্টার, পুস্তিকা ও সভাসমিতির সহায়তায় সহরে প্রচার কার্য্য চালান আবশ্যক। ঘোড়ার গাড়ীর মালিকগণ হইতে ঢাকা মুন্সিপালিটি বৎসরে ন্যূনাধিক ৫০০০৲ টাকা আদায় করেন। গাড়ীতে ঘণ্টা না থাকায় গাড়ীর সম্মুখস্থ জনতা সরাইবার জন্য গাড়োয়ান যে ভাষা প্রয়োগ করে, তাহা শ্রবণ-সুখ উৎপাদনকারী নহে। মালিকগণ যে কর প্রদান করে, তাহার বিনিময়ে তাহারা মুন্সিপালিটি হইতে কিঞ্চিৎ শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যবসায়িক সুনির্দ্দেশ প্রাপ্তির আশা করিতে পারে না কি? হোটেল, রেষ্টুরেন্ট প্রভৃতির স্বত্বাধিকারিগণকে একটি সঙ্ঘে অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহাদের ব্যবসায়কে সেবা-ভিত্তির উপর অর্থাৎ অধিকতর অর্থাগম হইতে পারে—এইরূপ ব্যবস্থায় স্থাপিত করিতে উদ্বোধিত করিয়া তাহাদিগকে নানা প্রকার ব্যবসায়িক রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। অন্যান্য শ্রেণীর

ব্যবসায়িগণেরও স্বার্থকেন্দ্র হইয়া ব্যবসায়-বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা তাহাদিগকেও যুগোপযোগী নানা প্রকার শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করা চলিতে পারে। মানুষ মাত্রেরই বিশেষ শিক্ষা বা ট্রেনিংএর আবশ্যকতা আছে। ঢাকার রাস্তার আবর্জ্জনাবাহক বলদের গাড়ীর কতকাংশের পশ্চাৎদিক পরিবেষ্টনী বর্জ্জিত। চলন্ত অবস্থায় ঐ সকল গাড়ীর আবর্জ্জনা পথেই অল্পে অল্পে পড়িতে থাকে। এতৎ-সম্পর্কে মুন্সিপাল কর্ত্তৃপক্ষগণেরই যে ট্রেনিংএর আবশ্যকতা আছে, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

মুন্সিপালিটিসমূহে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক। এই বিষয়ে বাংলা দেশে চট্টগ্রাম মুন্সিপালিটি আদর্শ স্থানীয় বটে, কিন্তু সেই আদর্শের সমান্তরালে তথায় অর্থকরী বিদ্যার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই। কার্সিয়াং মুন্সিপালিটি একটি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। ঐ জাতীয় স্কুলের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু মুন্সিপাল স্কুলে প্রদত্ত তজ্জাতীয় শিক্ষা যাহাতে মুন্সিপালিটির সীমানার ভিতরেই অর্থ উৎপাদনকারী বস্তুতে পরিণত হইতে পারে, তাহারও বিধান অবলম্বন করা প্রয়োজন।

সহরবাসিগণের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান, ব্যাধি বিতাড়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতির মূলে প্রাথমিক কার্য্য আরম্ভ করিবার পক্ষে যে অর্থের প্রয়োজন হইবে, এক্ষণে তদ্বিষয় বিবেচনা করা যাউক। স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রমে দেশে যখন অস্বাভাবিক অবস্থার উদয় হয়, তখন দেশের গভর্ণমেণ্টও প্রচলিত প্রথাকে অতিক্রম করিয়া অর্থ আহরণে প্রবৃত্ত হন। আমরা ঋণগ্রহণের কথা বলিতেছি না। কোয়েটা ও বিহার ভূমিকম্পে ভারত-গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধের উপলক্ষে এক্ষণেও ভারত-গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় রাজন্যবর্গের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতেছেন। বলিতেই হইবে যে, আমাদের মুন্সিপালিটিসমূহের অন্তর্গত জনগণের জীবন যাত্রায় বহুকাল হইতেই অস্বাভাবিক

অবস্থা পরিলক্ষিত হইতেছে। সুতরাং তাহাদের সমষ্টিগত জীবন যাত্রার উন্নয়ন সাধন উপলক্ষে মুাঙ্গিপাল কর্তৃপক্ষগণকে রিলিফ ফাণ্ড খুলিতে হইবে এবং ব্যক্তিত্ব ও সেবাধর্ম্মে অলস্ত অনুরাগের বিকাশ-সাধনে তাহাদিগকে ঐ ফাণ্ডে অর্থ সংগৃহীত করিতে হইবে। ক্রমে আয়ের সহিত মুাঙ্গিপালিটির অতিরিক্ত ব্যয়ের সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। কার্য্য আরম্ভের প্রাথমিক অবস্থায় ম্যুন্সিপাল কর্তৃপক্ষ সহরের সুশিক্ষিত যুবকগণকে যথোচিত ট্রেনিং দিয়া স্বেচ্ছাসেবকরূপে গ্রহণ করিতে পারেন।

সমগ্র ভারতবর্ষে মুান্সিপালিটির সংখ্যা ন্যূনাধিক ৭৫০ এবং উহাদের লোক সংখ্যা ন্যূনাধিক দুই কোটি। সমগ্র ভারতবর্ষের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও ইউনিয়ন কমিটিসমূহের সংখ্যা প্রায় ১৫০০ এবং উহাদের অধিবাসীদের সংখ্যা প্রায় ২১ কোটি ৫০ লক্ষ। ভাবিবার বিষয় বটে!

(৪)

পরিবার ও পরিজন :—ভারতবর্ষে ৪০ লক্ষের উর্দ্ধে গ্রাম আছে। প্রতি গ্রামই অল্পাধিক পরিমাণে পরিবার ও পরিজন দ্বারা সমৃদ্ধ, অর্থাৎ অল্পাধিক কতকগুলি পরিবার এবং ঐ পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের সমষ্টিই এক একটি গ্রাম। আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টা যদি গ্রামেই আরম্ভ করা যায়, তবেই আমাদের জাতীয় আত্ম-সংগঠনের বনিয়াদ দৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে। আমাদের রাষ্ট্রশক্তি যে রসধারা পান করিতেছে, তাহার অধিকাংশ গ্রাম হইতেই সরবরাহ করা হয়। কতকগুলি গ্রামে এক বৎসর গ্রাম্য-সমৃদ্ধি উৎপন্ন না হইলেই তাহার প্রতিক্রিয়া বহু দূর বিসর্পিত হইয়া গ্রামসম্বন্ধে যে আমাদের অধিকতর সচেতন হওয়া প্রয়োজন, তাহাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

ধরিয়া লওয়া যাউক, আমাদের একটি জিলাকে যাহার আয়তন ও লোকসংখ্যা ইউরোপের কোন কোনও স্বাধীন দেশের আয়তন ও লোকসংখ্যার

প্রায় সমান,—স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে,—দেওয়া হইয়াছে এই সর্ত্তে যে, ২৫ বৎসরের জন্ত সেই জিলার শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর উপর সেই জিলার অধিবাসীদের কোন অধিকার থাকিবে না, সেই জিলার শাসনতন্ত্র ২৫ বৎসর ব্যাপিয়া জিলা হইতে যে খাদ্য গ্রহণ করিবে, তাহা জিলাবাসীদের পূর্ব্বকৃত-ঋণ পরিশোধের সামিল বলিয়া গণনা করিতে হইবে,—আরও এই সর্ত্তে যে, জিলাবাসিগণ নিজেরাই এক জন উপযুক্ত নেতার নেতৃত্বে এবং শাসনকর্ত্তৃপক্ষের সহযোগিতায় তাহাদের আত্মসংগঠনের জন্য একটি যান্ত্রিক কাঠামো গঠন করিয়া লইতে পারিবেন,—এইরূপ সর্ত্তাধীন স্বাধীনতা মন্দের ভাল বলিয়া যদি সেই জিলার লোক সমুদয় গ্রহণ করেন, তবে তাহাদের অবলুপ্ত-প্রায় শক্তি-সামর্থ্যকেই বাহিরের পরিপোষণে তাজা করিয়া তাহাদেরই দ্বারা তাহাদের জিলার গঠন-মূলক কার্য্য করাইয়া লইবার প্রচেষ্টায় আমরা আত্মনিয়োগ করিব না কি ?

সমষ্টিগত জনসঙ্ঘের বিচারে আমাদের প্রতি পরিবার ও পরিবারভুক্ত-ব্যক্তিগণের উন্নয়নশীলতা জিলা বা তাহার খণ্ড অংশ গ্রামের উন্নয়নের ভিতরেই সংগ্রথিত বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিলাম। এক্ষণে ব্যষ্টি পরিবার ও ব্যষ্টি পরিজন সম্পর্কে আলোচনা করা যাউক।

পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায় বা খুড়াজেঠা-ভাইপোতে একান্নবর্ত্তীরূপে অবস্থান করার যে প্রথা পূর্ব্বে আমাদের দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, অধুনা তাহা অনেকাংশে অবলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্য দেশের সমাজে এই প্রথা পূর্ণাংশে প্রচলিত না থাকিলেও সেই প্রথার অনুপূরক হিসাবে অপরাপর প্রথা তাহাদের সমাজে ও রাষ্ট্রে বিদ্যমান আছে। কিন্তু আমরা পারিবারিক যৌথ-প্রথাকে বিসর্জ্জন দিয়া পারিবারিক মাধুর্য্যের এক বৃহৎ অংশ হইতে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছি। আমাদের এই পারিবারিক ভেদ-বিচ্ছিন্নতার মূলে আছে, অর্থোপার্জ্জনের অপ্রচুরতা। একের উপার্জ্জনে পরিবারের সকলে নির্ভরশীল থাকিলে পরিবারে কলহ-বিবাদের উৎপত্তি হয়। উপার্জ্জন যদি সুপ্রচুর হয়, তবে তাহার বিতরণে যে

সুখ, তাহার বঞ্চনার আশঙ্কায় পীড়া বোধ করাও উচিত নহে, যদিও পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিকে কখনও অলস থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। যে পরিবারে প্রাচুর্য্য বিদ্যমান, সেই পরিবারের লোকদেরও অর্থ অর্জ্জনের নব নব কৌশল আবিষ্কারে অবহেলা করা উচিত নহে। সাধারণ পরিবারের ত বটেই, সচ্ছল পরিবারের নারিগণও যদি আধুনিক বিজ্ঞান-নিয়ন্ত্রিত গৃহ-শিল্পের মধ্য দিয়া কিছু-না-কিছু অর্থ অর্জ্জন করিয়া উপঢৌকনস্বরূপ সংসারকে দান করিবার বোধে অনুবিদ্ধ থাকেন, তবে সকল পরিবারেই অচলা লক্ষ্মীর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

স্বতঃ উৎসাহ ও উদ্যম যে বয়সে দেখা দেয়, যুবকগণের সেই বয়সে অনেক সময়েই কদাচার প্রকাশ পায়। এই বিষয়ে নারী অপেক্ষা পুরুষেরাই অধিকতর চঞ্চলচিত্ততা প্রদর্শন করেন। পুরুষজাতি ও নারীজাতির পক্ষে যাহা জাতিবাঞ্জকতা, তাহার বৈপরীত্য সাধনকে 'জাতিভ্রংশ' দোষ বলা হয়। এই 'জাতিভ্রংশ' দোষ সুরত, চৈতন্য বা libidoকে আক্রমণ করিয়া তাহার সজীবতাকে সাংঘাতিকরূপে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে, অধিকন্তু তাহা তাহার সন্তানসন্ততিতেও সংক্রামিত হয়। গৃহে, সমাজে, রাষ্ট্রে আমরা যে যথার্থ কর্ম্মীপুরুষের অভাব বোধ করিতেছি, তাহার মূলে আমাদের 'জাতিভ্রংশ' দোষ কিঞ্চিন্মাত্রও বিদ্যমান আছে কি না, তাহা প্রতি পরিবারের পরিচালকগণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন।

স্বাস্থ্যনৈতিক ও আত্মনৈতিক উন্নয়ন সাধন করিবার আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া তদনুকূলে যাহা যাহা নিত্য অনুষ্ঠেয়, তাহা তাহা পিতাপুত্রে, মাতাকন্যায় একযোগে ও একপ্রাণে অনুষ্ঠান করিলে প্রতি পরিবারে শান্তি ও পবিত্রতা দেখা দিবে।

(৫)

ধর্ম্ম ও নীতি :—ধর্ম্ম ও নীতি সম্পর্কে আমরা আর্য্যশাস্ত্র অবলম্বনে প্রথমে ধর্ম্মের মৌলিক তত্ত্বে গমন করিয়া তৎপর তাহার উপরিস্থ স্তরে আলোক সম্পাত

করিব। এতদর্থে সর্ব্বাগ্রে যে ষট্‌চক্রের নাম উল্লেখ করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি, তাহা অধুনা ভদ্র সমাজের অপাঙ্‌ক্তেয় বলিয়া জানি। কিন্তু ধর্ম্মের মৌলিক তত্ত্বের আলোচনায় ষট্‌চক্রকে পরিহার করিয়া চলিবার উপায় নাই। ধর্ম্মেই মানব-সত্তা ওতোপ্রোতভাবে বিজড়িত ; আর ধর্ম্ম অর্থ—যাহা আমাদের অস্তিত্ব ও সংবৃদ্ধি ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। তৎপক্ষে ষট্‌চক্রের গুরুত্ব কতখানি, তাহা নিম্নাঙ্কিত চিত্রে দ্রষ্টব্য।
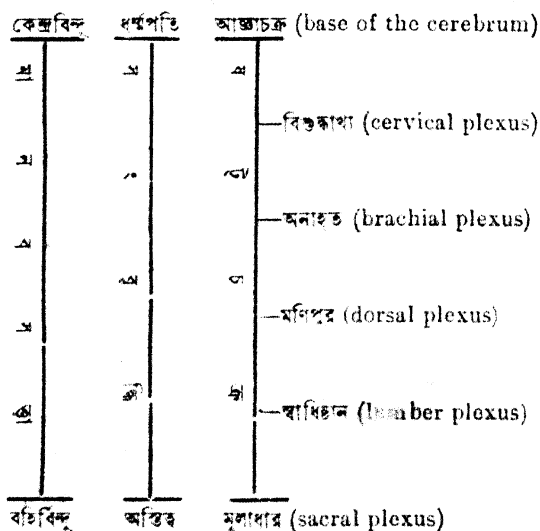
মানব-সত্তার বহির্বিন্দু হইতে কেন্দ্রবিন্দু পর্য্যন্ত প্রলম্বিত স্থিতিতে মানবের যে অস্তিত্ব ও সংবৃদ্ধি সংগ্রথিত, তাহার সূক্ষ্ম বোধের (finer perception) এক একটি সোপান এক একটি চক্র বা স্নায়ুকেন্দ্র। এই স্নায়ুকেন্দ্রমালা-বিদ্ধ ইড়াপিঙ্গলা (cerebro-spinal nervous system) প্রবাহিয়া সুষুম্নার (spinal

olumn) অভ্যন্তরে স্থিত তরল পদার্থে (spinal fluid) রতিসুখ আন্দোলনের অধিক যে সূক্ষ্ম আন্দোলনের উৎপত্তি হয়, তাহাই ব্রহ্মানুভূতি। ছয়টি চক্র বা স্নায়ুকেন্দ্রের নাম চিত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের ক্রম সূক্ষ্ম সমান্তরালে দুই ভাগে আরও দ্বাদশটি চক্র বিদ্যমান। তাহার কয়েকটি চক্রের নাম আর্যশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে; যথা—সহস্রদলকমল, ত্রিকুটি, দশমদ্বার, ভ্রমরগুঁফা, সত্যালোক প্রভৃতি। অতএব বলিতে হইবে যে, মোট অষ্টাদশটি চক্র বিভেদে মানব-সত্তার কেন্দ্রবিন্দু বা সংবৃদ্ধির আন্তিক বিন্দু অভিলভ্য হয় এবং তদবস্থাতেই মানবের বৃদ্ধিস্বারূপ্য লাভ ঘটে। ইহাই ধর্মের মৌলিকতত্ত্ব। বলা আবশ্যক যে, ধর্মের উপলব্ধির ক্ষেত্রে ভারতীয় আর্যগণ যে যে স্থানের যে যে নামাকরণ করিয়া গিয়াছেন, অপরাপর দেশে বা অপরাপর মতে সেই সেই নামাকরণ প্রচলিত থাকিবার কথা নহে। কিন্তু পৃথিবীর অখণ্ড মানব জাতির রক্ত-মাংসের মৌলিক রাসায়নিক উপাদানে যেরূপ গড়মিল নাই, সেইরূপ সকল দেশের সকল মতের ধর্মের এই মৌলিক তত্ত্বেও কোন গড়মিল থাকিতে পারে না।

এক্ষণে আমরা ধর্মের মৌলিক তত্ত্বের উপরিস্থ অংশ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। মানব-সমাজের সংস্থিতি ও ক্রমোৎকর্ষতার জন্য তাহার জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির চর্চার একান্ত প্রয়োজন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণের অভিমত এই যে, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ দ্বারা ভগবান প্রাপ্তি হয়। তাহার অর্থ আমরা এইরূপই বুঝি যে, জগতের আদিম সত্তা জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—এই ত্রিধায় মানবীয় বোধে অভিব্যক্ত; অর্থাৎ যাহা আমাদিগকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সেই ধর্মকে যথার্থতঃ লাভ করিতে পারিলে আমাদের জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি অভিলব্ধ হয়। জ্ঞান বলিতে আমরা বুঝি জানা, কর্ম বলিতে বুঝি করা এবং ভক্তি বলিতে বুঝি সৎএ অনুরক্তি। এই জানা, করা ও অনুরক্তির বিশ্লেষণ করিলে ধর্মের সহিত তাহাদের যোগাযোগের যে চিত্র আমাদের মানস নয়নে পরিস্ফুট হয়, তাহা চিত্রে এইভাবে অঙ্কিত করা যাইতে পারে।
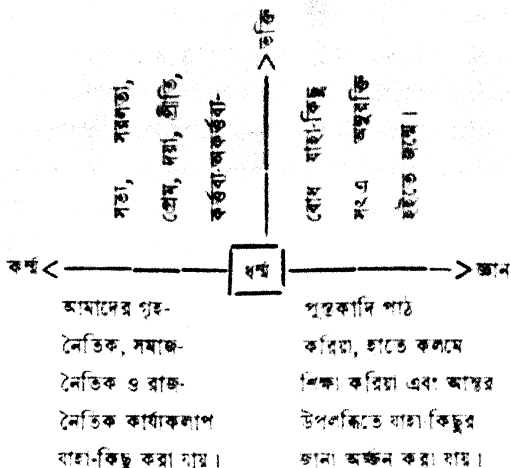
সুতরাং দেখা যায়, আমাদের অস্তিত্ব ও সংবৃদ্ধি যাহা ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সেই ধর্ম্মকে লাভ করিবার কৌশল-জ্ঞান যদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে আমাদের সর্ব্বনৈতিক উৎকর্ষতার জন্য যে যে জানা, যে যে করার আমাদের আবশ্যক, তাহা স্বতঃই আমন্ত্রিত হইবে, আমাদের যে অনুরক্তির বিকাশ সাধন আবশ্যক, তাহা স্বতঃই বিকশিত হইবে। ধর্ম্মকে আমরা প্রকৃতভাবে লাভ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই গৃহে, সমাজে ও রাষ্ট্রে আমাদের দুর্দ্দশা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

ধর্ম্ম বোধ হইতেই নীতির উদ্ভব। যে যে নিয়মের প্রতিপালন আমাদের সংবৃদ্ধি সাধনের অনুকূলে কার্য্যকরী হয়, তাহাই নীতি।

এই ধর্ম্ম ও নীতি শুধু ভারতবর্ষে নহে, নিখিল মানব-কুলে সক্রিয়তায় প্রকটিত হউক, ইহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেছি।

বৃটিশ সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষ

(১)

পৃথিবীর মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহার রক্তরাগ-রঞ্জিত ংশের যে বৃহত্তম খণ্ডে নয়ন নিপতিত হয়, অভ্রংলিহ হিমগিরির পাদচুম্বন রিয়া যাহা পূর্ব্বে, পশ্চিমে, দক্ষিণে—চীন-শ্যাম, গান্ধার ও উত্তাল তরঙ্গ খলাম্বিত ভারত মহাসাগরের প্রান্তরেখা পর্য্যন্ত সুবিস্তারিত, সমগ্র জগতের ংক্ষিপ্তসার, মানবীয় লীলাবিলাসের চরম ঐশ্বর্য্য পূত, সাইত্রিশ কোটী রনারী অধ্যুষিত সেই বিরাট ভূভাগই বৃটিশ সাম্রাজ্যর ভারতবর্ষ, আমাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী মাতৃভূমি।

১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ ক্রয়, ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে যৌতুক-স্বরূপ বোম্বাই নগরী প্রাপ্তি, ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার জমিদারী স্বত্বক্রয়, পলাশীর যুদ্ধ বিজয়ের পুরস্কার-স্বরূপ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ-পরগণার জমিদারী প্রাপ্তি, ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী প্রাপ্তি, ইংলণ্ডের প্রধান ন্ত্রী লর্ড নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্ট বলে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার াসন-কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্তি ইত্যাদির সুসমাবেশ মূলে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের হ গোড়াপত্তন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি এইরূপ সিদ্ধান্ত গঠন করিয়াছিলেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ভারতবর্ষের জনসাধারণের স্বার্থের তরে ভারতভূমিতে বৃটিশ শাসন-শক্তি চিরস্থায়ীরূপে প্রোথিত হওয়া প্রয়োজন। এই সিদ্ধান্ত অনুপাতিক কার্য্য ক্রমে সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে মার্কুইস্ অব হেষ্টিংসের শাসন-সময়ে (১৮১৩—১৮২৩ খৃঃ) বৃটিশ শক্তি ভারতবর্ষে অপ্রতি-রোধী বলিয়া পরিগণিত। ভরতপুর, আসাম, আরাকান প্রদেশ ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে, ণীপুর, কাছাড় ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে, মিয়ানী ও হায়দরাবাদের যুদ্ধে চার্লস নেপিয়ারের বীরত্ব-কৌশল-প্রদর্শনের পর সিন্ধু ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে, পাঞ্জাব ১৮৪৯

খৃষ্টাব্দে, বর্মা ও ঝান্সি, নাগপুর, অযোধ্যা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ শাসনের অঙ্গীভূত হইয়া ভারতবর্ষে শাসননৈতিক অখণ্ড একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারতীয়গণের ললাটে এই যে তথাকথিত রাজনৈতিক পরাধীনতার ছাপ, যাহার অন্তরালে তাহাদের অর্থনৈতিক জীবন পরবর্তীকালে ক্রমে ক্রমে শিথিলীকৃত হইয়াছে—অর্থাৎ ভারতবর্ষ ক্রয় বাবত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ভারতবর্ষের সরকারী তহবিল হইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত যে অর্থ (৬ লক্ষ ৩০ হাজার পাউণ্ড) প্রদান করা হইয়াছে, তাহারই ক্রমাগতিতে প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে সেক্রেটারী অব ষ্টেটের আফিসের ব্যয় (অধুনা হাইকমিশনারের আফিসের ব্যয়ও বটে), মিলিটারী ও সিভিল বিভাগের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়, রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য কার্য্য বাবত ধারের সুদ, ফার্লো, পেনশন সার্ভিস-ফাণ্ড বাবত যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ইংলণ্ডে প্রেরিত হইতেছে, যাহা 'হোমচার্জ্জ' নামে খ্যাত, যাহাকে নৌরজী, রমেশচন্দ্র, গোখেল 'অর্থ-নৈতিক শোষণ' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে আমাদের দেশে প্রচুর সমালোচনা হইয়াছে, এক্ষণেও হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনশক্তির প্রতিষ্ঠার গোড়ায় যদি আমরা কারণ-জ্ঞানানুবিদ্ধ হৃদয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, তবে তাহার প্রতিষ্ঠার মূলীভূত হেতুকে প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করতঃ অচঞ্চল ধৈর্য্য সহকারে ও মানসিক ভাবসাম্যে আমাদের জাতীয় উদ্বোধনাকে আমন্ত্রণ করিতে পারি নাকি ?

মীরজাফর, উমিচাঁদের কলঙ্ককাহিনী অধুনা রেডিও যন্ত্রেও বিসর্পিত করতঃ জনশ্রুতিবিবরে বিষ ঢালিয়া তাহাদের আত্মশক্তিকে নিষ্ক্রিয় করিয়া তোলা হইতেছে, হায়দরাবাদের নিজামের দেওয়ান চণ্ডুলালের প্রজাপীড়ন কাহিনী এবং ভারতবর্ষের অংশে-প্রত্যংশে তাহারই সমপদস্থ রাজনৈতিক ও সামাজিক শ্রেষ্ঠীদের আত্মবিলোপের বর্ণনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেদীপ্যমান থাকিয়া আমাদিগকে অন্ধকারের সহিতই অধিকতররূপে পরিচিত করিয়া দিতেছে ; কিন্তু আত্মবোধবাহিত সুপ্ত চেতনায় গণস্বার্থকেন্দ্ররূপে প্রকটিত হইয়া

যুগোস্তালীয় জ্ঞান-ঐশ্বর্য্যের শোভমানতায় খণ্ডীকৃত ভারতবর্ষকে সম্মিলিত করতঃ কেহ যে ভারতীয় জনগণে সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি বিতরণে তখন সকলকাম হইয়া উঠিতে পারেন নাই, না-পারার অন্তরালে স্থিত, পারার যে আলোক বিদ্যমান ছিল, তাহার স্বরূপ এক্ষণেও আমরা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিতেছি কি? পিতাপুত্রে ও ভ্রাতাভগ্নির মধ্যে যে সেবা-সেবকের সম্বন্ধ স্বতঃ উৎসারিত হয়, তাহারই ফলে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়াও সূত্র-গ্রথিত মণিমালার ন্যায় একত্রে সম্মিলিত, তদনুযায়ী সেবা-সেবকের সম্বন্ধ জনগণে ও সমাজপতি-রাষ্ট্রপতিকুলে অন্ততঃ নিকৃষ্টতম প্রয়োজনের সমান্তরালেও যে তখন প্রকটিত হয় নাই, যদি হইত, তবে তাহারই মঙ্গল উৎসারণে ভারতাগত বৃটনগণ যে ভারতবর্ষের চিরন্তন মঙ্গলদীপ্তিকেই অবলোকন করিতে পারিতেন, এই তত্ত্ব হইতে একটা ক্রিয়াপ্রবণ বোধে এক্ষণেও আমরা ঐশ্বর্য্যবান্ হইতে পারিতেছি কি?

১৮৩৫—১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের 'প্রভিসনেল' বা প্রতিনিধি গভর্ণর জেনারেল ছিলেন, স্যার চার্লস মেট্‌কাফ। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মেট্‌কাফ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যে সর্ব্বপ্রথম দৌলতরাও সিন্ধিয়ার দরবারের রেসিডেণ্ট জ্যাক্‌কলিন্স সাহেবের সহকারীপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং একাদিক্রমে ৩৭ বৎসর কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। দিল্লীর রেসিডেণ্টের পদে অবস্থিতিকালে (১৮১১—১৮১৮ খৃঃ) চার্লস মেট্‌কাফ তথাকার ভূমির রাজস্ব বন্দোবস্তের যে রিপোর্ট রচনা করেন, তাহাতে কোম্পানীর ভারত-শাসন-সম্পর্কিত বিষয়ে তিনি যে মনোভাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন,—ভারতবর্ষীয় লোকের মননে ও চলনায় স্বাধীনতার ভাব উজ্জীবিত করিবে, এইরূপ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার ফলে বৃটনগণের শক্তি ও মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে, এরূপ মনে করা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। ভারতীয়গণকে কোন প্রকারেই তৎভাবের আয়ত্তীকরণ হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে। ভারতীয় জনগণের শিক্ষাপ্রদান-মূলে আমাদের ভবিষ্যৎ সংস্থিতি সম্পর্কে যে অকারণ আশঙ্কা পোষণ করা হইতেছে, তাহাকে যদি আমরা

পরিপুষ্ট করিয়া তুলি, তবে শাসনকর্তৃপক্ষ হিসাবে আমাদের একান্ত নীচবোধপরায়ণতা প্রকাশ পাইবে। এই বিশ্ব সংসার একটি অখণ্ড শক্তি দ্বারা পরিশাসিত। সেই মহাশক্তিই মানুষকে রাজপদে অভিষিক্ত করে, আবার রাজপদ হইতে প্রবঞ্চিত করে। শাসনকর্ত্তার বিবেকানুশাসিত কর্ত্তব্য এই যে, তিনি অনুক্ষণ প্রজাদিগের সুখ ও শান্তি বিধানে যত্নপর থাকিবেন। এইরূপ কর্ত্তব্য প্রতিপালনে যদি আমরা ভারতবাসিগণকে সমুন্নত করিয়া তুলি, তবে আমরা ভারতের চির কৃতজ্ঞতা ও পৃথিবীর প্রশংসা লাভ করিতে সমর্থ হইব। পক্ষান্তরে স্বার্থপরতায় নিমজ্জিত হইয়া রাজ্য-বিনষ্টির আশঙ্কায় যদি আমরা ভারতীয়গণকে উন্নয়ন হইতে বঞ্চিত রাখি, তবে তাহাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ এবং সমগ্র জগতের উপহাস ও অভিসম্পাতই আমাদের একমাত্র পুরস্কার হইবে। *

ভারতীয়গণের মধ্যে শান্তিসমৃদ্ধিপূর্ণ অখণ্ড ভারতের যে কল্পনাও তখন স্থান পায় নাই, সেই সময়ে বৃটন সন্তান চার্লস মেট্‌কাফ অখণ্ড ভারতে ভারতীয় বোধমূলে নব চেতনার উৎসৃজন ও পরিরক্ষণের পরিকল্পনা করিতেছিলেন। পরিকল্পনাতেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, উহাকে বাস্তবীকৃত করিতে ৩৭ বৎসর ব্যাপিয়া তিনি প্রাণপণে প্রয়াস করিয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে অসদভিপ্রায়গ্রস্ত শাসক ছিলেন না, তাহা বলিবার আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা বলিতে চাই ইহাই যে, সরকারী অবস্থিত হইতে যে সকল বৃটনবাসী ভারতীয় জনসাধারণের মনের দুয়ারে কোম্পানীর মারফতে ইংলণ্ডীয় শাসনপ্রথাকে গরীয়ান্ করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাদের সংখ্যা অল্প হইলেও তাহাদের চিন্তাধারা ও কার্য্যধারা এতখানি গভীরতর ও বিস্তৃততর ছিল যে, কোম্পানীর মন্দলোক তাহা অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহারই ফলে ভারতে বৃটিশ শাসন দৃঢ়মূলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

---

* Metcalfe's settlement report of the Delhi territories.

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা টাউন-হলের এক সভায় রাজা রামমোহন রায় ঘোষণা করিয়াছিলেন, "From personal experience I am impressed with the conviction, that the greater our intercourse with European gentlemen, the greater will be our improvement in literary, social and political affairs ; a fact which can be easily proved by comparing the condition of those of my countrymen who have enjoyed this advantage with that of those who unfortunately have not had that opportunity."

তাৎপর্য্য—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই দৃঢ়বোধে আবদ্ধ যে, ইউরোপীয়গণের সহিত আমাদের ব্যবহারিক সংযোগ যত অধিক সাধিত হইবে, আমাদের সাহিত্যিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা তত অধিক উন্নতি প্রাপ্ত হইবে ; আমার স্বদেশবাসিগণের মধ্যে যাহারা এই সংযোগ লাভ করিয়াছেন, তাহাদের সহিত—যাহারা ঐ সংযোগ লাভ করিতে পারেন নাই—তাহাদের অবস্থার তুলনা করিলে ঐ সত্য সহজেই প্রমাণীকৃত হইবে।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে লণ্ডনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজা রামমোহন রায়কে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য যে প্রকাশ্য ভোজ সভার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই সভায় রাজা রামমোহন ভারতবর্ষে বৃটনগণের কার্য্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

অতএব ইহাই কি সত্য নহে যে, ভারতীয় নৃপতিবর্গের ও সমাজ-পতিবর্গের জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধিসাধনরূপ সেবা-ধর্ম্ম হইতে যে সকরুণ পাতিত্য ঘটে, তাহারই অবকাশে ইংরেজগণ ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের হৃদয়মন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়া আসমুদ্র-হিমাচল-ভারতকে বৃটিশ গৌরবের রক্ত-রাগে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে ?

(২)

উদয়াস্ত-বিরহিত সুবিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল, সাগর-প্রহরায় পরিবেষ্টিত ইংলণ্ড দেশ—আধুনিক যুগের কর্ম্মমুখরতায় সন্দীপ্ত দেশসমূহের মধ্যে আত্মব্যঞ্জনার এক অপরূপ বৈশিষ্ট্যের মণ্ডনে আপন অঙ্গে সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বিরাজমান। ইংলণ্ডের কমন্স, লর্ডস্ ও ক্রাউন—এই ত্রয়ের পারস্পরিক যোগাযোগ ধারণ করিয়া তথাকার রাজনৈতিক কর্ম্মধারা ঘাতপ্রতিঘাতপরিপূর্ণ কাল-প্রবহমানতার ভিতর দিয়া যে শাসনতান্ত্রিক পার্লামেণ্টীয় প্রথাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে, তৎগর্ভ-নিহিত ওয়েষ্টমিনষ্টার ষ্ট্যাটুটের বিধানানুযায়ী শাসন-প্রথাকে—ভারতীয় রাজনীতিবিদ্‌গণের এক শ্রেণী-বিশেষ, ভারতবর্ষের শাসন-পরিরক্ষণের স্থিতিপটে অবিলম্বে প্রস্ফুটিত করিবার অভিলাষী, ইহা বলা যাইতে পারে বটে।

ইংলণ্ডীয় পার্লামেণ্টের গঠনসূত্র ধরিয়া পশ্চাৎ অভিমুখে চলিলে ইংলণ্ডে এঙ্গলো-সেক্সনগণের অধিবাস-কালে যাইয়া উপনীত হইতে হয়। এঙ্গেল, সেক্সন এবং অপরাপর টিউটনীয় জাতি পূর্ব্ব ইউরোপ হইতে সাগর অতিক্রমণে ইংলণ্ড অধিকার করিয়া তথায় যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর অঙ্কুর উদ্ভিন্ন করিয়া তোলেন, তাহাই আধুনিক ইংলণ্ডীয় শাসন-যন্ত্রের আদি জন্মদাতা বলিয়া ঐতিহাসিকগণের অভিমত। কিন্তু ঐ আদি জন্মদাতা আপন বহিরঙ্গের ঔজ্জ্বল্য-বিকাশে ঐতিহাসিক গবেষণার বাস্তব উপাদান সরবরাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে প্রথম হেন্‌রীর (১১০০—৩৫ খৃঃ) সময় হইতে। প্রথম হেন্‌রী প্রজাপুঞ্জকে স্বাধীনতার সনদ বা চার্টার অব লিবার্টিজ প্রদান করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, সেক্সন রাজগণের সুশাসন তিনি দেশে প্রত্যানয়ন করিবেন এবং প্রজাপুঞ্জের প্রতি রাজসরকারের সকল প্রকার বিধি-বিগর্হিত আচরণ দমন করিবেন। দ্বিতীয় হেন্‌রী ও প্রথম রিচার্ডের পর তৃতীয় জনের শাসনকালে দেশের শাসন-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইলে আর্ক-বিশপ লেংটন ব্যারণ ও ক্লার্জ্জিদের নেতৃত্ব গ্রহণ

করিয়া রাজা জন্‌কে নূতন করিয়া প্রজাপুঞ্জকে স্বাধীনতার সনদ প্রদান করিতে বাধ্য করেন (১২১৫ খৃঃ)। যে বৃটিশ পার্লামেণ্ট সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে কৃতিকর্ম্মের মর্য্যাদাখচিত গৌরব-কিরীট বহন করিয়া দণ্ডায়মান, সেই পার্লামেণ্ট তদভিধায়ে নামাকরণ-প্রাপ্ত হয়, তৃতীয় হেন্‌রীর শাসন কালে। তৃতীয় হেন্‌রী জনগণের অভিলব্ধ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলে সাইমন ডি মণ্ট্‌ফোর্ডের নেতৃত্বে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে ব্যারণগণ রণবেশে অক্সফোর্ডে সম্মিলিত হইলেন। এই অক্সফোর্ড সম্মিলনই সর্ব্বপ্রথম পার্লামেণ্ট অভিধায় পরিশোভিত হয়। এই অক্সফোর্ড সম্মিলন বা পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক হেন্‌রীকে এক কমিটির পর্য্যবেক্ষণায় রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে বাধ্য করা হয়। পরবর্ত্তী কালে হেন্‌রী এই বাধ্যানুবাধকতা ভঙ্গ করিলে ব্যারণগণ তাহার বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করেন; এই যুদ্ধে হেন্‌রী পরাজিত ও বন্দী হন। সাইমন ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন। তাহাতে ব্যারণ, বিশপ ব্যতীতও নাইটদিগকে ও প্রতি নগরের দুই জন প্রতিনিধিকে আসন প্রদান করা হয়। ৩০ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর প্রথম এডোয়ার্ড যে পার্লামেণ্ট আহ্বান করেন, তাহাতেই আধুনিক যুগের পার্লামেণ্টের ক্রাউন, লর্ডস্ ও কমন্সের রূপ সর্ব্বপ্রথম পরিস্ফুরিত হয়।

পঞ্চম হেন্‌রীর সহিত (১৪১৩—২২ খৃঃ) পার্লামেণ্টের ভাব-স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ষষ্ঠ হেন্‌রীর রাজত্বকালেই বিল ও ষ্ট্যাটুট সহায়তায় রাজ্যশাসন-প্রণালীর প্রবর্ত্তনা দেখা দেয়। প্রথম জেম্‌স আপনাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি ও সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিলে পার্লামেণ্টের সহিত তাহার নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম বাঁধে। জেম্‌স একাদিক্রমে তিন বার পার্লামেণ্ট আহ্বান করিলেও প্রতিবারেই পার্লামেণ্ট রাজার সুশাসনের প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে তাহার দাবী আনুপাতিক রাজ্যশাসনের ব্যয়বরাদ্দ না-মঞ্জুর করেন। ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট জেম্‌স-গভর্ণমেণ্টের লর্ড ট্রেজারারকে প্রজাসাধারণের

অর্থ অপব্যয় করিবার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া রাজশক্তির উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ন্ত্রণে আপনাকে সামর্থ্যবান্ বলিয়া প্রচার করিতে সক্ষম হন। প্রথম চার্লসের (১৬২৫—৪৯ খৃঃ) রাজত্ব কালের প্রারম্ভেই পার্লামেণ্টের সহিত তাহার প্রচণ্ড নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম দেখা দেয়। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে, রাজার বে-আইনী কর নির্দ্ধারণ ও স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন রাজ্যে অবলুপ্ত না হইলে রাজ্যশাসনের ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরীকৃত হইবে না। জন্ পিম্ ও হেম্পডেনের অধিনায়কতায় ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, তিন বৎসরের অধিক কালের জন্য রাজা পার্লামেণ্টের অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারিবেন না। ঐ সময়ে পার্লামেণ্টের সদস্যগণের মধ্য হইতে রাজার মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিবার বিধানও বিধিবদ্ধ হয়। তৎপরবর্ত্তী চারি বৎসর পার্লামেণ্টের সহিত চার্লসের ঘোরতর সশস্ত্র সংগ্রাম চলে। অলিভার্ ক্রমওয়েল্ পার্লামেণ্টীয় দলের নেতৃত্বভার বরণ করিয়া রাজকীয় বাহিনীকে পরাভূত করেন। তৃতীয় উইলিয়ামের রাজত্ব কালে পার্লামেণ্টের অভ্যন্তরে পার্টি-প্রাধান্যের সৃষ্টি হয়। প্রথম জর্জ্জের (১৭১৪—২৭ খৃঃ) রাজত্ব কালে যখন ওয়েলপোল প্রধান মন্ত্রীর পদে সমাসীন, তখন হইতেই ক্যাবিনেটের অধিবেশনে রাজার অনুপস্থিত থাকিবার প্রথার উদ্ভব এবং প্রধান মন্ত্রীর ক্যাবিনেট পরিচালনার দায়িত্বের উৎপত্তি। তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্বকালে (১৭৬০—১৮২০ খৃঃ) পার্লামেণ্টীয় শাসনতান্ত্রিক বিধি আরও উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইলে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে আর্ল গ্রের প্রধানমন্ত্রিত্বে পার্লামেণ্টে যে রিফর্ম্ম বিল পরিগৃহীত হয়, তাহাতে জনগণের ভোটাধিকার বহুল পরিমাণে সম্প্রসারণ লাভ করে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ডিজরেলী কর্ত্তৃক উত্থাপিত রিফর্ম্ম বিলে পার্লামেণ্টীয় গঠনধারায় যে নবতর অভিব্যক্তি বিকাশ লাভ করে, তাহাই বৃটিশ পার্লামেণ্টীয় অভিব্যক্তিবাদের প্রায়-শেষ-উৎসর্গ-ফলরূপে অদ্যাবধিও পরিকীর্ত্তিত থাকিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন দেশের শাসনতান্ত্রিক বিধির আদর্শরূপে পরিগণিত। ডিজরেলীর কার্য্য-সমান্তরালতায় পিট্, মেলবোর্ণ,

গ্লাডষ্টোন, লর্ড পামারষ্টোন, আর্ল রাসেল, পার্ণেল, সেলিস্‌বারি প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাতনামা ইংলণ্ডীয় সন্তানগণ আপন আপন প্রতিভা ঢালিয়া ইংলণ্ডের যে যান্ত্রিক শাসন-প্রথাকে যন্ত্র-চৈতন্যের চরম অবদানে শোভমান করিয়া তুলিয়াছেন, বিংশ শতাব্দীর বর্ত্তমান ক্ষণে (জানুয়ারী, ১৯৪০ খৃঃ) তাহারই প্রতিনিধিত্বের সুবিপুল দায়িত্ব ও পদগৌরব বহন করিতেছেন, মিঃ নেভিল চেম্বারলেন।

ইংলণ্ডে এঙ্গলো-সেক্সনদের আগমন সময় হইতে বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক ঘনঘটাপূর্ণ সময় পর্য্যন্ত ইংলণ্ডীয় রাষ্ট্রতান্ত্রিক বিধি-বিকাশের ইহাই এক নিঃশ্বাসে বলিবার মত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বলা আবশ্যক যে, এঙ্গলো-সেক্সন সমাজের অ্যারিষ্টোক্রাসী অবলুপ্ত না হইয়া বংশানুক্রমিকতায় বিচরণ করতঃ কাল-প্রবাহে প্রবাহিত হওনানন্তর আর্ল, লর্ড, ব্যারণ ইত্যাদি অভিধায় ব্যষ্টি-বিশেষকে অলঙ্কৃত করিয়া পার্লামেণ্ট হইতে পৃথকীকৃত হয় তৃতীয় এডোয়ার্ডের রাজত্বকালে (১৩২৭—৭৭ খৃঃ)। ইহাই আধুনিক হাউস অব লর্ডস্‌এর বাহ্যরূপের প্রাথমিক অস্তিত্ব-স্বাতন্ত্র্য। বাস্তবিক পক্ষেই ক্রাউন এবং কমন্স ও লর্ডস্‌ সভামূলে ইংলণ্ডের যে পার্লামেণ্টীয় শাসনবিধি যন্ত্রস্বভাবসম্পন্নতার ভিতর দিয়া আপন চলন ভঙ্গিমায় সূক্ষ্ম নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া চলিয়াছে, তাহার উৎকর্ষতা-সাধনী-অংশ অনাগত, লম্বিত কালবক্ষে বহু-দূর-প্রসারী বটে।

যুগ যুগ ব্যাপিয়া যন্ত্র-প্রগতিমুখীনতায় পরিচালিত ইংলণ্ডের এই পার্লামেণ্টীয় শাসনবিধির পরিবেষ্টনীতে অন্তর্ভুক্ত আমাদের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অগ্রগামী সম্প্রদায় ডোমিনিয়ন-ক্ষমতা-প্রদানকারী ওয়েষ্টমিনষ্টার ষ্ট্যাটুটের ক্রিয়মানতার প্রতীক্ষাপরায়ণ না থাকিয়া ইংলণ্ডীয় শাসনতন্ত্রের গোটা যন্ত্র-কাঠামোরই ক্রাউনবর্জ্জিত পূর্ণস্বারূপাকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিলাষী। ভারতবর্ষের জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশের অন্তরের প্রাঞ্জল চাহিদাই তাহারা ব্যক্ত করিতেছেন বলিয়া দাবী করিতেছেন।

(৩)

যে তথাকথিত রাজনৈতিক চেতনায় কয়েক শত বর্ষ ব্যাপিয়া ইংলণ্ড উদ্বোধিত, বিগত উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে তাহার ক্ষীণরশ্মিরেখা ভারতবর্ষে সমুদিত হয়। ইংলণ্ডীয় রাজনৈতিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে রাজনৈতিক জীবন উদ্বোধিত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জাগরণ একত্রে দানা বাঁধিয়া সম্প্রসারণশীল হইতে আরম্ভ করে, উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চমদশক অতিবাহিত হওয়ার পরে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রাজেন্দ্র লাল মিত্র, রাম গোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কর্ত্তৃক কলিকাতায় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন এবং জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ, দাদা ভাই নৌরজী প্রভৃতি কর্ত্তৃক বোম্বাই নগরীতে বোম্বে এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম রাজনৈতিক সঙ্ঘজীবন পরিচালনার সূত্রপাত হয়। তাহার প্রায় সমসাময়িক কালে মাদ্রাজ নগরীতেও মাদ্রাজ নেটিভ এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু মদ্র-সন্তান আনন্দ চার্লু, বীর রাঘব আচারি, রঙ্গিয়া নাইডু, সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রভৃতির দেশাত্মবোধের নিয়ন্ত্রণে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে 'হিন্দু' পত্রিকার প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত মাদ্রাজে নব চেতনার উন্মেষ বিকাশ লাভ করে নাই। সপ্ত-দশকের মধ্যবর্ত্তী সময়ে কৃষ্ণজী লক্ষ্মণ মুলকার, সীতারাম হরি চিপলোঙ্কর প্রভৃতির প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া পুনাতে সার্ব্বজনিক সভা জন্ম লাভ করে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের উদ্বোধনায় কলিকাতায় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠা হয়। আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, বিচারপতি প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তৎকার্য্যে সুরেন্দ্রনাথের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের চিন্তাপ্রগতি-সাদৃশ্যে যাহারা অলঙ্কৃত ছিলেন, তাহারা বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনকে অ্যারিষ্টোক্রাসীর রশ্মি-বিকাশ-স্থল বলিয়া বিবেচনা

করাতেই ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন উৎপত্তি লাভ করে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের অধিনায়কতায় দেশে প্রতিনিধিমূলক শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য লইয়া কলিকাতায় ন্যাশনাল লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎ-খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে যে মহাজনসভা অভ্যুদয় লাভ করে, তাহা গণপ্রতিনিধির সম্মেলন-ক্ষেত্র বলিয়াই খ্যাতি লাভ করে। বোম্বে এসোসিয়েসন বিলুপ্ত হইলে জামসেদজী জিজিভয়, ফিরোজ সা মেটা, দীনশা ওয়াচা প্রভৃতির নেতৃত্বে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বে প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আদেরে অনুষ্ঠিত থিওসফিক্যাল সোসাইটির বাৎসরিক অধিবেশনে বাংলা, মাদ্রাজ, পুনা, বোম্বাই, পাঞ্জাব, এলাহাবাদ, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তপ্রদেশ হইতে যে সকল কৃতী ভারতসন্তান একত্রে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তাহারা কলিকাতায় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত জাতীয় কনফারেন্সের নির্দ্দেশের আলোকে দেশে এক জাতীয় আন্দোলনকে উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিবার আলোচনা করেন।

ভারতবর্ষের এই নব জাগ্রত, অব্যবস্থিত ও বিক্ষিপ্ত ভাবধারাকে সুবিন্যস্ত করিয়া ভারতের গণনিয়ন্ত্রণ-অভিব্যক্তিতে আপনাকে নিবেদন করিতে অগ্রসর হইলেন, এলেন অক্টোভিয়ান হিউম। স্কচম্যান অক্টোভিয়ান হিউম ভারত-গভর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী ছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে হিউম সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া শিমলা শৈলে বাসস্থান প্রতিষ্ঠিত করতঃ গণ-জাগরণের বিচ্ছিন্ন ভাবসমষ্টিকে একত্রিত করিয়া তাহাকে একটি বিশিষ্ট প্রবাহে পরিচালনা করিতে অগ্রসর হইলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ তারিখে হিউম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণের উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠি প্রকাশিত করেন। দেশাত্মবোধে আত্মস্থ হওয়ার ইঙ্গিত পরিপূর্ণ এই পত্র রোমানদের নিকট সেন্ট্ পলের বাণী-সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহারই প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ায় কলিকাতায় ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন নামে এক নব প্রতিষ্ঠান

অভ্যুদয় লাভ করে। এই ইউনিয়নের পক্ষ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের খৃষ্টোৎসবকালে পুনাতে এক সর্ব্বভারতীয় সম্মেলন আহ্বান করা হয়। সেই সম্মেলনই যথাকালে পুনার পরিবর্ত্তে বোম্বাই নগরীতে অনুষ্ঠিত হইয়া কংগ্রেস অভিধায় পরিশোভিত হয়।

হিউম ভারতের সামাজিক সমস্যার নিরাকরণের উপর ভিত্তি করিয়াই একটি স্থায়ী জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু ভারতবর্ষের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডাফ্রিন শাসন কার্য্যের সুবিধায় শাসিতের প্রয়োজন-অভিব্যক্তির আবশ্যকতা বুঝাইয়া বলিলে হিউম সেই প্রতিষ্ঠানকে ভারতবর্ষের বে-সরকারী পার্লামেন্টরূপে গঠন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শা ডিসেম্বর তারিখে গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। স্যার উইলিয়াম ওয়েড্ডারবার্ণ, বিচারপতি জার্ডিন, কর্ণেল ফেল্প্স, অধ্যাপক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং বোম্বাই নগরীর অপরাপর খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ সংস্কৃত কলেজে গমন করিয়া প্রতিনিধিগণকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। নবযুগের অভ্যুদয় পটে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনের অনুপ্রেরণায় দর্শক, প্রতিনিধি, সরকারী ও বে-সরকারী ব্যক্তিবর্গ সকলেই সঞ্জীবিত হইয়া কর্ম্মবোধে সন্দীপ্ত হইয়াছিলেন।

অধিবেশনে প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাতনামা ব্যারিষ্টার, সর্ব্ব বাংলার নব্য চেতনার অভিব্যক্তিস্বরূপ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষুদ্রকায় হইয়াও বৃহৎবোধে সমাসীন, গ্রাণ্ড ওল্ডম্যান অব ইণ্ডিয়া—দাদা ভাই নৌরজী, ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র-জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নরেন্দ্রনাথ সেন, পশ্চিম ভারতবর্ষের দিক্‌পালসদৃশ কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলাং, ফিরোজ সা মেটা, রহিমতুল্লা সয়ানী, খ্যাতনামা সংখ্যাবিদ্ দীনশা ওয়াচা, সংযুক্তপ্রদেশের গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা, পাঞ্জাবের লালা মুরলীধর, খ্যাতিশীল আইনজ্ঞ রঙ্গিয়া নাইডু প্রভৃতি; আর সমবেত প্রতিনিধিগণের উপর চুম্বক

আকর্ষণ বিস্তারিত করিয়া তাহাদের সকর্ম্ম পরিধাবনার কেন্দ্রানুবর্তিরূপে প্রশান্তোজ্জ্বল গাম্ভীর্য্যে অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এলেন অক্টোভিয়ান হিউম। সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের উদ্দেশ্যকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগের ব্যাখায় এইরূপ বলিয়াছিলেন যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যাহারা দেশহিতে ব্রতী, তাহাদিগের সহিত কংগ্রেস ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় কলিকাতায়। ভারতবর্ষের ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য এবং ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার-সম্পর্কে সেই অধিবেশনে আলোচনা হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনের পূর্ব্বেই গভর্ণমেণ্টের সহিত কংগ্রেসের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্যের ক্ষুন্নতা সাধিত হইয়াছিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনের পূর্ব্বে বৃটিশ পার্লামেণ্টে লর্ড ক্রসের ভারতীয় সংস্কার আইন পরিগৃহীত হয়। কংগ্রেস ক্রমাগত কয়েক বৎসর যাবৎ ব্যবস্থাপক সভার যে সংস্কার দাবী করিতেছিলেন, তাহারই সহিত সামঞ্জস্য রক্ষায় ঐ আইনে যে বিধান বিধিবদ্ধ করা হয়, তাহাতে বিভিন্ন প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়, ডিষ্ট্রীক বোর্ড, মুন্সিপালিটি এবং অপরাপর গণপ্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্ব্বপ্রথম ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের পুনা অধিবেশনে রাও বাহাদুর ভীড়ে বলেন, আমরা এক পিতার সন্তানরূপে প্রথমে ভারতবাসী, পরে হিন্দু-মোসলমান-পার্শী-খৃষ্টান। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ অধিবেশনের সভাপতি আনন্দমোহন বসু বলেন, আমরা যুদ্ধ-কার্য্যের অনুসরণকারী নহি, মাতৃভূমির কল্যাণ সাধনই আমাদের একমাত্র কাম্য। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা অধিবেশনে বৃটিশ উপনিবেশসমূহের ন্যায় স্বায়ত্তশাসন বা ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস লাভ করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেসের ক্রম-আন্দোলনের ফলে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার আর এক দফা সংস্কারমূলক আইন বিধিবদ্ধ হয়, যাহা মর্লিমিণ্টো অ্যাক্টরূপে ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে। ঐ অ্যাক্টবলে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক

ব্যবস্থাপক সভাসমূহ পুনর্গঠিত হইয়া অধিকতর নির্ব্বাচিত সদস্যগণের প্রবেশ-স্থলরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই মর্লিমিণ্টো অ্যাক্টের অধিকতর সম্প্রসারণে ১৯২০ এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে আরও দুইটি আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দেই ভারতবর্ষীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ঘটে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্রুর প্রস্তাবক্রমে স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্ত্তে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই কংগ্রেসের কার্য্যক্রমের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কংগ্রেসীয় ইতিহাসের খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ—বালগঙ্গাধর তিলক, জি এস খপর্দ্দে, লালা লাজপত রায়, আলী ভ্রাতৃদ্বয়, মতিলাল ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহ্রু, হাকিম আজমল খান, ডাক্তার আন্সারী, তরুণ রাম ফুকন, অধুনা কংগ্রেস কর্ম্মে নির্লিপ্ত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতির দেশহিত-ব্রত-সাধনের অবদান-পারম্পর্য্যে কংগ্রেসের ভাবধারা ও তাহার যান্ত্রিক গঠন বহুল পরিমাণে পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ণ-স্বাধীনতাকামী জনগণের প্রতিনিধিরূপে যে সকল নেতা এক্ষণে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল ব্যক্তিত্ব লইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাহাদের সকলেরই মতসাম্যে সমতা প্রকাশ না করিয়াও বর্ত্তমান কংগ্রেসের প্রাণপুরুষ মহাত্মা গান্ধী অখণ্ড ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনার কেন্দ্রানুবর্ত্তিরূপে আপন আত্মবৈশিষ্ট্য-প্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া দেদীপ্যমান—ইহাই আমরা অবলোকন করিতেছি।

(৪)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইংলণ্ডের দূরদর্শী রাজনীতিবিদ্ এডমাণ্ড বার্কের ভারত হিতৈষণার পরিচয় প্রকাশিত হইবার পর উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে অগ্রসর হইয়া আসিলে ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক উৎকর্ষতা সাধন করিবার জন্য ইংলণ্ডের যাঁহারা বিপুল প্রয়াস উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে

জন্ ব্রাইট্‌কে আমরা অগ্রবর্ত্তীরূপে দেখিতে পাই। জন্ ব্রাইট্ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হন। ১৮৪৭ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জন্ ব্রাইট্ পার্লামেণ্ট এবং মন্ত্রিসভার সদস্যরূপে সুবিপুল ও সুবিচিত্র কর্ম্মসাধন করিয়াও ভারতবর্ষের কল্যাণের তরে পার্লামেণ্টে যে কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয় বটে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে স্যার চার্লস্ উডের ইণ্ডিয়া-বিলের আলোচনা কালে ভারতবর্ষের প্রতি বিল-আনয়নকারীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন কামনা করিয়া জন্ ব্রাইট্ ঘোষণা করিয়াছিলেন,—

"There never was a more docile people, never a more tractable nation. The opportunity is present and the power is not wanting. Let us confine ourselves to a territory ten times the size of France, with a population four times as numerous as that of the United Kingdom. If we desire to see Christianity, in some form professed in that country, we shall sooner attain our object by setting the example of a high-toned Christian morality, than by any other means we can employ."

তাৎপর্য্য—ভারতীয়গণের ন্যায় অধিকতর নম্র এবং চালনাসহ জাতি আর কখনও দেখা যায় নাই। সুযোগ এক্ষণে সমুপস্থিত, শক্তিরও অভাব ঘটে নাই। ফরাসী ভূমির পরিসর অপেক্ষা দশগুণে অধিক পরিসর এবং বৃটিশ যুক্তসাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা অপেক্ষা চারিগুণে (?) অধিক লোকসংখ্যা সমন্বিত ভারতবর্ষের প্রতি এক্ষণে আমাদের সমুচিত দৃষ্টি প্রদান করা হউক। খৃষ্টীয় মত প্রকারান্তরিতভাবে সেই দেশে প্রচলিত হউক, ইহা যদি আমরা ইচ্ছা করি, তবে অপর কোনও পন্থার প্রয়োগ ব্যতিরেকে খৃষ্টীয় নীতিবাদের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তের প্রয়োগ দ্বারাই আমাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে।

ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডীয় সন্তানের এবম্প্রকার আকর্ষণের অভিব্যক্তি আমরা তৎপর হেন্‌রী ফসেটের ভিতর দেখিতে পাই। অর্থনীতিশাস্ত্রবিৎ

হেন্‌রী ফসেট ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হেন্‌রী ফসেট তাঁহার নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর নিকট ঘোষণা করিয়াছিলেন,—

"The people of India have no votes. They cannot bring even so much pressure to bear upon Parliament as can be brought by one of our Railway companies ; but with some confidence, I believe that I shall not be misinterpreting your wishes, if, as your representative, I do whatever can be done by one humble individual to render service to the Indians."

তাৎপর্য্য—ভারতীয়গণের কোন ভোট নাই। আমাদের একটি রেল কোম্পানী পার্লামেণ্টের উপর যে চাপ প্রয়োগ করিতে পারে, তাহারা তাহাও প্রয়োগ করিতে পারে না ; আমি ইহা বিশ্বাস করি যে, আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গমন করিব না—যদি আমি আপনাদের প্রতিনিধি হিসাবে, একক ব্যক্তির পক্ষে যাহা সাধন করা সম্ভব, ভারতীয়গণের কল্যাণকল্পে তাহা সাধন করি।

শাসনতান্ত্রিকতার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধন করিবার এই দুরন্ত আকর্ষণ-বোধ-প্রসঙ্গে পার্লামেণ্টের সদস্যচতুষ্টয় চার্লস ব্রাড[illegible], রিড, স্লেগ, বাক্‌ষ্টার এবং সিভিলিয়ান স্যার জেম্‌স কার্ড, উইলিয়াম [illegible]ার, লর্ড ডালহৌসী, মার্কুইস অব রিপন প্রভৃতির নামও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইহাও ঐকান্তিক শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বে-সরকারী অবস্থিতি হইতে ইংলণ্ডের যাঁহারা ভারতবর্ষের প্রতি অকপট আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিদুষী মহিলা অ্যানি বেশান্ত অন্যতমারূপে পরিগণিত। ভারতবর্ষকে আপন জন্মভূমিরূপে গ্রহণ করিয়া ভারতবাসীর অ-দৃষ্টের সহিত আপন অ-দৃষ্টকে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া লইয়া বর্ত্তমান ভারতবাসীর নিকট পূর্ব্বপুরুষের কর্ম্মবৈগুণ্যের ফল যদি ইংলণ্ডের কেহ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন,

তবে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন অ্যানি বেশান্ত। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় দেশই এই মহীয়সী মহিলার নাম স্মরণে গৌরবান্বিত বোধ করিতে পারে।

ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের এই সম্পর্ক-প্রসঙ্গ লইয়া আমরা যদি বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধ কালে যাইয়া উপনীত হই, তবে তৎকালে (১৯১৪—১৮ খৃঃ) যিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত ছিলেন, সেই মিঃ লয়েড জর্জ্জের একটি উক্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মিঃ লয়েড জর্জ্জ ঘোষণা করিয়াছিলেন,—

"We (Englishmen) believe, that the unity and peace of mankind can only rest upon Democracy, upon the right of those who submit to authority to have a voice in their own Government, upon respect for rights and liberties of nations both great and small and upon the universal dominion of public right."

তাৎপর্য্য—আমরা ইংরেজ জাতি এইরূপ বিশ্বাস করি যে, অখণ্ড মানব-জাতির শান্তি গণতন্ত্রবাদের উপর, উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষে নির্ভরশীল দেশবাসিগণের তাহাদের নিজের দেশের শাসনপদ্ধতিতে আধিপত্য প্রয়োগ করিবার ক্ষমতার উপর, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল জাতির ক্ষমতা ও স্বাধীনতা স্বীকৃতির উপর এবং বিশ্বের প্রতি-প্রত্যেকের নাগরিক অধিকার সম্ভোগ-মূলে প্রতিষ্ঠিত এক বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের উপর নির্ভর করে।

মিঃ লয়েড জর্জ্জের এই উদার আত্মব্যঞ্জনায় ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি পরিস্ফুট। তৎকালীন ভারতসচিব মিঃ নেভিল চেম্বারলেন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের এক ভোজসভায় ঘোষণা করিয়াছিলেন,—

"India would be the great storehouse of the empire; she must not remain a mere hewer of wood and drawer of water."

তাৎপর্য্য—ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের মৌলিক কেন্দ্ররূপে পরিণত হইবে। ভারতবর্ষ অবশ্যই আজ্ঞাবহ ভূমিকায় অবনমিত থাকিবে না।

এক্ষণে একান্ত আধুনিক কালপটে এক বার দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যাউক। বিগত ২৮শা নবেম্বর তারিখে (১৯৩৯ খৃঃ) মেজর এট্‌লী বৃটিশ পার্লামেণ্টে ইংলণ্ডীয় গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে সাম্রাজ্যবাদ পরিহার করিবার এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্পর্কে উচ্চ আদর্শের অনুসরণ ঘোষণা করিবার দাবী উপস্থিত করিলে (তদানীন্তন) প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন তদুত্তরে বলেন,—

"Major Attlee had said that imperialism must be abandoned but did not say what country he had in mind as practising imperialism to-day. If imperialism means the assertion of racial superiority, suppression of political and economic freedom of other peoples, the exploitation of the resources of other countries for the benefit of the imperialist country, then I say, that these are not the characteristic of this country (England)"

তাৎপর্য্য—সাম্রাজ্যবাদ পরিহার করিতে হইবে মেজর এট্‌লী ইহাই বলিয়াছেন, কিন্তু কোন্ দেশ সাম্রাজ্যবাদী, তাহা বলেন নাই। জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা, অপর জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে খর্বিত রাখা এবং অপর দেশের ধন-সম্পদ্ শোষণ করা—ইহাই যদি সাম্রাজ্যবাদের মূলগত অর্থ হয়, তবে আমি বলিতেছি যে, ইংলণ্ডীয় ভূমির তাহা কদাপিও বৈশিষ্ট্য নহে।

উক্তি উদ্ধৃতি আমরা এস্থলেই সমাপ্ত করিলাম।

ইহা বলিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাঙ্খার পরিপূরণ-কল্পে ইংলণ্ডের অনেকানেক প্রাজ্ঞ, ধীর ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ্ যথোচিত প্রয়াস বিনিয়োগে কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই।

ইংলণ্ডের ব্যক্তি-বিশেষগণ ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ও সমাজ বিশোধনে যে অবদান সংরক্ষা করিয়া আমাদিগকে ইংলণ্ডের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, আমরাও কোনও কালে তেমনি মাঙ্গল্য-অবদানে ইংলণ্ডকে পরিপুষ্ট করিতে পারিয়াছি কি না, ইহা একটি প্রশ্ন বটে। ঐতিহাসিক বিবরণে আমরা তাহার সদুত্তর লাভ করিতে পারিব না। ইতিহাস যে বাহ্য ঘটনার প্রতিবিম্বকে বক্ষে ধারণ করিয়া বিচরণশীল হয়, আমরা যদি তাহার অন্তরালে স্থিত অবলুক্কায়িত ঘটনা-সমাবেশে অনুপ্রবেশ করি, তবে আমরা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির একটি পুষ্পকোরকই কাল-প্রবাহে চালিত হওতঃ ইংলণ্ডে প্রস্ফুটিত হইয়া ক্রমে চৌদিকে সৌরভ বিস্তার করতঃ ইংলণ্ডকে পৃথিবীর মধ্যে বিপুল খ্যাতিসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ভাবজগতের উপাদান-রাজির বিচরণশীলতার ভিতর হইতে স্থূলজগতে যে বস্তুর আবির্ভাব ঘটে, কারণজ্ঞানে তাহার আলোচনায় অগ্রসর হইলে পারিবারিক রক্তসম্বন্ধের মত একটা সুদৃঢ় সম্বন্ধের বন্ধন ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের বিদ্যমান আছে বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। এই বন্ধন প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষ অন্তর্লোকে যে কর্ম্মবৈচিত্র্য সংসাধন করিয়া বিশ্বস্থিতিপটের একাঙ্গীনতায় উভয় দেশকেই স্থাপন করিয়াছে, তাহা আমাদের লৌকিক দৃষ্টির তাজমহলে শোভমান নহে বলিয়াই আমরা কেহই তাহার মর্ম্মরহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে পারিতেছি না; ফলে উভয় দেশের বাহ্য-সম্বন্ধ-গ্রন্থিতে যে জটিলতার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা নিরাকৃত হইতেছে না।

এক্ষণে আমাদের করণীয় এই যে, আমাদের পূর্ব্বানুষ্ঠিত যে কর্ম্ম-সমুদয় আমাদের প্রত্যক্ষবোধের অন্তরালে থাকিয়া কার্য্যকারণতত্ত্বের প্রবহমানতায় উভয় দেশের অবলুক্কায়িত আত্মীয়তাকে বাহ্যরূপের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাকে শুধু মাত্র স্মরণে রাখিয়া এবম্প্রকার চলনাকে অনুসরণ করা, যাহাতে আমরা বোধ ও মননের ক্রমবাহিত পশ্চাৎ পটে গমন করিতে পারি। অস্তিত্বের পটভূমিকা হইতে যে অকল্পনীয় সংবৃদ্ধি

উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়া জগতে সংবৃদ্ধির প্লাবন বহাইয়া দিতে পারে, সেই সংবৃদ্ধিকে আয়ত্ত করিবার কৌশল-জ্ঞান যদি আমরা ইংলণ্ডকে বিতরণ করিতে পারি, তাহা হইলে একই অঙ্গের উভয়পার্শ্বিক রক্তবহা নাড়ীর ন্যায় ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড একত্র হইয়া জগতের সর্ব্বাঙ্গে বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, বোধ, মনন, ধ্যান পরিবেশন করিতে সমর্থ হওতঃ সর্ব্বজাতিতে দিব্য জ্ঞানের আবির্ভাবকে সহজ ও প্রতুল করিয়া তুলিয়া স্বর্গীয় প্রেমের রাজ্যকে এই মরজগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসনতান্ত্রিক কাঠামোতে ইংলণ্ড-রচিত স্বায়ত্তশাসনের রূপকে সংগ্রথিত করিতে হইলে অথবা শাসনতান্ত্রিক যোগ্যতার ভিত্তিতে আমাদের দেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশ বলিয়া ঘোষণা করিতে হইলে, আমরা যদি এমনি প্রকারে বাহ্য-ঘটনা-সংস্থিতির অন্তরালে গমন করিয়া তাহার স্বভাব-স্বচ্ছ ভাবপটে উপনীত হই, তবেই নাড়া-দেওয়া বৃক্ষের পুষ্পবর্ষণের মত ইংলণ্ড হইতে আমাদের উপর যান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতা বর্ষিত হইবে।

আমরা কোন্ পথে ?

(১)

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন-আইন ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে শান্তরৌদ্ররস-প্রসিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। শান্ত নিয়মতান্ত্রিকতায় যাঁহারা ধীরপাদক্ষেপে চলিয়াছেন, তাঁহারা রৌদ্র-বৈপ্লবিক মনোভাবের সম্মুখীন হইয়াও তাহাকে দমন করিয়া চলিতেই সক্ষম হইতেছেন। উক্ত আইনের সক্রিয়তার আলোক-সম্পাতে আমাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লাভের ক্রম-পরিণতি-বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাইতে পারে কি ?

এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আইন দুই অংশে বিভক্ত,—প্রাদেশিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয়। বিগত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে প্রাদেশিক অংশ প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে এবং কংগ্রেস কর্ত্তৃক ৮টি প্রদেশে উহা গৃহীত হওয়ায় তৎ তৎ প্রদেশে কংগ্রেসী-গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কংগ্রেস কর্ত্তৃক ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন-আইনের প্রাদেশিক অংশ গ্রহণ করিবার মূলে আছে, কংগ্রেসের সহিত ভারতের বর্ত্তমান (১৯৩৯ খৃঃ) বড়লাটের একটি 'জেণ্টলম্যানস্ এগ্রিমেণ্ট'। এই 'এগ্রিমেণ্ট' বলেই কংগ্রেসী প্রদেশের লাটসাহেবগণ কংগ্রেসী-মন্ত্রিসভার কার্য্যাবলীতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত, কংগ্রেসী-মন্ত্রিগণ আইনানুগভাবে কার্য্য পরিচালনায় স্বাধীনতা প্রাপ্ত। প্রাদেশিক অংশের ভাল-মন্দ যাহা আছে, তাহা কার্য্যতঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে, ভবিষ্যতেও হইবে। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদের পরমায়ু আরও এক বৎসরের জন্য প্রলম্বিত করিয়া দেওয়ায় ইহা বুঝা যাইতেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশ প্রবর্ত্তনের বিলম্ব আছে।

অহিংস সত্যাগ্রহ এবং আইন অমান্য ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবাসীর আত্মচেতনার উদ্বোধনমূলে যে সুফল প্রসব করিয়াছে, তাহা আমরা বিস্মৃত না হইয়া ইহা লিখিতেছি যে, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক

আবহাওয়া এমনি এক অবস্থার প্রতি ধাবমান হইয়া অগ্রসর হইতেছে, যাহা গভর্ণমেণ্টের সহিত জনসাধারণের কোনওপ্রকার সংঘর্ষমূলক-অবস্থার দ্যোতক ত নহেই, বরঞ্চ যাহা উভয়ের মধ্যে সর্ব্ব দিক দিয়া একটা ভাবসাম্য-সংস্থাপনের পূর্ব্ব লক্ষণরূপে প্রকটিত।

এবম্প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা কংগ্রেসের আধুনিক নিয়মতান্ত্রিক বিবর্ত্তন পূর্ণরূপেই সমর্থন করিতেছি। তাহার অর্থ কখনও ইহা নহে যে, তথাকথিত যে 'প্রভিন্সিয়াল অটোনমী' আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাকেই আমরা আমাদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খা পরিপূরণের সর্ব্বশেষ বস্তু বলিয়া মনে করি। ভারতের অখণ্ড-স্বাধীন-রাষ্ট্র আমাদেরও কাম্য। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার সমতালে চলিয়া সেই স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ করার পক্ষে আমাদের করণীয় কি, তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। করণীয় দুই প্রকার আছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

যুক্তরাষ্ট্র সর্ত্তাধীনে (সংশোধিত আকারে) গ্রহণ করা যেরূপ প্রাদেশিক অংশ সর্ত্তাধীনে গ্রহণ করা হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সংস্কারমূলক প্রচলিত আইন বাতিল করিয়া পূর্ব্ব প্রচলিত আইন নবরূপে জারি করা হইয়াছে, রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। অতএব ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারতের মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন-সংস্কার যেরূপ তাহার পশ্চাৎপদীয় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারে অথবা উক্ত মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার যেরূপ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কারে যাইয়া পরিণতি লাভ করে নাই, সেইরূপ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কারও অগ্রগামী হওয়ার পরিবর্ত্তে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে না—ইহা ধরিয়া লইয়া উক্ত সংশোধিত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-সংস্কার-আইনকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার প্রয়াস করিতে হইবে।

যদি দেখা যায়, তৎপ্রয়াসের মধ্য দিয়াও আমাদের জাতীয় দৈন্য-দুঃখ-দুর্দ্দশা গোড়া হইতে উৎপাটিত হইতেছে না, তবে আমাদের অন্য পথ অবলম্বনীয়।

কংগ্রেসের প্রস্তাবে আছে, "গণপরিষদ দ্বারা ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।" বহু জন হইতেই গণের উৎপত্তি হয়, বহু ব্যষ্টির সমবায় হইতেই সমষ্টির উৎপত্তি হয়। কোম্পানীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার গোড়ায় ক্লাইভ, ওয়াট্সন, ভ্যান্সিটার্ট প্রভৃতি ইহাকে যে ভাবে কার্য্যে প্রতিফলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে। ভারতে কোম্পানীর রাজত্বের যে ব্যষ্টি বা খণ্ড অংশ তাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সম্প্রসারণের উপরেই বর্ত্তমান ভারত-গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব নহে কি ?

ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জিলা ভারতবর্ষের সমষ্টি-জিলার ব্যষ্টি-অংশ বিশেষ। ঐ ঐ জিলার লোক সমুদয় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যে সমস্ত কর তৎ-তৎ-জিলার শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করেন, উহাকে তাহাদের প্রতি শাসনকর্তৃপক্ষের সেবা প্রয়োগের অনুপাতে তাহাদের দান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে আমরা কোন বাধা দেখি না। ভারতবর্ষের এক বা একাধিক জিলার সর্ব্বদিক-প্রসারী সমুন্নতি সাধনের কার্য্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করিলে সেই জিলা বা জিলাসমূহের লোক সমুদয় নেতৃবৃন্দেরই পরিবেশিত পুষ্টির একটি অংশ তাঁহাদেরই সেবার প্রতিদান স্বরূপে তাঁহাদেরই হস্তে নিয়মিতভাবে অর্পণ করিবেনই—ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ জিলার লোক যেরূপ তৎ-তৎ-জিলার শাসনকর্তৃগণের নিকট তাহাদের সেবার প্রতিদান নিয়মিতভাবে অর্পন করিয়া থাকেন। সময় এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া ঐ এক বা একাধিক জিলা-বিশেষের কার্য্য ক্রমে বহু জিলায় ব্যাপ্ত করিয়া সম্প্রসারিত করিয়া লইলে তাহা কালক্রমে প্রদেশব্যাপী বা দেশব্যাপী হইয়া উঠিতে পারে। জনগণের এই প্রকার উন্নতিমূলক কার্য্য অর্থাৎ জনসেবা যদি বাহ্য এবং আন্তর—উভয়তঃই প্রযুজ্য হয়, তবে এই সেবা জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল মানুষেরই কামনার বস্তু হইয়া দেশ হইতে পক্ষাপক্ষের বোধ দূর করিয়া দিতে সক্ষম হইতে পারে ; অর্থাৎ নেতৃবৃন্দ এক বা একাধিক জিলা-বিশেষের উন্নতিমূলক কার্য্য

সাধনের জন্য মৌলিক সেবার ভিত্তিতে যে ক্রম-প্রসারণশীল পরিকল্পনাকে যন্ত্রে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবেন, আসমুদ্র হিমাচল পরিব্যাপ্ত সেই বিরাট পরিপোষণযন্ত্র ভারত-শাসনযন্ত্রকে ক্রম-প্রগতিমুখীনতায় পরিচালিত করিয়া তাহার সুসংস্কৃত প্রতিরূপের সহিত কোনও কালে একীভূত হওতঃ ভারতে এক আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করিয়া তুলিতে পারে।

আমাদের এই বক্তব্য অন্য প্রকারে নিবেদন করিবার চেষ্টা করিতেছি।

দেড়শত বৎসরেরও অধিক কালের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় ভারতবর্ষের যে শাসনযন্ত্রকে সুনিপুণভাবে গঠিত করিয়া তোলা হইয়াছে, তাহাকে দখল করিয়া লওয়ার বুদ্ধি ব্যতীত যদি আর কোন বুদ্ধি সহসা আমাদের না জন্মে, তবে তাহা বিশেষ দূষণীয় নহে; কেননা, তৎজাতীয় বুদ্ধি প্রকাশের দৃষ্টান্ত বিভিন্ন দেশে বহুল পরিমাণে প্রকটিত হইয়া সমষ্টিগতরূপে আমাদিগকে তন্মুখীনতায়ই আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রভাব হইতে ক্ষণকালের তরেও মুক্তিলাভ করিয়া আমরা যদি ভারতের এবং অপরাপর দেশেরও রাষ্ট্র-গঠনের মূলদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হই, তবে অবশ্যই দেখিতে পাইব যে, যাহারা যাহাদিগকে লইয়া রাষ্ট্র গঠন করিয়াছেন, তাহারা সেই তাহাদিগকে কোন-না-কোন প্রকারে সেবা দ্বারাও সমৃদ্ধ করিয়াছেন। সেই সেবার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের নেতৃবৃন্দ যদি এক বা একাধিক জিলা-বিশেষের অধিবাসীদের সার্ব্বাঙ্গিক পুষ্টি সরবরাহরূপ কার্য্যকে তাহাদেরই পক্ষে লাভজনক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়া তুলিতে পারেন, যেমন—ভারত-শাসন-ব্যাপার মূলতঃ ভারতবাসিগণের পক্ষেই লাভজনক বটে, যেমন—কোম্পানী আইনে রেজেষ্ট্রীকৃত দেশের বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানসমূহ কোম্পানীর অংশীদারগণের পক্ষেই লাভজনক বটে, তবে বর্ত্তমান ভারত-শাসনযন্ত্রকে সুসংস্কৃত করিবার পক্ষে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সংশোধিত ভারত-শাসন-আইনকে প্রাথমিক সংস্কারমূলক আইন স্বরূপ বিবেচনা করতঃ তাহাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার মূলে আমাদের নিজস্ব একটি ক্রম-বিস্তারশীল পরিপোষণ যন্ত্র কি গঠিত হইয়া উঠে না, সংবৃদ্ধি-সাধন-

বোধের কেন্দ্রানুবর্ত্তিতায় রচিত বলিয়া যাহার অস্তিত্ব ও সম্প্রসারণ ব্যাপারে কাহারও সহিত বিরোধ ত হইবেই না, অধিকন্তু যাহা সর্ব্ব-ভারতব্যাপ্তিতে বিরাটকায় প্রাপ্ত হইয়া প্রচলিত ভারত শাসনযন্ত্রের সুসংস্কৃত প্রতিরূপের সহিত কোনও কালে সম্মিলিত হওতঃ ভারতে এক আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করিয়া তুলিতে পারে ? *

(২)

বোম্বাই নগরীতে উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের তারিখ কংগ্রেসের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় দিনরূপে পরিকীর্ত্তিত। আমরা কংগ্রেসের সদস্যশ্রেণী-ভুক্ত না হইলেও—অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক-কাল-পরিব্যাপ্ত কংগ্রেসের অখণ্ড কর্ম্মধারার মূল্য আমাদের বোধানুপাতিক-ভাবে স্বীকার করিয়া থাকি বলিয়া ঐ তারিখটিকে আমরাও স্মরণীয় তারিখ বলিয়াই মনে করি। কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের অখণ্ড কর্ম্মধারায় যে একটা প্রকাণ্ড ছেদ পড়িয়াছে, উপলক্ষ সহকারে আমরা তাহার পরবর্ত্তী ইতিহাস এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

বিগত মহাযুদ্ধের অবসানের পর বিপ্লববাদ দমনের ঘোষণায় ভারত-গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রাউলাট আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর আসমুদ্র ভারত হইতে তাহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উত্থাপিত হইলেও ভারত-গভর্ণমেণ্ট তাহা উপেক্ষা করিলে মহাত্মাজী উক্ত আইনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং অহিংস সত্যাগ্রহ

* প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পরে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতে বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্টসমূহ ১৯৩৯, ২৭শা অক্টোবর হইতে পরবর্ত্তী ১৫ই নবেম্বরের মধ্যে পদত্যাগ করিয়াছেন; এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন-আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে কংগ্রেসী প্রদেশসমূহের গভর্ণরগণ তৎ তৎ প্রদেশের শাসন-রশ্মি স্ব স্ব হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা দ্বারা আমাদের মূল বক্তব্য বিষয়ের কোনও প্রকার ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই।

ঘোষণা করেন। পুলিশ দিল্লীর অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর গুলি চালনা করায় তাহার প্রতিবাদে জালিয়ানওয়ালাবাগে যে বিরাট জনসভা হয়, সেই সভায় মিলিটারি কর্ত্তৃক বিপুল হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়। হাণ্টার-কমিটির রিপোর্টে সেই হত্যাকাণ্ডের বীভৎস রূপ প্রকাশ পাইলেও গভর্ণমেণ্ট তাহার সমুচিত প্রতিবিধান অবলম্বন না করায় ১৯২০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ-অধিবেশনে মহাত্মাজী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তাহা গৃহীত হয়। পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে নাগপুর কংগ্রেসে তাহা দৃঢ়ীকৃত হওয়ার পর মহাত্মাজীর নেতৃত্বে প্রবল অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়।

এই অসহযোগ আন্দোলন ক্রমিকরূপে চৌরিচৌরার দুর্ঘটনা (১৯২১খৃঃ), স্বরাজ্য-দলের অভ্যুদয়, কাউন্সিলের ভিতর হইতে গভর্ণমেণ্ট ধ্বংস সাধনের প্রয়াস, সাইমন কমিশন বয়কট (১৯২৮ খৃঃ), নেহ্‌রু রিপোর্ট রচনা, পূর্ণ স্বাধীনতা বলিয়া 'স্বরাজ' শব্দের ব্যাখ্যা সাধন (১৯৩০ খৃঃ), গান্ধী-আরুইন চুক্তি সম্পাদন (১৯৩১, ৫ মার্চ্চ), কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধির দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান, ব্যক্তিগত-আইন-অমান্য ইত্যাদি ঘটনাবলী ও কার্য্যাবলী বক্ষে ধারণ করিয়া কথনও মন্থর গতিতে, কথনও বা ভীম পরাক্রমে, কথনও বা থামিয়া যাইয়া এবং নেতৃবৃন্দ ও তাঁহাদের অনুগামীদের পৌনঃপুনিক কারাবাস ও কারামুক্তি ঘটাইয়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের কোঠায় আগমন করতঃ এমন এক অবস্থায় যাইয়া পরিণতি লাভ করে, যাহাতে মহাত্মা গান্ধী উহাকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখিতে বাধ্য হন ; বৈপ্লবিক মনোবিদ্‌গণের প্ররোচনা সত্ত্বেও সেই আন্দোলনকে পুনর্জাগ্রত করা আজ পর্য্যন্তও সম্ভব হয় নাই। অধিকন্তু যে নিয়মতান্ত্রিকতা অসহযোগ আন্দোলনের উৎপত্তিকাল হইতে কংগ্রেস ভাবধারার বিরোধী বলিয়া পরিগণিত—১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেসী সদস্য প্রেরণ করিবার জন্য সাময়িক-

ভাবে যে কংগ্রেস-পার্লামেন্টারী-বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন-আইনের প্রাদেশিক অংশকে কার্য্যকরী করিবার উপলক্ষে কংগ্রেসের অপরিহার্য্য যন্ত্রাংশ-বিশেষে পরিণতি লাভ করিয়া কংগ্রেসকে সেই নিয়মতান্ত্রিকতায় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া লইয়াছে। *

অসহযোগ আন্দোলনের উৎপত্তি হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অখণ্ড কংগ্রেস ইতিহাসের ইহা এক সমুজ্জ্বল খণ্ড অংশ বটে। এই খণ্ড অংশের অন্তরালস্থিত ঘটনাবলীর ক্রমিক চলমানতায় অদূর ভবিষ্যতে আর একটি ছেদ পড়িবে কি না, তৎসম্পর্কে মতামত প্রকাশ না করিয়া আমরা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বিচার করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করি।

উদ্দেশ্য যে স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেই স্বাধীনতা রূপ পরিগ্রহ করিবে ইউরোপীয় আদর্শকে অবলম্বন করিয়া কি ? সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার লীলাভূমি ফ্রান্সের স্বাধীনতার কাঠামোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা কি দেখিতে পাই ?

১৭৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৮০ বৎসর ব্যাপিয়া ফ্রান্সে একটির পর একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো লইয়া পরীক্ষা হইয়াছে, কিন্তু কোনও কাঠামোই স্থায়ী রূপ লইয়া টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। তৃতীয় বিপ্লবের পর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় কাঠামো যে একটা বিশিষ্ট গণতান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহ করে, তাহাই নানা প্রকার সংশোধনীর ভিতর দিয়া চলিয়া আজ পর্য্যন্তও বজায় আছে সত্য, কিন্তু তাহার কল্যাণে ফরাসী জাতি কতখানি উন্নততর, সত্ত্বা-গ্রথিত-অবস্থিতিতে কতখানি দৃঢ়তর হইতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে অনুধাবনের বিষয় বটে।

আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে অ 'দের রাষ্ট্রগঠন সম্ভবপর নহে ; ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে রাষ্ট্রধর্ম্মের বিরোধিরূপে প্রতীয় .ন মহাত্মাজীর অহিংসা-তত্ত্বের প্রবেশ যেরূপ বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই, সেইরূপ বর্ত্তমান যুগসন্ধিকে

* পূর্ব্ব প্রবন্ধের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

অতিক্রম করিয়া কালপটে যে নব যুগ অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, তাহার অভিবাদনায় ভারতবাসীর সংবৃদ্ধি-সাধন-বোধ-সঞ্জাত আত্মসংগঠন-পরিকল্পনা-মূলে ভারতে যে আদর্শ-রাষ্ট্র গঠন করিয়া তোলা যাইতে পারে, তৎরাষ্ট্র-গঠন-প্রয়াসে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলে তাহাও বাধা প্রাপ্ত হইবে না। আমরা যদি প্রচার করি যে,—উচ্চ, ঊর্দ্ধ বা শ্রেষ্ঠের প্রতি আনুগত্য হইতেই ভাবপ্রবণ কর্ম্মিবৃন্দ দেশে দেশে রাষ্ট্র গঠন করিয়াছেন এবং সেই উচ্চ, ঊর্দ্ধ বা শ্রেষ্ঠ সংবৃদ্ধিমূলে আপনারই অঙ্গে যত অধিক আরোহণ-ধর্ম্মী হইবেন, তাঁহাতেই অনুরক্ত জনগণ তত অধিক দক্ষতা লাভ করিয়া প্রাণবন্ত কর্ম্মিরূপে রাষ্ট্র গঠনের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতা তত অধিক পরিমাণে সম্পাদিত করিতে পারিবেন, তবে কংগ্রেসের অখণ্ড কর্ম্মধারার ছেদ-প্রাপ্তি-কাল হইতে ২০ বৎসর ব্যাপিয়া মৌলিক চিন্তার অভিমুখীনতায় ভারতে যে অহিংস আন্দোলন পরিচালনা করা হইতেছে, সেই আন্দোলনের বলিষ্ঠতাই সম্পাদন করা হয় বলিয়া মনে করি।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে সেবাকে পণ্য-হিসাবে গণনা করিয়া তাহারই মূল্যে ভারতের আপামর জনসাধারণের উন্নতি-বিধায়ক একটি পরিপোষণ-যন্ত্র গঠন এবং বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সুসংস্কৃত প্রতিরূপের সহিত তাহার একীভূত হইয়া যাওয়া সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছি, তৎসম্পর্কিত আলোচনায় প্রবেশ না করিয়া—ভারতের আকাশে বাতাসে যে অহিংসার বাণী প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাহাই অহিংসার প্রকৃত সত্তার প্রকাশমানতাকে সম্ভব করিয়া তুলিবে, ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করতঃ—যে যন্ত্রধারায় বর্ত্তমানে সেই অহিংসার বাণী কার্য্য করিতেছে, তাহারই ঊর্দ্ধতন পরিষদ কংগ্রেস-ক্যাবিনেটকে (shadow cabinet of independent India—Subhash Chandra Bose) ভারতের আদর্শ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ক্যাবিনেটের প্রতিবিম্ব-স্বরূপে মনন করিতে ইচ্ছা করি, এরূপ লিখিতেছি বটে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে তদনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃজনশীলতা দেখিবারই অভিলাষ অন্তরে পোষণ করিতেছি।

(৩)

সাম্প্রদায়িক সমস্যা ভারতের জাতীয় জীবনের এক দুরপনেয় কলঙ্কসম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কংগ্রেস-লীগ-কনফারেন্স, অল-পার্টিজ-কনফারেন্স (১৯২৮ খৃঃ) এবং তত্তুল্য আরও কমিটি কনফারেন্সের পরেও যে সমস্যা লণ্ডনের দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক (১৯৩১ খৃঃ) পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়াছিল, যেথায় মহাত্মা গান্ধী সম্মিলিত দাবী লাভের আশায় স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন-প্রথায় বাংলা ও পাঞ্জাবের আইন পরিষদে মোসলমানদিগকে শতকরা ৫১টি 'সিট' দিবার অঙ্গীকার করিয়াও বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, "আমি আপ্রাণ চেষ্টায়ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসায় অকৃতকার্য্য হইয়া আত্মমর্য্যাদায় অবনমিত হইলাম"—সেই সমস্যার মীমাংসা যে প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সাধন করিবার চেষ্টা করা হইতেছে, তৎদৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন সাধন না হইলে তাহা সফল হইবে না বলিয়াই আমাদের ধারণা। ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে যে সাম্প্রদায়িক-নির্ব্বাচন-প্রথা বিরাজমান, তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মর্লি-মিণ্টো-রিফর্মে সর্ব্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক-নির্ব্বাচন-প্রথা অতি সংক্ষিপ্ত আকারে স্থান লাভ করে। তৎকালে কোন কোনও নেতা এই সাম্প্রদায়িক-নির্ব্বাচন-প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন (তন্মধ্যে সৈয়দ হাসান ইমামের নাম উল্লেখ-যোগ্য)। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে অম্বিকাচরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে বাৎসরিক অধিবেশন হয়, হিন্দু-মোসলমানের সম্মিলিত দাবী রচনাকল্পে সেই অধিবেশনে সরকারী ব্যবস্থা অপেক্ষা বিস্তৃততরভাবে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন-অধিকার একটি প্যাক্ট-মূলে মানিয়া লওয়া হয়, যাহা লক্ষ্ণৌ-প্যাক্ট নামে ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। লক্ষ্ণৌ-প্যাক্ট দ্বারা ভারতের গণদেহে যে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করা হয়, তাহা বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসানের পর সেঁভর সন্ধিতে (১৯২০ খৃঃ) তুরস্কের অমর্য্যাদা হইতে উদ্ভূত

খেলাফৎ-উদ্ধার-সঙ্কল্পে অধিকতর পুষ্ট হইয়া উঠে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড-রিফর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইলে তৎ-রিফর্ম্মকে (যাহা ডায়ার্কি বা দ্বৈতশাসন নামে পরিচিত হইয়াছিল) কাউন্সিলের অভ্যন্তর হইতে ধ্বংস করিবার পরিকল্পনা-মূলে বাংলা দেশে আর একটি প্যাক্ট রচিত হয়, যাহা বেঙ্গল-হিন্দু-মোস্‌লেম-প্যাক্ট নামে পরিচিত। এই প্যাক্ট মোসলমান সম্প্রদায়ের প্রচলিত নির্ব্বাচনমূলক দাবীকে অধিকতর সম্প্রসারিত করতঃ যোগ্যতার মাপকাঠির মর্য্যাদার বিলোপ সাধন করিয়া সরকারী চাকুরীতে শতকরা ৫৫টি হারে না পৌছান পর্য্যন্ত মোসলমানদিগকে শতকরা ৮০টি হারে চাকুরীর অংশ প্রদান করিবার নির্দ্দেশ দান করে। পরবর্ত্তী কালে এই প্যাক্ট কংগ্রেসের কোকনদ-অধিবেশনে চরম সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থিত করা হয়। ভারতে সাইমন কমিশন আগমন করিলে কংগ্রেস কর্ত্তৃক তাহা বর্জ্জিত হয় বটে, কিন্তু মোসলেম লীগ তৎপ্রতি সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ করিয়া বিভিন্ন কালে রচিত বিভিন্ন প্যাক্টসমূহের সারাংশ-মূলে মোসলেম-ভারতের চৌদ্দ দফা দাবী রচনা করতঃ সেই কমিশনে তাহা দাখিল করেন। সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধির এই ক্রমিকতাতেই আমাদের অভিলব্ধি হয়, ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেবের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা (১৯৩২, সেপ্টেম্বর), যাহা ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন-আইনে সংগ্রথিত। ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী রাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড তাঁহার বাঁটোয়ারায় ভারতের হিন্দু-শ্রেণী-বিশেষকে কাউন্সিলের যে আসন-সংখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পুনা-প্যাক্ট দ্বারা দ্বিগুণেরও অধিক বৰ্দ্ধিত হয় এবং যুক্তনির্ব্বাচন প্রথায় 'প্যানেল' আরোপিত হইলেও স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন-প্রথা নামমাত্রেই বদল হয়। তৎপর কংগ্রেস কর্ত্তৃক এই বহু-নিন্দিত বাঁটোয়ারা সম্পর্কে "না গ্রহণ না বর্জ্জন" সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে অ-কংগ্রেসিগণ তাহার বাদ-প্রতিবাদে ভারতের রাজনৈতিক গগণ মুখরিত করিয়া তোলেন। বিগত আগষ্ট মাসে (১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ) কলিকাতায় যে বাটোয়ারা-বিরোধী সম্মিলনের অধিবেশন হয়, তাহাতেও তৎ-প্রতিবাদ-মুখরতা প্রচুর পরিমাণেই পরিদৃষ্ট হইয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার উৎপত্তি, বিস্তার ও স্থিতিমূলে ইহাই তাহার

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এক্ষণে এই সমস্যার প্রতিকারোপায় সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে আত্ম-সংগঠন পরিকল্পনার যে ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছি, যাহাকে আমরা দেশের স্থান-বিশেষ অর্থাৎ জিলা-বিশেষের অধিবাসিগণের সর্ব্বদিক্-প্রসারী সমুন্নতি সাধনের যন্ত্রে মূর্ত্ত করতঃ ক্রমবর্দ্ধিত আয়তন প্রদান করিয়া একদা নিখিল ভারতীয়রূপে রূপান্তরিত করিয়া তুলিতে পারি, তাহা কাল-পরিক্রমায় প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সুসংস্কৃত প্রতিরূপের সহিত একীভূত হউক বা না হউক, স্বতন্ত্র সত্তায় যদি তাহা বাস্তবীকৃত হয়ই, তবে সেই যন্ত্রের সেবকগণ প্রচলিত সকল সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে আরোহণ করিয়া যে এক বিশেষ অসাম্প্রদায়িকতায় অলঙ্কৃত হইবেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কেননা—মানব-জীবন-পরিচালনা মূলে সংবৃদ্ধি সাধনের যে তত্ত্ব নিহিত, তাহাতে একনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন থাকিলে হিন্দু-মোসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টানের মধ্যে অর্থাৎ মানুষে মানুষে বাহ্য-ভেদ-চিহ্ন প্রকটিত হইতে পারে না। আমাদের সমষ্টিবদ্ধ জীবন-চলনার সুনিয়ন্ত্রণ ও উদ্বর্দ্ধন-মূলে যে আদর্শ পরিপোষণ-যন্ত্র গঠন করিয়া তোলা যাইতে পারে, তাহার ভবিষ্যৎ সুমনোহরতায় আমরা মোটেই সমাহিত নহি। বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসাকল্পে তৎযন্ত্র-গঠনকারী সংগঠনী-বুদ্ধি হইতে আমরা কি আলোক লাভ করিতে পারি, তাহার আলোচনার সুবিধার জন্যই আমাদের ঐ প্রসঙ্গের অবতারণা। কার্য্যকারণ-ফল এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থায় গমন করে যে প্রাকৃতিক নিয়মে, তৎ নিয়মানুসারে বিচার করিলে বর্ত্তমানকেই ভবিষ্যতের প্রসূতি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হয় না কি ? অবস্থা যদি তাহাই হয় অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িকতা-মূলে আমাদের সত্যকারের উদ্বর্দ্ধন প্রদান করিবার শক্তি লইয়া ভবিষ্যতে যাহা রূপ পরিগ্রহ করিবে, তাহার বোধের উৎস যদি বর্ত্তমানের পটেই নিহিত থাকে, তবে সবিস্তার বর্ণনায় না যাইয়া সংক্ষেপে ইহাই বলিতেছি যে, সেই উৎসকে কেন্দ্র করিয়া সংবৃদ্ধি সাধনের জ্ঞান-কৌশল বিতরণ-মূলে দেশের সাম্প্রদায়িক

মনোভাবাপন্ন আবহাওয়াকে অনতিবিলম্বেই দূর করিয়া দেওয়ার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা যাইতে পারে।

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন অধিকারের ভিত্তিতে আইন-পরিষদাদিতে প্রবেশ করিয়া জনসাধারণকে সেবা দান করা যদি সেবার নোংরামি বলিয়াই অবধারিত হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে আমাদের মস্তিষ্ক-কোষ হইতে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের বিরোধমূলক স্বাতন্ত্র্য-গ্রন্থিকে অপসারিত করার যে অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা আছে, তৎসম্পর্কে ভারতের চিন্তাশীল জননায়কগণ সচেতন নহেন—তাহা আমরা বলিতে চাই না। যুক্ত-নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে আসন-সংরক্ষণ দ্বারা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার বিধি-ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে প্রবর্ত্তিত হইলেই ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা চিরকালের তরে মীমাংসিত হইয়া যাইবে, অর্থাৎ চুক্তিপ্রবণ মন লইয়া সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে "দৃশ্যমান ঐক্য" সংস্থাপিত করিতে সক্ষম হইলেই ভারতে সুবর্ণযুগ ফিরিয়া আসিবে —বর্ত্তমান সত্য ও অহিংসার আন্দোলনের যুগে ভারতের চিন্তাশীল জননায়কগণ ঐরূপই চিন্তা করিয়া থাকেন, তাহাও আমরা বলিতে চাই না। ইহা স্বীকার করিতেছি যে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে আন্তরিক মিলন ঘটাইবার যে কৃচ্ছ্রসাধ্য প্রয়াস আমরা কংগ্রেস-পরিবেষ্টনীতে কয়েকবার শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়াছি, তাহা একমাত্র পুণ্যময় ভারতভূমিতেই সম্ভব; কিন্তু ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত মিলন ঘটাইতে হইলে তাহাদের অস্তিত্ব ও সংবৃদ্ধিতে দৃষ্টি নিয়োগ করিবার মৌলিক ব্যবস্থা অবলম্বন ব্যতীত, তদুদ্দেশ্যে যত কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতই পালিত হউক না কেন, তাহা দেশবাসীর অন্তরে বেদনার সৃষ্টি ব্যতীত আসল উদ্দেশ্যে সুফলপ্রসূ হইবে না—এই উক্তি প্রকাশ না করিয়া আমরা আর কোন উপায়ান্তর দেখিতেছি না।

(৪)

ইউরোপে পুনরায় ব্যাপক যুদ্ধ বাঁধিয়াছে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শা জুন তারিখে সেরাজেভো নগরে সার্ভিয়ার প্রজা

কর্ত্তৃক অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্ক ডিউক ফ্রান্সিস্ ফার্ডিনাণ্ড নিহত হইলে ইউরোপে যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয়, তাহার আইন মাফিক সর্ব্বাঙ্গীন পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর তারিখে। যুদ্ধের প্রান্তভাগে (১৯১৭, জানুয়ারী) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন্ বিজিত-বিজেতার বিভেদশূন্যতায় রণ-সমাপ্তির প্রয়াস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। ত্রিয়ানন (১৯২০, জুন), নিউয়ি (১৯১৯, নবেম্বর), সেঁভর (১৯২০, আগষ্ট—পরবর্ত্তীকালে লোজান) এবং ভার্সাইএ (১৯১৯, জুন) জার্ম্মানপক্ষীয়দের সহিত মিত্রপক্ষগণের যে সন্ধিপত্র রচিত হয়, তন্মধ্যে ভার্সাইএর সন্ধিপত্রই পরবর্ত্তীকালে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। প্রেসিডেণ্ট উইলসন্ ইউরোপীয় ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে প্রশান্ত রাখিবার মনোভাব লইয়া উভয়পক্ষের সন্ধিমূলে যে চতুর্দ্দশ প্রস্তাব রচনা করিয়াছিলেন, ভার্সাইএর সন্ধিপত্র তাহারই নির্দ্দোষ সম্প্রসারণ বলিয়া মিত্রপক্ষগণ দাবী করিলেও জার্ম্মানী যদি সেই দাবী অস্বীকার করে অর্থাৎ ভার্সাই সন্ধিপত্রই বর্ত্তমান যুদ্ধের হেতু—জার্ম্মানী যদি এইরূপই বলে, তবে প্রকৃত হেতু খুঁজিবার জন্য তাহার অন্তর্বর্ত্তী ও পশ্চাদ্বর্ত্তী ঘটনাবলীতে প্রবেশ করিবার আবশ্যক হয়; কিন্তু তাহা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে পররাজ্য-আক্রমণ-নাটকের প্রথমাভিনয় আরম্ভ হয়—১৯২৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, যখন জাপান চীন-সাম্রাজ্য হইতে মাঞ্চুরিয়া কাড়িয়া লয়। তারপর ইটালীর ইথিওপিয়া অভিযান (১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ), জার্ম্মানীর রাইনল্যাণ্ড অধিকার (১৯৩৬, মার্চ্চ), জেনারেল ফ্রাঙ্কো কর্ত্তৃক স্পেন আক্রমণ (১৯৩৬, জুলাই), জার্ম্মানীর অষ্ট্রিয়া (১৯৩৭ খৃঃ) এবং চেকরাজ্য দখল (১৯৩৮ খৃঃ), ইটালীর আলবানিয়া গ্রাস ইত্যাদি একের পর এক অভিনীত হইবার পর 'এণ্টিকমিণ্টার্ণ ব্লকের' সমাধি-সৌধ-মূলে রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণ-চুক্তি (১৯৩৯, ২৪শা আগষ্ট) সম্পাদন করিয়া জার্ম্মানী পোলাণ্ড আক্রমণ করে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে, এবং পোলাণ্ডের স্বাধীনতা

রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সম্মিলিতভাবে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে পরবর্ত্তী ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে।

এক্ষণে আমাদের প্রশ্ন এই যে,—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সুখ, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ, একের সহিত অপর দেশের উদ্বর্দ্ধনমূলক পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রতি দেশের প্রতি মানবের বাঁচাবাড়ার সতেজ প্রবাহ কোন্ পথে আসিবে ? দেশে দেশে যুদ্ধ নিবারিত হইবে কি প্রকারে ?

ভারতবর্ষের দিক হইতেই প্রথমে আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতাকে আমরা পৃথিবীর অখণ্ড মানব-জাতির হিতবোধ-প্রসারের পক্ষে একটা বড় রকমের বিঘ্ন বলিয়া মনে করি। বিগত ৩১শে অক্টোবর (১৯৩৯ খৃঃ) তারিখে সোভিয়েট সুপ্রীম কাউন্সিলের পররাষ্ট্র সচিব মঁসিয়ে মলোটোভ ক্রেমলিনে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মিঃ রুজভেল্টের কার্য্য-বিশেষের সমালোচনা প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাশিয়া ফিনল্যাণ্ডকে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ফিলিপাইন আজও স্বাধীনতা লাভে সক্ষম হয় নাই। এই কথার উল্লেখে আমরা বলিতে চাই ইহাই যে, ফিলিপাইনের পরাধীনতায় দেশ-বিশেষের কেহ যদি ভাল-না-লাগা-জনিত চিত্তসঙ্কোচন বোধ করেন, তবে পৃথিবীর সমষ্টি দেশের উৎকৃষ্ট মনুষ্যগণের মলয়ানিলসুখবোধবৎ ভাল-লাগা-জনিত চিত্তপ্রসারণমূলক হিতবোধ-উদ্বোধনার পক্ষে সহস্র ফিলিপাইনরূপ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা কত বড় বিঘ্ন, তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লইবার বিষয়। জগতের উৎকর্ষপরায়ণ মনুষ্যগণ যদি ইহাই বলেন যে, আমরাই আমাদের পরাধীনতা সৃষ্টি করিয়া এবং বজায় রাখিয়া জগতের লোভপরায়ণতাকে দমিত হইতে দিতেছি না, তবে বলিতেই হইবে যে, যে মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বিগত মহাযুদ্ধে বেলজিয়ামের স্বাধীনতা রক্ষায় সংলিপ্ত হইয়াছিলেন, এবং বর্ত্তমান যুদ্ধে পোলাণ্ডের স্বাধীনতা-রক্ষায় অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, আমরা তাহার সেই মহৎ উদ্দেশ্যকে একেবারেই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছি এবং দিতেছি।

ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার কয়েকখানি শক্তিশালী সংবাদপত্র ও সংবাদ-সরবরাহকারী-প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বজন-শ্রদ্ধেয় নেতা মহাত্মা গান্ধী এই বলিয়া যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন—"যুদ্ধ কালে আমরা ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন চাহি না, ভারতবর্ষের স্বাধীনতাও বৃটেনের যুদ্ধমূলক উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হউক এবং যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শ অনুসারে নিজেদের শাসনতন্ত্র রচনা করিবে"—এবং যে বিবৃতি নিউইয়র্ক, প্যারিস, মস্কো, রোম, লণ্ডন, জেনেভা, টোকিও প্রভৃতি জগতের প্রধান প্রধান নগরের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, গোটা ভারতবর্ষকে সমস্ত দেশের দৃষ্টিতে তুলিয়া ধরিবার দিক হইতে তাহার একটা গৌন ফল আছে, ইহা স্বীকার করিয়াও আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে ভারতের আদর্শ রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়িয়া তোলার মূলে আত্মগঠন-পরিকল্পনার যে ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছি, এই প্রবন্ধেও সেই ইঙ্গিত প্রদান করিয়া ইহা লিখিতেছি যে, যে পথে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে, যথার্থ স্বাধীনতা লাভের পক্ষে সেই পথ প্রকৃত পথ নহে।

এক্ষণে আমরা মূল প্রশ্নে প্রত্যাগমন করিতেছি।

অখণ্ড মানব-জাতিকে যদি একই পরিবারভুক্ত জনমণ্ডলী বলিয়া গণনা করা যায় এবং নেভিল চেম্বারলেন, দালাদিয়ার, রুজভেল্ট, ষ্টালিন, হিট্‌লার, মুসোলিনী ও মহাত্মা গান্ধীকে যদি সেই পরিবারের কর্ত্তৃপক্ষীয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে আমরা বলিবই যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক উদ্বর্দ্ধনমূলক সেবা-সহযোগিতার উপর অখণ্ড মানব-জাতির সুখ, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের অভ্যাগম হইতে পারে, দেশে দেশে যুদ্ধ নিবারিত হওয়ার সম্ভাবনার উদয় হইতে পারে—আমাদের যে বোধবৃত্তির পরিস্ফুরণে, তৎসম্পর্কে আমাদের ভিতরে যে ভাবধারা ক্রিয়াশীল, মহাত্মা গান্ধীর প্রসুপ্ত সংস্কারের সহিত সেই ভাবধারার সমজাতীয়তায় সবিশেষ নৈকট্য বিদ্যমান আছে। এই নৈকট্যের মূল্য যথানুপাতিকভাবে স্বীকার

ক্রমতঃ ইহা লিখিতেছি যে, আমরা অখণ্ড মানব-জাতি আপাত-বোধ-বিরোধিতা লইয়াও যে এক অস্তিত্বের পটভূমিকায় অবস্থিতি করিতেছি, তাহা হইতে যদি আমরা আপন আপন সংবৃদ্ধি-মূলে ক্রমোর্দ্ধগমনপরায়ণ হইয়া চলিতে আরম্ভ করি, তবে আমাদের জীবন-পরিচালনার অঙ্গীভূত অনন্ত বৈচিত্র্যের ভিতরেও আমাদের গমনীয় লক্ষ্য এক বলিয়াই পরিদৃষ্ট হইবে। এই মৌলিক একত্বই যদি আমাদের অস্তিত্ব, জীবন, গতি ও সংবৃদ্ধির একমাত্র নিয়ন্তা হয়, তবে তাহাতে আসক্তি অবলম্বন না-করা ব্যতীত, দেশের প্রতি দেশের—জাতির প্রতি জাতির অসমবোধমূলক মনোভাবকে দূর করিবার—প্রতি ব্যষ্টি মানবের অঙ্গে বাঁচাবাড়ার সতেজ প্রবাহ উজ্জীবিত করিবার—পৃথিবী হইতে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে সঙ্কুচিত করিবার আর কোন প্রকৃষ্ট পন্থা নাই, ইহাই আমাদের ধারণা।

নব্য ভারতের স্রষ্টাবৃন্দ

(১)

রাজা রামমোহন রায় :—অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ প্রগতি-বিরোধিতার সুগভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। সেই অন্ধকারের গর্ভ হইতে যিনি প্রগতির জ্ঞান-প্রদীপ হস্তে লইয়া প্রাতঃসূর্য্যসম বঙ্গ-জননীর কোলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি নব্য ভারতের আদি স্রষ্টা—রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে হুগলি জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

রাজা রামমোহনের সুপবিত্র ও সুকঠোর সংগ্রাম-পরিপূর্ণ জীবনকে যদি মোটামোটি চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—সমাজসংস্কারক রামমোহন, শিক্ষাপ্রচারক রামমোহন, রাজনীতিবিদ্ রামমোহন এবং ধর্ম্মবেত্তা রামমোহন, তবে তাঁহার জীবনের চারিটি অধ্যায় হইতেই যে কল্যাণ-ধারা নিঃসারিত হইয়াছে, আমরা দেখিতে পাই, তাহারই ক্রমিক-সূত্রে আজিকার আমাদের সর্ব্বদিক্-প্রসারী যাহা-কিছু সংস্কারান্দোলন-জনিত যাহা-কিছু উন্নয়ন ও পরিপুষ্টি।

তৎকালীন হিন্দুসমাজ-দেহে যাহা প্রেত বিভীষিকা লইয়া বিচরণ করিত, তাহা ছিল সতীদাহ-প্রথা। রামমোহনের অন্তরঙ্গ বন্ধু অ্যাডাম সাহেব লণ্ডনে এক বক্তৃতায় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, "১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ইংরাজের রাজ্য-শাসনের প্রতিষ্ঠা অবধি প্রতিদিন ভারতে পাঁচ ছয় শত অনাথা রমণীকে সতীদাহ-প্রথার যূপকাষ্ঠে হত্যা করা হয়।" লর্ড ওয়েলেস্‌লির শাসনকালের শেষপ্রান্তে (১৮০৫ খৃষ্টাব্দ) সরকার পক্ষ হইতে নিজামত আদালতের বেতনভোগী পণ্ডিতের নিকট সতীদাহের শাস্ত্রীয় যুক্তি-যুক্ততা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্ম্মা লিখিয়াছিলেন, "মানবদেহে সার্দ্ধত্রিকোটী লোম আছে। যাহারা সহমৃতা হন, তাহারা তৎসংখ্যক বৎসর অর্থাৎ সাড়ে তিন কোটী বৎসর স্বামীর সহিত স্বর্গে বাস করেন।" রামমোহনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহনের স্ত্রী সহমৃতা হইয়াছিলেন। রামমোহন তাঁহাকে কোন প্রকারেই সহমরণ হইতে নিবারিত

করিতে না পারিয়া এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন যে, সমাজ হইতে সতীদাহের প্রেতনর্ত্তন বিদূরিত করিতেই হইবে। রাজা রামমোহন ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় পুস্তকাদি প্রকাশ করতঃ সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনপরায়ণ থাকিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে বুঝাইতেন যে, সেই প্রথার সমূল-বিনাশ আবশ্যক এবং শাসকবর্গকে বুঝাইতেন যে, সতীদাহ-প্রথা শাস্ত্রসম্মত নহে। পরিশেষে রাজা রামমোহন রায়ের অবিরাম প্রচারকার্য্যই জয়শোভিত হইল। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে এক রাজকীয় বিধিপ্রচার করিয়া এই মহা ভয়ঙ্কর প্রথা ভারতীয় সমাজদেহ হইতে দূরীভূত করেন। আজিকার যে সমাজ-সংস্কার-আন্দোলন নানা বিভঙ্গে রাষ্ট্রীয় আইন-শালার ভিতরে ও বাহিরে পরিচালিত করা হইতেছে, রাজা রামমোহন কি তাহার পথপ্রদর্শক ছিলেন না ?

রামমোহন বাংলা দেশে অবলুপ্ত বেদবেদান্ত-চর্চ্চার আদি প্রবর্ত্তক। তিনিই সর্ব্বপ্রথম মূল সংস্কৃত বেদান্ত দর্শন এদেশে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকগণ বেদবেদান্ত, ন্যায়দর্শন ও পুরাণতন্ত্রের বিরুদ্ধ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে তাহার উত্তর প্রদান করিবার জন্য রামমোহন স্বয়ং-স্থাপিত ইউনিটারিয়ান প্রেস হইতে 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই কার্য্য সাধনে তিনি ভারতীয়গণের মধ্যে আধুনিক মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম সংস্থাপক বলিয়াও গৌরব লাভ করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে প্রকাশিত 'সংবাদ কৌমুদী' ও 'মিরাট-আল্-আকবর' নামক পত্রিকাদ্বয়ে রামমোহন যুগোপযোগী ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতির আলোচনা প্রকাশ করিতেন এবং বৈদেশিক সংবাদাদি প্রকাশ করতঃ দেশবাসীদের দৃষ্টি ভারতের বাহিরেও প্রসারিত করিবার প্রয়াস করিতেন। তাঁহার কালে শাসকবর্গের মধ্যে এই একটি বিতর্ক চলিতেছিল যে, এদেশবাসীদের পক্ষে ইংরাজী ভাষার প্রসার কল্যাণজনক হইবে,—না সংস্কৃত বা পার্শী ? রাজা রামমোহন ইংরাজী ভাষার ভিতর দিয়া এদেশে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়া ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড আমহার্ষ্টকে যে

পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা ভাষার গুরুগাম্ভীর্য্যে ও যুক্তিগুণে ঐতিহাসিক পর্য্যায়ে স্থান লাভ করিয়াছে। দ্বাদশ বৎসর বিতর্ক চলিবার পর অবশেষে রামমোহনের অভিমতই শাসকবর্গের নিকট প্রাধান্য বিস্তার করিল। ইংরাজী ভাষা বিস্তারের আনুকূল্যে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এক রাজকীয় ঘোষণা প্রকাশ করিলেন। এইরূপে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের কার্য্যফলে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সূত্রপাত হইল। মহামতি ডেভিড হেয়ার, স্যার এডোয়ার্ড হাউড ইষ্ট এবং রামমোহন রায়—এই ত্রয়ের সংযোগ-সূত্রতা হইতে কলিকাতা-বক্ষে হিন্দুকলেজের অভ্যুত্থান সংঘটিত হইল (১৮১৭ খৃঃ)। রাজার নিজস্ব একটি ইংরাজী বিদ্যালয়ও ছিল। পরবর্ত্তীকালে যাঁহারা বাংলাদেশে বিশিষ্ট সামাজিক মর্য্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই রাজার স্কুলের ছাত্র ছিলেন। শিক্ষাব্রতী রামমোহনের শিক্ষাপ্রচার ও শিক্ষা-সংস্কার পরবর্ত্তীকালে আমাদিগকে কি প্রেরণা দান করিয়াছে? আধুনিক সুমার্জ্জিত ও কলানৈপুণ্যপূর্ণ বাংলা ভাষার ক্রম-প্রগতিপরায়ণতার মূলে রামমোহন কি অধিষ্ঠিত নহেন? ভারতভূমিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রম-প্রকাশের ফলে আধুনিক ভারতের আধুনিক জ্ঞানিগুণিজনের যে কর্ম্মগৌরবে আমরা গৌরব বোধ করি, তাহার মূলে রামমোহনের অবদান কি সংস্থাপিত নহে ?

১৮২১ খৃষ্টাব্দে স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী পরিগৃহীত হইলে রামমোহন এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, তিনি নিজ ব্যয়ে কলিকাতা টাউন-হলে এক প্রকাশ্য ভোজ প্রদান করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগাল দেশেও তৎব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তৎকালে ইংলণ্ডীয় আইন অনুসারে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বিগণ পার্লামেণ্টের সদস্য-পদ লাভ করিতে পারিতেন না। পরবর্ত্তীকালে এই আইন প্রত্যাহৃত হওয়ায় তাঁহার আনন্দের পরিসীমা ছিল না। ইংলণ্ডে অবস্থিতি কালে পার্লামেণ্টে রিফর্ম্ম বিল গৃহীত হওয়ার পক্ষে তিনি স্বয়ং আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

১৮৩১—৩২ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর নূতন সনন্দ গ্রহণোপলক্ষে ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রগত সংস্কারের জন্য পার্লামেণ্ট হইতে যে কমিটি নিযুক্ত হয়, রাজা রামমোহন সেই কমিটিতে সাক্ষ্য দিতে অনুরুদ্ধ হইয়া এদেশীয় গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব-বিভাগ, বিচার-বিভাগ ও সাধারণ লোকের অবস্থা সম্বন্ধে যথাযথ বক্তব্য উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রপ্রতিকূলতার জন্য ভারতের তথাকথিত রাজনীতিতে তাঁহাকে ইংলণ্ডের বার্ক বা পিটের ন্যায় সমুত্থিত হইতে না দেখিলেও বে-সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে তদানীন্তন রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রজার অনুকূল কার্য্যপ্রবাহের পক্ষে তিনি যে বিপুল সহায়কারী ছিলেন, তাহারই অনুসরণ পরবর্ত্তীকালের নেতৃগণ-বিশেষের ভিতর কি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে নাই ?

রাজা রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া খ্যাত। কিন্তু ইহাই তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশক নহে। তাঁহার উদার, প্রশস্ত হৃদয় সদা সত্য আহরণপিপাসু ছিল। নানক, কবীর প্রভৃতি একেশ্বরবাদী সন্তপন্থীদিগের সহিত তাঁহার অনেকাংশে মতৈক্য ছিল। ভারতবর্ষের আধুনিক শিক্ষিত সমাজে একেশ্বরবাদের প্রতি যে একটা স্বতঃশ্রদ্ধার ভাব উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার বিষয় নহে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাব দ্বারা যদি জনসাধারণের মনোভাবের মূল্য বিচার করা চলে, তবে ইহা বলিতে হয় যে, আধুনিক ভারতের ধর্ম্মবোধ গঠনের মূলেও রাজা রামমোহন রায়ের অবদান দেদীপ্যমান। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে লিভারপুল হইতে লণ্ডনে গমন কালে যিনি রেলওয়ের উভয় পার্শ্বে ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য, সভ্যতা ও সংগঠন শক্তির নিদর্শনের পরিচয় লাভ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন, "চতুর্দ্দিকে সুন্দর হর্ম্ম্যরাজি, পুষ্পোদ্যান সমন্বিত কুটীররাজি, অশেষ হিতকারী কৃত্রিম নদী ও মনোহর সেতু সকল সন্দর্শন করিয়া যিনি ইংলণ্ডবাসীদের পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও বিজ্ঞানের জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা দর্শনে" পুলকিত এবং তদবস্থার সহিত তাঁহার স্বদেশের অবস্থার তুলনায় দুঃখিত হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের বহু অগ্রগামী পটভূমিকার জননায়ক ছিলেন বটে, কিন্তু অর্থ-ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, কর্ম্ম-

শক্তি ও সংগঠন-শক্তি যথার্থতঃ বিকাশ লাভ করে যে নীতির কল্যাণে, বলিতে হইবে যে, তিনি সেই নীতিরই একনিষ্ঠ পরিপোষক ছিলেন।

(২)

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ—১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চরিত্রে অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইতে থাকে। মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউটে প্রবেশ লাভ করিয়াই তিনি সহপাঠীদের যে নেতৃত্বকে বরণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সহজাত আত্মবৈশিষ্ট্য হইতেই সমুত্থিত। যে প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী, তাহা যখন অংশের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহা অংশ আনুপাতিক না হইয়া তাহার মৌলিকতাকেও কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশমান করিয়া তোলে। জ্ঞাতিবর্গের ষড়যন্ত্রে পতিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বতঃ সহযোগিতায় হাইকোর্টে মোকর্দ্দমা পরিচালনা কালে যে "উপস্থিত বুদ্ধি ও চরিত্রের দৃঢ়তা" প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যাহার ফলে হাইকোর্টের মাননীয় জজ কালক্রমে তিনি একজন প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ হইবেন বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মৌলিক প্রতিভার বিদ্যুৎ-স্ফূরণই বটে। সত্যানুসন্ধানে আত্মগতপ্রাণ নরেন্দ্রনাথের অন্তর্বিকাশের যে প্রবল রশ্মিচ্ছটা ক্রমিকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত সন্ন্যাসীত্বে অধিরূঢ় করাইয়াছিল, ভারতবাসীর সর্ব্বদিক্-প্রসারণ-মূলক উন্নয়ন, উর্দ্ধন— যুগোপযোগী সংস্কার ও পরিপুষ্টি বিধানের যে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত তাঁহাকে ভারতবর্ষের মুকুটবিহীন রাজপদগৌরবে সমাসীন করিয়াছিল, তাহা পরিমাপ করিবার বিষয় নহে।

রজনীতে চন্দ্রমার আত্মপ্রকাশের ন্যায় নরেন্দ্রনাথ চিকাগো ধর্ম্মসভায় আত্মপ্রকাশিত হইয়া নির্গলিত স্রোতস্বিনীর মত আপনাকে যে ভাবে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার বিবেকানন্দত্বের প্রতিষ্ঠা। চিকাগোতে

আশ্রয়দানকারিণী মার্কিন মহিলার গৃহে অধ্যাপক জে রাইট মহোদয়ের সহিত আলাপ হইলে নরেন্দ্রনাথ যখন তাঁহার নিকট চিকাগো-ধর্ম্ম-সভায় উপস্থিত হইবার জন্য পরিচয়-পত্র প্রার্থনা করিলেন, তখন অধ্যাপক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনার নিকট পরিচয়-পত্রের দাবী করা আর সূর্য্যের আলোকরশ্মি বিতরণের অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন করা একই কথা।"

দ্বিতীয় বার আমেরিকা গমন করিলে (১৯০০ খৃঃ) ওক্‌ল্যাণ্ডের ইউনিটারিয়ান চার্চ্চের সর্ব্ব-প্রধান ধর্ম্মযাজক ডাঃ বেঞ্জামিন কে মিল্‌স তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, "বিবেকানন্দ অতি অদ্ভুত প্রতিভাবিশিষ্ট পুরুষই বটেন, যাঁহার সহিত তুলনায় আমাদের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দকে একান্তই শিশু বলিয়া বোধ হয়।"

চিকাগো ধর্ম্মসভায় (১৮৯৩, ২৭শা সেপ্টেম্বর) বিবেকানন্দের এই যে বাণী "আজ হইতে সমস্ত ধর্ম্মের পতাকায় লিখিয়া দাও, যুদ্ধ নহে—সেবা। প্রত্যেক জাতি অন্য জাতির সহিত পারস্পরিক ভাবের বিনিময় করিবে, অথচ প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবে এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত শক্তির অনুপাতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে"—তাহার মূল্য বর্ত্তমান দ্বন্দ্ব-সংঘাত-পরিপূর্ণ মানব-সমাজের পক্ষে অমূল্যই বটে। পাশ্চাত্যবাসিগণ যাঁহাকে 'সাইক্লোনিক হিন্দু' আখ্যায় পরিশোভিত করিয়াছিলেন, সেই তিনিই বর্ত্তমান সভ্যতার সাইক্লোনিক রূপান্তর আনয়নকারী ভারতবর্ষের গৌরবময় ভবিষ্যতের সূচনায় বলিয়াছিলেন, "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষে।" আরও বলিয়াছিলেন, "দেখ্‌ছিস্ না পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য্য উঠ্‌বার আর বিলম্ব নেই।"

আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনান্তর বিবেকানন্দ রামনাদে বলিয়াছিলেন, "নানাবিধ মত-মতান্তরের বিভিন্ন সুরে ভারতগগন প্রতিধ্বনিত হইতেছে বটে, কোনও সুর ঠিক তালেমানে বাজিতেছে, কোনটি বেতালা বটে, কিন্তু বেশ বুঝা যাইতেছে, উহাদের মধ্যে যেন একটি সুর ভৈরব রাগে সপ্তমে উঠিয়া অপরগুলিকে আর শ্রুতিবিবরে পৌঁছিতে দিতেছে না।"

যে বেদান্ত শাস্ত্র দার্শনিক পণ্ডিতগণের "উর্ব্বর মস্তিষ্কের ব্যায়াম ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত"—তাহাকে যিনি সত্যরূপে উপলব্ধি করিয়া ঋষিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তিনিই বলিয়াছিলেন, "স্বদেশবাসীর দুঃখ, দৈন্য, অজ্ঞতা ঘুচাইবার চেষ্টা—রুগ্ন, আতুর, আর্ত্ত, অনাথকে ঔষধ, পথ্য ও আহার দান—ইহাই বর্ত্তমান যুগোপযোগী মুক্তির প্রশস্ত রাজপথ। যদি পর-কল্যাণ-কামনায় কর্ম্মে অগ্রসর হইয়া নরকেও যাইতে হয়, তাহাতেই বা কি আসে যায়? যাহারা নিজের ভক্তি-মুক্তি-কামনা ত্যাগ করিয়া দরিদ্রনারায়ণ সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবে, আমি তাহাদের ভৃত্য ও ক্রীতদাস।"

আপন অজর, অমর সত্তাকে উপলব্ধি করিয়া যিনি বলিয়াছিলেন,—"আমার ইচ্ছা প্রাচীন ভারতের যাহা-কিছু গৌরবময় তাহার সহিত বর্ত্তমান যুগের ভাল জিনিষগুলি স্বাভাবিকভাবে একত্রীভূত হইয়া নবীন ভারত গড়িয়া উঠুক; আর এই উন্নতিমূলক গঠন ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্ব প্রকারে বহিঃশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া হওয়াই বাঞ্ছনীয়"—তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন, "তীর্থ বা মন্দিরাদিতে গেলে, তিলক ধারণ করিলে অথবা বস্ত্র-বিশেষ পরিলেই ধর্ম্ম হয় না। তুমি গায়ে চিত্র বিচিত্র করিয়া চিতাবাঘটি সাজিয়া বসিয়া থাকিতে পার, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত তোমার সবই বৃথা।"

বিবেকানন্দ ভারতের প্রচলিত কুলগুরু-প্রথাকে অবৈদিক ও অশাস্ত্রীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে সমাগত খ্যাতনামা প্রতিনিধিবৃন্দের অনেকেই বেলুর মঠে বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণমানসে গমন করিতেন। তাঁহাদের সমাগমে বিবেকানন্দের অধিনায়কতায় মঠে ভারতবর্ষের প্রচলিত রাজনীতি সম্পর্কে যে আলোচনা-বৈঠকের অধিবেশন হইত, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে "কংগ্রেসের আকারই ধারণ করিত, এমন কি আদর্শের দিক দিয়া তদপেক্ষাও উন্নত ও হিতকর হইত।"

কঠোর বাস্তব সমস্তাকে আঙুলিয়া ধরিয়া উহাকে মীমাংসায় ভস্ত করিবার প্রয়াসই ভারতীয় সন্ন্যাসীর প্রকৃত চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। এই জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই এইরূপ বলিতেন যে, "দুই সহস্র বীর-হৃদয়, বিশ্বাসী, চরিত্রবান্ ও মেধাবী যুবক এবং ত্রিশ কোটী টাকা পাইলে আমি ভারতকে নিজের পায়ের উপর দাঁড় করাইয়া দিতে পারি।" তিনি বলিতেন, "মানুষ তৈয়ারী হয় যে ধর্ম্মে, আমি সেই ধর্ম্মই প্রচার করিতে চাই।"

স্বামী বিবেকানন্দ কোনও শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "এদেশে আগে জমি তৈরী করতে হবে। পাশ্চাত্যের মাটী খুব উর্ব্বরা। অন্নাভাবে ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, রোগ-শোক-পরিতাপের জন্মভূমি ভারতবর্ষে লেক্‌চার ফেক্‌চার দিয়ে কি হবে ?"

"মানুষের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিত করণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকায় উৎসাহ-বর্দ্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্ম্মভাব জনসমাজে প্রবর্ত্তন"—এই উদ্দেশ্য অবলম্বনে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যে রামকৃষ্ণমিশন প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাকে কর্ম্মী বিবেকানন্দের আত্মবিগলিত-প্রকাশের প্রতিরূপ বলিয়া গ্রহণ করিলে এই তত্ত্বই উদ্‌ঘাটিত হয় যে, ধর্ম্মের মূলে আছে কর্ম্ম ; কর্ম্মবিহীন ধর্ম্ম ও গোলাবিহীন কামান একই পর্য্যায়ভুক্ত।

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ভারতবর্ষে নবতর যুগসৃষ্টির গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা। রাজা রামমোহন রায় অবলুপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের রশ্মিচ্ছটা-বিকাশে ভারতবাসীর অন্তর-রাজ্য কর্ষণ করিয়া যে বীজ উপ্ত করিয়াছিলেন— মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি ক্ষণজন্মা পুরুষসিংহগণ কালোপযোগী পরিপোষণ দানে যাহাকে অঙ্কুরিত করিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাহারই নবকিশলয়ের উদ্গমে অখণ্ড ভারতের জাতীয় জীবনের বলিষ্ঠতা-বিধানাকাঙ্ক্ষী নেতৃবর্গ ও সাধারণ জনমণ্ডলীকে ভারতবর্ষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে আকর্ষিত করিতে

সক্ষম হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহনের পরলোকগমন (১৮৩০ খৃঃ) হইতে বিবেকানন্দের কর্ম্ম-জীবনের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত নব-ভারত-সৃজনে যাঁহারা যে আলোক নির্গলিত করিয়া ভারতবাসীর সমষ্টি-মনকে স্বচ্ছতর বিকাশে চেতনোদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন, তাহারই রশ্মিঘনময়তায় বিবেকানন্দ-প্রতিভার সহস্র ধারায় বিকীরণ। স্বামী বিবেকানন্দ নব্য ভারতের দ্বিতীয় স্রষ্টা-পদবীতে সমালঙ্কৃত।

(৩)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :—১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বাংলার সুবিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। যে ব্যক্তিত্ব ব্রহ্মবোধি আয়ত্ত-করণে প্রয়াসপুষ্ট হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান-পরিবেশনে সদা সচেতন থাকে, সেই ব্যক্তিত্বের স্ফুটনশীল বিকাশ রবীন্দ্রনাথের বাল্য জীবনেই প্রকটিত হইয়াছিল। রবীন্দ্র-নাথের পরবর্ত্তী জীবনে দেখা গিয়াছে, তিনি একান্ত নিরালায়, পরিবারের সংস্রব হইতে দূরে থাকিতেই ভালবাসেন। "কোন মানুষের ধারাবাহিক অবিচ্ছেদ্য অতি-ঘনিষ্ঠতা তাঁহার কাছে প্রিয় বস্তু নয়।" রবীন্দ্রনাথ নিজেও লিখিয়াছেন, "আমার সত্যিকার স্বভাবটা বোধ হয় নৈঃসঙ্গিক, সঙ্গের প্রভাব তাকে বল দেয় না, তাকে অলস করে। এই আলস্যের মন্থরতায় নিজের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, সে সমস্ত আচ্ছন্ন হয়ে যায়, আর তার থেকেই আসে ক্লান্তি। এ পর্য্যন্ত আমি যা-কিছু শক্তি পেয়েছি, যা-কিছু শিক্ষা পেয়েছি, সমস্তই একলা নিজের মধ্যে।" তাঁহার এই যে নৈঃসঙ্গিক ও একান্ত আত্মসচেতন-ভাব যাহা এক উচ্চতর লোকের প্রভাব-চেতনতায় উদ্দীপিত হইয়া নব নব পরিবেশ, নব নব পরিচয়, নব নব আয়োজনের লালসায় প্রগতিসম্পন্ন, তাহা তাঁহার ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারেরই প্রবল রশ্মি-বিকাশ।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ পিতার সহিত সর্ব্বপ্রথম হিমালয়-ভ্রমণে যাত্রা করেন। অমৃতসর হইতে হিমালয় যাত্রা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন, "যেখানে পাহাড়ের কোণে কোণে, পথের কোন বাঁকে পল্লব-

তারাচ্ছন্ন বনস্পতির দল নিবিড় ছায়া রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং ধ্যানরত বৃদ্ধ তপস্বীদের কোলের কাছে লীলাময়ী মুনিকন্যাদের মত দুই একটি ঝরণার ধারা সেই ছায়াতল দিয়া শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথরগুলির গা বাহিয়া ঘন-শীতল-অন্ধকারের নিভৃত নেপথ্য হইতে কুল কুল করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, সেখানে ঝাপানীরা ঝাপান নামাইয়া বিশ্রাম করিত। আমি লুব্ধভাবে মনে করিতাম, এ সমস্ত যায়গা আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে কেন ?” বার বৎসরের বালক রবীন্দ্রনাথের মস্তিষ্কে প্রাচীন তপোবনীয় যুগের স্মৃতির এই জাগরণ তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের ক্রমবিকাশের মূলে প্রচুর আলোক নিক্ষেপ করিয়াছে।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কলিকাতায়। ঐ অধিবেশনের উদ্বোধনে যুবক রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছিলেন,

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে !
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে !
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে,
আয় বলে ওই ডেকেছে কে !
সেই গভীর স্বরে উদাস করে
আর কে কারে ধরে রাখে !

* * *

কত দিনের সাধন ফলে
মিলেছি আজ দলে দলে
ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয় রে মা'কে।”

জ্বলন্ত ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারের উদ্দীপনায় রবীন্দ্রনাথ একান্ত আত্মসচেতন বলিয়া কংগ্রেসের ক্রমবাহিত কর্ম্মধারা তাঁহাকে বন্ধন করিয়া লইতে পারে নাই।

ংগ্রেসের যে উদ্দেশ্য, জন-সমষ্টিতে আত্মসম্বিতের উদ্বোধন—তাহার প্রতি বীন্দ্রনাথ সহানুভূতিশীল ছিলেন না বা এক্ষণেও নহেন, তাহা আমাদের লিবার উদ্দেশ্য নহে। আমরা বলিতে চাই ইহাই যে, সূর্য্যের কিরণ যেরূপ মষ্টিবদ্ধ জীবগণকে পরিপোষণ প্রদান করিয়া সতেজ বিকাশে বৃদ্ধি-মুখর করিয়া তোলে, রবীন্দ্র-সংস্কার সেইরূপ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল মানুষেরই আত্মবোধ-দ্দীপনাকে প্রখর করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়াসশীল।

রবীন্দ্রনাথ আপন আত্মসত্তাকে যে ভাবে রূপ দিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় চ্চ সংস্কার-বাহিত কবির পক্ষেই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

"আমি সেই এই মানবের লোকালয়ে
বাজিয়া উঠেছি সুখে দুখে লাজে ভয়ে,
গরজি' ছুটিয়া ধাই জয়ে পরাজয়ে
বিপুল ছন্দে উদার মন্দ্রে মাতিয়া।

যে গন্ধ কাঁপে ফুলের বুকের কাছে,
ভোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে,
শারদ ধান্যে যে আভা আভাসে নাচে
কিরণে কিরণে হসিত হিরণে হরিতে,

সেই গন্ধই গড়েছে আমার কায়া,
সে গান আমাতে রচিছে নূতন মায়া,
সে আভা আমার নয়নে ফেলেছে ছায়া,—
আমার মাঝারে আমারে কে পারে ধরিতে?"

সকল প্রকার বন্ধনের পরিবেষ্টনী হইতে বিমুক্ত থাকিয়া উদার আকাশের প্রান্তের মত সার্ব্বভৌম অস্তিত্বকে আলিঙ্গন করিয়া চলিবার স্বভাববিশিষ্ট সংস্কারে যিনি সমৃদ্ধ, তিনি আপন জীবন-দেবতাকে উপলক্ষ করিয়া গাহিয়াছেন,—

"আমার যা শ্রেষ্ঠ ধন
সে তো শুধু চমকে ঝলকে,
দেখা দেয় মিলায় পলকে
বলে না আপন নাম,
পথেরে শিহরিয়া দিয়া সুরে
চলে যায় চকিত নূপুরে।
সেথা পথ নাহি জানি,
সেথা নাহি যায় হাত,
নাহি যায় বাণী।"

রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় আপন অন্তরের যে সত্যকে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ব্রহ্মবোধে অনুষিক্ত হইবার লালসায় ভরপুর। ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে কাব্যরসকে ব্রহ্মরস-সহোদর বলা হইয়াছে, সেই কাব্যরস রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন কাব্য-গ্রন্থের ভিতর দিয়া অম্লান অবদানে পরিবেশন করতঃ বিশ্বমানবকে যে নব চেতনায় অভিষিক্ত করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার ব্রহ্মবোধে অনুষিক্ত হইবার লালসার সাক্ষ্য প্রদান করে।

রবীন্দ্রনাথের লিখন-প্রতিভা অনুপমেয়। যাহা লব্ধ হইয়াছে, তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া অনায়ত্তকে আয়ত্ত করিবার, অজ্ঞাতকে জানিবার, অ[illegible]কে দর্শন করিবার যে সুতীব্র ইচ্ছা রবীন্দ্র-কাব্যের মর্ম্মবাণীরূপে পরি[illegible]ত, তাহা কাব্য-জগতের আলোকস্তম্ভরূপে নিখিল বিশ্বপটে রশ্মিবিকীরণশীল।

রবীন্দ্রনাথ আপন পারিপার্শ্বিক জনগণের বেদনাকে আপনার অন্তরে অনুভব করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় লিখিয়াছেন,—

"ওই যে দাঁড়ায়ে নত শির
মূক সবে,—ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার—
বহি চলে মন্দ গতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,—

তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি' ;
নাহি ভৎ'সে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবের নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোন মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া !—এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত, শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হইবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে !
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে ;—"

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে। জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে মননশীল মানব মাত্রই উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে পুষ্টি আহরণ করিবেন, রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্তি তাহারই বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছে মাত্র। রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ হইতে যে অন্তর্বিকাশমূলক, প্রগতিসম্পন্ন বোধ নির্গলিত হইয়া অখণ্ড মানব-সমাজের শিল্প ও সংস্কৃতির অনুরাগী মহলে বিকীরিত হইয়াছে, তাহা তাহার উত্থানপাদ-পটে অর্থাৎ ভারতবর্ষে বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পর (১৯০২ খৃষ্টাব্দ) হইতে নব সৃষ্টির লহরী-বিকাশে ভারতীয় চিন্তাশীল-মনে সূক্ষ্মতর রাজ্যের প্রভাব বিস্তার করতঃ তাঁহারই ভিতরে নব্য ভারতের তৃতীয় স্রষ্টার গৌরবময় অভ্যুত্থানকে সম্ভব করিয়া তুলিয়া রামমোহনের উপ্ত বীজের নির্গলিত বৃক্ষের নব কিশলয়ের ফাঁকে ফাঁকে মনোরম পুষ্পকে প্রস্ফুটিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নব্য ভারতের তৃতীয় স্রষ্টা।

(৪)

মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী :—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করেন। হরিশ্চন্দ্রের

সত্যপরায়ণতার সুললিত কাহিনী শ্রবণে যে বালকের প্রাণ সত্য-আহরণ-পিপাসু হইয়া উঠিয়াছিল, সেই বালক তাঁহার অনাগত জীবনের ভিতর দিয়া অখণ্ড মানব-সমাজে সত্য আহরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করত কর্ম্ম ও ধর্ম্মের সমন্বয় পরিস্থাপন করিবার জন্য একদা বীরবিক্রমে অভ্যুত্থিত হইবে—ইহা কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল ? ভারতবর্ষীয় ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট এই যে, প্রয়োজনের কালে সেই প্রয়োজনের পরিপূরণী-বুদ্ধি-সমন্বিত ব্যক্তির উৎসৃজনে উহা কখনও পরাঙ্মুখ হয় না। বিংশ শতাব্দীর বর্ত্তমান জটিল আবর্ত্তে ভারতবাসীর সহস্রধা বিভক্ত প্রয়োজন একত্রে দানা বাঁধিয়া তাহাদের যে বিরাট বুভুক্ষাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহার প্রশান্তির তরে বস্তু ও ভাব-বিচারে অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টিভঙ্গী-সমন্বিত ব্যক্তিত্বের অভ্যুত্থানের যে প্রয়োজন ছিল, তাহার এক বিশেষ-অংশ পরিপূরিত হইয়াছে, মহাত্মাজীর ব্রাহ্মণ্য-বোধবাহিত, ক্ষাত্র-গৌরব-পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব প্রকাশের ফলে। ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টারী পড়িবার কালে এবং তৎপর ভারতবর্ষে ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ের প্রারম্ভকালেও "লাজুক স্বভাব" যাঁহাকে পরিহার করে নাই, দশ জনের সভায় দাঁড়াইয়া যিনি যথোচিত বাক্য নিঃসরণ করিতে সমর্থ হইতেন না, দুই চারি জনের বৈঠকে বসিয়াও যিনি তৎবৈঠকে উৎফুল্লভাব সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইতেন না, তিনি সপ্তবিংশবর্ষ বয়সে (১৮৯৬ খৃঃ) মাদ্রাজ নগরীতে সর্ব্বপ্রথম জনগণের যে সম্বর্দ্ধনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই ক্রমবর্দ্ধমান কলেবর ধারণ করিয়া প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানে যে বিপুলতায় উন্নীত হইয়াছে, তাহা অতুলনীয় বটে। ভারতবাসীর স্বরাজ লাভের আকাঙ্ক্ষাকে বলিষ্ঠতর অভিব্যক্তি প্রদান করিয়া সেই আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিবার কার্য্যে মহাত্মাজী ভারতীয়গণের জন্মজন্মানুক্রমিক অন্তরগমনশীল বোধের উপর দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হওতঃ যে অনাগত ভবিষ্যৎ-সৃষ্টির প্রয়াসে ব্যাপৃত আছেন, তাহার সুমনোহর সম্ভাবনাই ভারতীয় জনগণে তাঁহার ক্রমবর্দ্ধনশীল খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা রচনা করিয়াছে।

১৯০৬—১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ট্রান্সভালে দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট ভারতীয়-গণের সম্পর্কে যে বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যাহারের জন্য মহাত্মাজী যে 'প্যাসিভ-রেজিষ্টান্স' প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্ত্তীকালে সত্যাগ্রহ নামে পরিশোভিত হইয়াছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বিহার প্রদেশের চম্পারণে নীলকরের অবিচার দমন করিবার জন্য এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের খেড়া জেলার শাসনকর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে কৃষকদের ন্যায্য দাবী আদায় করিবার জন্য মহাত্মাজী এই সত্যাগ্রহ প্রয়োগ করেন এবং উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারত-গভর্ণমেণ্ট বিরচিত রাউলাট অ্যাক্টের প্রতিবাদে মহাত্মাজী সত্যাগ্রহকে ভিত্তি করিয়া ভারতবর্ষে যে বিরাট আন্দোলন জাগ্রত করিয়া তোলেন, তাহার পরবর্ত্তী স্বরাজ-আন্দোলন-ইতিহাসে গান্ধী-ব্যক্তিত্ব যে ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

মহাত্মাজী বর্ত্তমান ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনেতা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। কিন্তু আধুনিক কালের অপরাপর রাজনৈতিক মতবাদের সহিত তাঁহার নিজস্ব মতবাদের সাম্য পরিদৃষ্ট হয় না। তাঁহার নিজস্ব মতবাদের সৌরভ এখন পর্য্যন্তও পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া সেই মতবাদের বিচারে তাঁহার রাষ্ট্রনীতিকে বুঝিবার পক্ষে বহুবিধ বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়, ইহা স্বীকার করিলেও—ইহা নির্দ্বন্দ্বচিত্তে স্বীকার্য্য যে, অখণ্ড মানব-সমাজে—কর্ম্মের কলমুখর-পটভূমিকায় তপস্যাভিলিপ্ত জীবন পরিচালনার দৃষ্টান্ত পরিস্থাপন করাই তাঁহার প্রাণের ঐকান্তিক চাহিদা। এতৎপ্রসঙ্গে 'আত্মকথা বা সত্যের প্রয়োগ' নামক পুস্তকের প্রস্তাবনায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, "'আত্মদর্শনের' প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই আমি যাহা-কিছু লিখি ও বলি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমি যখন ঝাঁপাইয়া পড়ি, তখনও তাহার পশ্চাতে বিরাজমান থাকে, আমার 'আত্মদর্শনের' প্রেরণা। সত্যরূপী পরমেশ্বরের পূজায় আমি আমাকে নিবেদন করিয়াছি। সেই সত্য

অদ্যাবধি আমি লাভ করিতে পারি নাই। কিন্তু সেই সত্যের অনুসন্ধানে আমি অনুক্ষণ আমাকে নিয়োজিত রাখি। সেই অনুসন্ধানের হোমাগ্নিতে আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব অর্ঘ্যস্বরূপ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত।”

মহাত্মা গান্ধীর ৭০তম জন্মতিথি উপলক্ষে ডক্টর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁহাকে যে গ্রন্থ উপহার প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতা, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক প্রভৃতি ৬২ জন মনীষী তাঁহার জীবনী-সম্পর্কিত রচনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মহাত্মাজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব যে ভারতবর্ষের সীমারেখা উল্লঙ্ঘন করিয়া পৃথিবীর চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীরগণের মনের পটে অলব্ধপূর্ব্ব ছাপ প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছে, ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ সম্পাদিত পুস্তক দ্বারা তাহাই সুযুক্তি সহকারে প্রমাণিত।

রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের বিশ্বময় বিকাশের পরে (১৯১৩ খৃঃ) ভারতীয় স্থিতিপটে রামমোহন-বিবেকানন্দ রোপিত, সেবিত—ভারতীয় জনগণের যে কল্যাণ-বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই গোড়ায় আত্মবোধ-প্রকাশশীল কর্ম্ম পরিপুষ্টিস্বরূপ উৎসর্গ প্রদান করিয়া মহাত্মা গান্ধী তাহাকে ফল প্রসবোপযোগী অবস্থায় আনয়ন করতঃ যে নব সমৃদ্ধি দ্বারা বিমণ্ডিত করিয়াছেন, তাহার অন্তর-নিঃস্রাবী-অবদান ভারতবর্ষের চতুঃপ্রান্ত-রেখায় সীমাবদ্ধ না থাকিয়া দূরদিগন্তে বিসর্পিত হওতঃ অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর অখণ্ড জনগণে শাশ্বত কল্যাণ পরিবেশন করিতে সক্ষম হইবে, ইহাই আমাদের সুনিশ্চিত ধারণা। মহাত্মা গান্ধী নব্য ভারতেরচ তুর্থ স্রষ্টার পদে সমারূঢ়।

(৫)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী:—১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পাবনা জিলার হিমাইতপুর গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। মাতা-পিতার প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ও অগাধ প্রেমে যিনি স্বতঃ হইয়া জন্ম গ্রহণ

করিয়াছিলেন, তাঁহার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে আদর্শ মানবের যে লক্ষণাবলী প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাই তাঁহাকে ক্রমে এক বিশেষ পরিবেষ্টনীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পদে উন্নীত করিয়া তোলে।

যিনি জগৎ-সংস্থিতির অস্তিত্বের পটভূমিকা হইতে সংবৃদ্ধির মেরুদণ্ড প্রবাহিয়া তৎ-অস্তিত্বের এক বিশেষ আন্তিক সীমায় অধিরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, মানব-জাতির ইতিহাসে দেখা যায়, তিনিই মানব-মণ্ডলী-বিশেষের উপর অবিনশ্বর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। জাতিবর্ণবিশেষ-রাহিত্যে যে সকল লোক সংবৃদ্ধির চরম সীমায় সমারূঢ় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নিকট হইতে আপন আপন সংবৃদ্ধি-সাধনের জ্ঞান-কৌশল প্রাপ্ত হইয়া উন্নয়নের সুবর্ণবিমণ্ডিত-পথে ক্রমে অগ্রসর হইয়া চলিতেছেন, তাহাদের সংখ্যা অধুনা লক্ষাধিক হইবে। অল্পসময়ে অধিক লোক সংবৃদ্ধি-সাধনের জ্ঞান-কৌশল-প্রাপ্তির যে সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর অখণ্ড মানব-সমাজের পক্ষে তৎজ্ঞান-কৌশল-প্রাপ্তির সন্নিকটবর্ত্তী কল্যাণজনক সম্ভাবনাই প্রকাশ করিতেছে। যিনি বাস্তবভাবে মানবীয় পরিপূর্ণতায় অধিষ্ঠিত, অখণ্ড মানব-সমাজের উন্নয়ন ও পরিপুষ্টি সাপেক্ষে মানবীয় বিধি-ব্যবস্থার যাহা-কিছু সংরক্ষণযোগ্য, তাহার পরিপোষণ প্রেরণা লইয়া সেই অখণ্ড মানব-সমাজের সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

ভারতভূমিতে শতাব্দী ব্যাপিয়া যে কল্যাণ-বৃক্ষ ক্রমবর্দ্ধিত কলেবর প্রাপ্ত হওতঃ রবীন্দ্র-সাহচর্য্যে ফুল প্রসব করিয়াছে, গান্ধী-সাহচর্য্যে ফল প্রসবোপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই বৃক্ষ আমাদের জন্য যে অমৃতফল রচনা করিতেছে, তাহা অদূর ভবিষ্যতেই বাস্তবভাবে আমাদের অভিলব্ধি হইবে, শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কল্যাণে। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র শুধু নব্য ভারতের নহে, নব্য পৃথিবীর পরিপূর্ণ স্রষ্টারূপে আবির্ভূত।

প্রেমাবতার মহাত্মা যীশু খৃষ্ট ও খৃষ্ট-ধর্ম্মের বিস্তার

(১)

লোহিত-সাগরের প্রান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র ইহুদীভূমি—প্যালেষ্টাইন রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। প্যালেষ্টাইনের রাজা হিরোড দি গ্রেট রোমীয় সম্রাটের অধীনস্থ। প্রজাপুঞ্জের উপর হিরোডের অত্যাচার-কাহিনী দ্বারা তৎসাময়িক ইতিহাস মসীলিপ্ত। তাহার অত্যাচারের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত হয়, যখন তিনি 'মেগী' নামধারী প্রাচ্যদেশীয় ভ্রমণকারিগণের নিকট শ্রবণ করিলেন যে, তাহারই পৌরুষত্বকে ম্লান করিয়া জগতের ত্রাণকর্ত্তা রক্ত-মাংস-মেদ-বিমণ্ডিত হইয়া প্যালেষ্টাইনে আবির্ভূত হইয়াছেন। প্রাচীন ঐতিহাসিকগণও এরূপ লিখিয়া গিয়াছেন যে, যীশুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও সমকালে তদঞ্চলে এইরূপ একটা প্রবল জনরব সমুত্থিত হইয়াছিল যে, সত্বরই জগতের দুঃখ-মোচনকারী তাঁহার প্রেমের পসরা লইয়া আবির্ভূত হইবেন। এইরূপ অবস্থায় হিরোডের উৎপীড়ন আশঙ্কা করিয়া যীশুর পিতামাতা—যোসেফ ও মেরী বেথেলহামে নবজাত শিশুকে লইয়া মিশর দেশে পলায়ন করেন। কাইরোর সন্নিকটবর্ত্তী মাতারীতে দুই বৎসর বাস করিয়া—হিরোডের মৃত্যুর পর—তাঁহারা যীশুকে লইয়া নিজেদের বাসস্থানে—গেলিলি প্রদেশের অন্তর্গত নাজারেথে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

যীশু ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত নাজারেথে অবস্থান করেন। কিন্তু তাঁহার ত্রিশ বৎসরের জীবনকাহিনীর অতি সামান্য অংশই লোকলোচনের সম্মুখে সমুদ্ভাসিত হইয়াছে। সেণ্ট্ লিউক এইমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন যে, জেরুজালেমের পাসোভার উৎসবে যোসেফ ও মেরী দ্বাদশ বৎসরের বালক যীশুকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং কোনও ঘটনা-বিশেষে বালক যীশুর অলৌকিক শক্তিতে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। যিনি ত্রিশ বৎসর ব্যাপিয়া

আপন আত্মোত্থানে মনোহর পুষ্পনিচয় প্রস্ফুটিত করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই দীর্ঘ বয়সের ঐ একটি মাত্র ঘটনাই কালস্রোতে তাহার সৌরভ-কণারূপে প্রবহমান !

যীশুর জীবনে ও কার্য্যে যে সমস্ত অলৌকিকত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল, যথা—জর্ডান নদীর তীরবর্ত্তী বেথ্‌সাইডাতে একখণ্ড রুটি দ্বারা পঞ্চসহস্র লোকের উদরপূর্ত্তিকরণ, মৃগীরোগগ্রস্ত, কুষ্ঠরোগ ও বাতব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির রোগারোগ্য সাধন, চারি দিবসের সমাধিস্থ লেজারাসের নবজীবন দান প্রভৃতি ঘটনা যাহা খৃষ্ট-ধর্ম্মগ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে, উহাদিগকে যীশুর আধুনিক চরিতকারগণ যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন।

যিনি আপন উর্দ্ধগতিপ্রাপ্ত চৈতন্যস্বরূপে সমাহিত হইয়া জগতের কল্যাণতরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন,—"আমিই মুক্তির উদার বর্ত্ম, আমিই সত্য, আমিই জীবন। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কেহ পিতার নিকট গমন করিতে পারে না"—তিনি কি তত্ত্ব-পুরুষরূপে জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন না? নিখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত আব্রহ্মস্তম্ভ যে গোটা অস্তিত্ব ক্রমস্বস্তর-পরম্পরায় অস্তিত্ব-কেন্দ্রের সহিত সুবিন্যস্ত, তত্ত্ব-পুরুষগণ তাহা ক্রমিকরূপে ভেদ করিয়া অস্তিত্বের "উর্দ্ধমূল"এ কারণ-কেন্দ্র-পরিধিতে উপনীত হইয়া থাকেন। তত্ত্ব অর্থ—তাহাত্ব; যাহা যাহা দিয়া তাহা হইয়াছে, জানার একটা ক্রমে সেই তাহাকে যিনি জানিয়াছেন, তিনিই তত্ত্ব-পুরুষ। এই তত্ত্ব-পুরুষ, প্রোফেট, পয়গম্বর, পুরুষোত্তম বা অবতার তৎ-জানার চিৎঘন প্রতিমূর্ত্তিরূপেই জগতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তত্ত্ব-পুরুষ সংসারাঙ্গনে অবস্থিতি করতঃ পারিপার্শ্বিক জনগণকে মানবীয় জীবনযাত্রা-প্রণালীর সমুন্নত কৌশল মানবীয় উপায়েই প্রদর্শন করেন বটে, কিন্তু "কোন কোন ভাগ্যবান"এর নিকট তাঁহার অলৌকিকত্ব কার্য্য-কারণ-সিদ্ধরূপে অনিবার্য্যরূপেই প্রকাশ পায়। আমাদের বোধপ্রবোধী স্নায়ু স্থূল পরিপার্শ্ব হইতে যে সাড়া গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত, তাহাই লৌকিক এবং যখন তাহা সূক্ষ্ম পরিপার্শ্ব

হইতেও সাড়া গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়, তখনই তাহা অলৌকিক বলিয়া অভিহিত হয়। তত্ত্ব-পুরুষ স্থূল-সূক্ষ্মের মূর্ত্তিমান জীবন্ত প্রতীক বলিয়া তাঁহার সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে কাহারও কাহারও সূক্ষ্মজগতের সাড়া-গ্রহণ-ক্ষমতা জাগ্রত হইয়া থাকে, কাহারও কাহারও পরিপার্শ্বে সূক্ষ্মজগতের কার্য্যকলাপও প্রকটিত হইয়া থাকে। সুতরাং মহাত্মা যীশুর আবির্ভাবের পূর্ব্বকাল হইতে মহাকালের গর্ভে অবলুক্কায়িত তাঁহার ত্রিশ বৎসরের জীবনকাহিনীর ভিতর দিয়া তাঁহার মানবীয় লীলার অন্তিমকাল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া আমরা ইহাই ঘোষণা করিব যে, তিনি তাঁহার অমৃতাভিষিক্ত জীবনের ভিতর দিয়া আদর্শ মানবত্বকেই অভিব্যক্ত করিয়াছেন,—ইহা যেরূপ সত্য, বস্তুজগতে অবস্থান করিয়াও তিনি সদা চৈতন্যজগতে বিচরণ করিতেন বলিয়া তাঁহার সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে কাহারও কাহারও ভিতরে অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছিল,—ইহাও সেইরূপ সত্য।

ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে যীশু সাধু জোহানের নিকট দীক্ষিত হন। দীক্ষার পরই যীশুর প্রবল ভাবান্তর উপস্থিত হইলে তিনি নিকটস্থ পাহাড়ে (যাহা পরবর্ত্তীকালে কোয়েরেন্‌টেনিয়া নাম প্রাপ্ত হইয়াছে) গমন করতঃ চল্লিশ দিবস নির্জ্জন যোগ সাধনায় অতিবাহিত করেন। দীক্ষাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই যীশুর যে প্রবল কেন্দ্রাকর্ষণ-বোধ, তাহা রূপান্তরে চিত্রিত আছে সকল তত্ত্ব-পুরুষের জীবন কাহিনীতেই। হ্রীং, ওঁ, ক্লীং যেরূপ বীজমন্ত্র—লোগস *

* "In the Platonic schools it had become popular to describe the 'intelligibility' of the world, its qualities and orderly action, as the evidence of the work of the divine 'Logos.' * * * The 'Logos' was looked upon as one of the highest emanations; and those Christians who sought to be philosophical boldly identified Jesus Christ with the 'Logos'. Paul's conception of him as the typical heavenly man and the special menifestation of the divine fulness, had already prepared the way for this identification and in the introduction in the Fourth Gospel, it is unequivocally tought that the 'Logos' took flesh in Christ." —W. G. Tarrant.

'Beginnings of Christendom.' P. 63.

সেইরূপ বীজমন্ত্র। চৈতন্যের তীক্ষ্ণতা (intensity of spiritualism) যাহা ধারণ করে, তাহাই বীজমন্ত্র। অব্যাকৃত বীজমন্ত্রে সাধারণ মানবের চরিত্রে, সংস্কারে, বোধে যে অসামান্য পরিবর্ত্তন প্রকাশ পায়, তৎতুলনায় ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিতুল্য প্রচ্ছন্ন ঋষিতে অব্যাকৃত লোগস বীজমন্ত্র কতখানি পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে, তাহার ধারণা-শক্তি আধুনিক সমাজে অবলুপ্ত। নির্জ্জন যোগ সাধনা সমাপনে যীশু জন্ এবং এণ্ডরুকে সর্ব্বপ্রথম দীক্ষিত করেন। এণ্ডরু তাহার ভ্রাতা সাইমনকে যীশুর সমীপে আনয়ন করিলে যীশু তাহাকেও দীক্ষিত করেন। গেলিলিতে প্রত্যাগমনের পথে ফিলিপ দীক্ষিত হন। পঞ্চম দিবসে ন্যাথালিন দীক্ষিত হন। দীক্ষিত শিষ্যবৃন্দ সহকারে যীশু সর্ব্বপ্রথম কেপোরনাম্ নগরে তাঁহার অর্জ্জিত তত্ত্বপ্রচারে মনোনিবেশ করেন। তত্ত্বপ্রচারের মূলে জনগণ মধ্যে দীক্ষা বিতরণের যে বিধি বিরাজমান, সমস্ত দেশের সমস্ত তত্ত্ব-পুরুষগণ দেশকাল উদ্ভূত তাঁহাদের উপদেশের আপাতপ্রতীয়মান বৈচিত্র্যের ভিতরেও যে দীক্ষায় মৌলিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে ইহাই বক্তব্য যে, দীক্ষা জীবনের ভিত্তিভূমি, যাঁহা হইতে জীবন উৎসারিত হইয়াছে, তাঁহাতেই জীবনকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া সম্পর্কে মানব-জীবন-ঘটিত যে মৌলিক প্রশ্ন, তত্ত্ব-পুরুষ তাহাতেই মানব জীবনের সকল গুরুত্ব আরোপ করেন বলিয়া দীক্ষা-কার্য্যকে তাঁহারা মানবের বিবর্দ্ধনের পথ উন্মোচনের প্রাথমিক অনুষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

মুসা বহুকাল পূর্ব্বে গত হইয়াছেন। লোক তাঁহার উপদেশের মর্ম্মার্থ ভুলিয়া গিয়াছে। জগৎ-প্রপঞ্চে নূতন তত্ত্বদ্রষ্টার আবির্ভাব হওয়ার কারণ সমুপস্থিত হয় যে অবস্থা-পরম্পরায়, এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে তাহার সুসমাবেশ হইয়াছে; তাই, মহাত্মা যীশু আবির্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু ইহুদী-সমাজ এই নবীন তত্ত্বদ্রষ্টাকে গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইল। যুগে যুগেই যুগপ্রবর্ত্তক আপন দেশে বৈরিতার সাক্ষাৎলাভ করিয়া আসিয়াছেন। তাই, আমরা দেখিতে পাই, নাজারেথের যীশু রোমান সাম্রাজ্যের

জ্ঞানালোকে অনুদ্ভাসিত গেলিলিও প্রদেশের তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকের সহিতই কাল যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; তত্ত্বগ্রাহী সমসাময়িক জগৎ তাঁহার নিকট হইতে নব জ্ঞানের আলোক লাভ করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তাই, যীশুর প্রাথমিক শিষ্যবর্গকে বলা হইয়াছে, "not many wise, not many noble"—তাহারা বিজ্ঞও নহে, সম্ভ্রান্তও নহে।

পারিপার্শ্বিকের সেবার ভিত্তি কি—তৎসম্পর্কে যীশু বলিয়াছেন, "সেবার ভিত্তি হইবে—আত্ম-পরীক্ষা যাহা অপরকে তাহার মন্দকার্য্যের জন্য ভৎর্সনা করিবে না, যাহা অপরে মন্দকার্য্য করে বলিয়া বিশ্বাস করিবে না, যাহা অপরের মন্দকার্য্য জানিবে না।"

সর্ব্বত্র সমবোধ ও সমদর্শনের মৌলিক পট-ভূমিকা হইতে যীশু এবম্প্রকার যে সকল বাণী প্রদান করিতে লাগিলেন, তাহা তাঁহার স্ববংশীয় ইহুদিগণ আপনাদের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া বুঝিয়া যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র এবং প্যালেষ্টাইনের রাজা বলিয়া প্রকাশ করার অভিযোগে জেরুজালেমের প্রধান পুরোহিত কেয়াফাস্ সমীপে উপস্থিত করিলেন। কেয়াফাস্ যীশুকে হিরোড এণ্টিপাসের নিকট এবং হিরোড এণ্টিপাস্ যীশুকে রোমান প্রকিউরেটর পণ্টিয়াস পাইলেটের নিকট সমর্পণ করেন। পাইলেট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি রাজা ?" যীশু উত্তর করিলেন, "রাজা, কিন্তু এই মিথ্যাদ্বন্দ্ব-পরিপূর্ণ রাজ্যের রাজা নহি। আমি সত্য জগতের এবং সত্যান্বেষীদের রাজা।" পাইলেট যীশুকে নির্দ্দোষী বলিয়া ঘোষণা করা সত্ত্বেও ইহুদিগণ তাঁহাকে রোমান সাম্রাজ্যের প্রচলমান কঠোরতম শাস্তি ক্রুশ-বিদ্ধিতে সমর্পণ করিবার জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিতে থাকায় পাইলেট বলিলেন, "আমি এই নিরপরাধ ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকিব না।" ইহুদিগণ বলিলেন, "আমরাই তাঁহার মৃত্যুর দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।" তৎপর মহাত্মা যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হইলে তৎক্রুশ-সংবিদ্ধ অবস্থাতেই যীশু

পরমপিতার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "হে পিতা, তাহাদিগকে ক্ষমা করিও। কেননা, তাহারা কি করিতেছে, বুঝিতে পারিতেছে না।"

বিশ্বপিতার আপন উদ্যানের সযত্ন পোষিত পারিজাত পুষ্প—৩৫ বৎসরের অনধিক বয়স্ক, প্রেমাবতার যীশু এমনি করিয়া জগৎ-প্রপঞ্চ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

(২)

রোম সম্রাটগণের যে দানবীয় নিষ্ঠুরতা ক্রুশবিদ্ধিকরণের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিতেছিল, মহাত্মা যীশুর তাহাতে আত্মাহুতি প্রদান করিবার পর তাঁহার শিষ্যবৃন্দ নবতর সঙ্কটের আশঙ্কায় বিগলিতপ্রায় হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। তমসা বিকীরিত প্রকৃতিতে সহসা এক ঝলক আলো উদয়মান হইয়া ত্বরিৎ গতিতে অস্তমিত হইয়া গেলে চক্ষুষ্মানের ধ্যানে যেরূপ সেই আলোকই নয়নগোচর হয়, তাহার প্রলম্বিত রশ্মিচ্ছটা গৌণ হইয়া দাঁড়ায়, সেইরূপ যীশুর শিষ্যগণ যীশুর অন্তর্ধানের পর—তিনি কি বলিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা তিনি কি ছিলেন, এই বোধেই অধিকতর আত্মপরায়ণ হইলেন এবং এবম্প্রকার বোধোৎসারণ হইতে তাঁহার সামীপ্য-লাভের যে বলবতী আকাঙ্খা তাহাদের চিত্তে প্রস্ফুটিত হইল, তাহার একমাত্র স্বতঃ-পরিণতি যাহা—যীশু সমীপে প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন—তাহাতেই ঐকান্তিকী নিষ্ঠা সহকারে সংলগ্ন হইলেন।

প্রার্থনাতে গোপনীয়তা অবলম্বিত হইত। এইরূপ গোপনীয়তা অবলম্বন না করিয়া উপায় ছিল না। উন্নততর পন্থাকে লাভ করিয়া প্রচলিত পন্থাকে যাহারা বর্জ্জন করিয়াছেন, সংখ্যাল্পতা হেতু আপন গোষ্ঠীর বাহিরে তাহাদের প্রাধান্য স্বতঃই কম থাকিবার কথা। সুতরাং যেখানে যাহাদের সঙ্গে হৃদয়োদ্গত ভাবরাজির সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হয় না, সেখানে তাহাদের সঙ্গে যীশুর নবীনতম নির্দেশবাণীকে প্রতিপালন করিবার মত পারিপার্শ্বিকতা

যীশুশিষ্যগণ রচনা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না ; সেইজন্যই আপন গণের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহারা গোপনে প্রার্থনা করিতেন এবং উপাসনার তত্ত্বাঙ্গসমূহ প্রতিপালন করিতেন। তৎকালে আরও কয়েক প্রকার ধর্ম্মমত রোমান-সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল যাহার প্রধান অঙ্গসমূহ গোপনেই আচরিত হইত। 'গ্রীক্-মিষ্ট্রিজ' বলিয়া যে উপাসনা পদ্ধতি তৎকালে প্রচলিত ছিল, তাহা তাহার বাহ্য-প্রকাশেই গোপনীয়তার ছাপ বহন করিয়া চলিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু মহাত্মা যীশু ঊর্দ্ধলোকের যে তত্ত্ব আপন আত্মব্যঞ্জনায় প্রস্ফুটিত করিলেন, তাহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিবার মত মানসিকতা তাঁহার পারিপার্শ্বিক জনগণে সৃষ্ট হইয়াছিল না বলিয়া—সেই তত্ত্বের যে রশ্মি-প্রবাহ জগৎ-প্রপঞ্চে সংরক্ষা করিয়া তিনি সহসা অবলুক্কায়িত হইলেন, তাহার মর্ম্মরহস্যও সেই জনগণে দুর্বোধ্যই রহিয়া গেল। ইহাই যীশুশিষ্যগণের সমগণলুব্ধতা ও প্রার্থনার গোপনীয়তার অন্যতম কারণ এবং ইহা তাহাদের সমাজ ও রাজ-সরকারের রোষে পতিত হইবার অন্যতম কারণও বটে।

কিন্তু ক্ষুদ্র মানব বিশ্বপিতার অমোঘ বিধানের বিরোধী হইয়া চলিতে পারে কি ? যীশুশিষ্যগণের নির্য্যাতন এবং তাহাদের প্রতি আরোপিত সকল প্রকার ক্ষুদ্রতার অন্তরালে যীশু-বাহিত-কারুণ্য-ধারা ধীরে ধীরে নব নব রন্ধ্রপথে প্রসর্পিত হইয়া তাঁহার সত্য-সনাতন অস্তিত্বকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে লাগিল। ফিলিপ্ আফ্রিকার সিজারিয়া নগরীতে একজন আফ্রিকা দেশীয়কে এবং উক্ত নগরীতেই পীটার একজন রোমান রাজকার্য্য-কারককে নব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। সাইপ্রাসের সম্পত্তিসম্পন্ন ও নেতৃপদাধিকারী বার্ণাবাস নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাহার সুপ্রচারে মনোনিবেশ করিলেন। নূতন টেষ্টামেণ্টের ধর্ম্ম-প্রস্তাবনাসমূহে প্রথম খৃষ্টাব্দের যীশু-অনুগামিগণের বাহ্য-পরিপুষ্টি সম্বন্ধে কোন আলোক না পাওয়া গেলেও যীশুর বাণীসমূহের প্রচার সেই খৃষ্টাব্দ হইতেই যে গুণানুক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছিল,

তাহাতে সন্দেহ নাই। যীশুর নির্দ্দেশের মর্ম্মার্থ লইয়া তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণের মধ্যে মতবিরোধ আত্মপ্রকাশ করিত না, তাহা নহে; যীশুর আন্তর-দীপ্তিতে শিষ্য-প্রশিষ্যগণের পরিপূর্ণ অবগাহন না-করা-অবস্থায় তাঁহার মৌলিক নির্দ্দেশের ব্যাখা লইয়া তাহাদের মধ্যে মতভেদের প্রকটন অস্বাভাবিকও নহে। কিন্তু ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য যে, তাহারাই তখন যীশুর প্রকৃত প্রতিনিধিত্বলাভিষিক্ত ছিলেন, যাহাদের জীবমান স্থিতি ও আদর্শ-প্রচার-প্রয়াস হইতেই পরবর্ত্তীকালে খৃষ্টধর্ম্মের উল্লম্ফী ব্যাপ্তি সম্ভব হইয়াছিল। যীশুর প্রত্যক্ষ শিষ্যগণের ইষ্টপ্রতিষ্ঠাপ্রসূ কার্য্যাবলীকে ছাপাইয়া যিনি সূর্য্যালোক প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় এক বৃহত্তর পারিপার্শ্বিকে আলোক বিস্তারিত করিয়াছিলেন, তিনি সেন্ট্ পল।

পল তৃতীয় খৃষ্টাব্দে সিলিসিয়া প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। জীবন্ত ইষ্ট-নির্দ্দেশ-সংস্পর্শ-হারা, অসার সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে পল অনুরাগানুষিক্ত হইতে অক্ষম হইয়া সাধু এনোনিয়সের নিকট খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষালাভ করেন। পল ইষ্ট-যাজন-বৃত্তিতে সহজাত-সংস্কার-সম্পন্ন ছিলেন। এন্টিয়ক্ নগরীর অধিবাসী পল তৎনগরীর ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনীতে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি অতি সত্বরই খৃষ্ট-ধর্ম্মের বাণী লইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন। ৫৩ খৃষ্টাব্দে পল সর্ব্বপ্রথম ইউরোপে পদার্পণ করতঃ মেসিডোনিয়ার অন্তর্গত ফিলিপ্পী নগরীতে খৃষ্টবাণী প্রচার আরম্ভ করিলেন। ফিলিপ্পীর পর তিনি এথেন্স, করিন্থ, রোম নগরীতে এবং এশিয়া-মাইনরের সর্ব্বত্র খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। খৃষ্টীয় সাধন-তত্ত্বের যে বিমল জ্যোতিকে তিনি বাস্তব উপলব্ধিতে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার খৃষ্টবাণী বহন করার পক্ষে পরম উদ্দীপ্তির স্থল ছিল। তাঁহার আত্মনির্গলিত বাণীসমূহ 'এপিকিউরিয়েন্স্' বা নাস্তিক সম্প্রদায়ের লোকও পরম বুভুক্ষায় শ্রবণ করিয়া অধিকতর শ্রবণ-লালসায় আকুলিত হইয়া উঠিত।

৬৪ খৃষ্টাব্দে রোম নগরী অগ্নিলীলায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে সম্রাট নীরো

তাহা যীশুর শিষ্যগণের কীর্ত্তি বলিয়া অবধারণ করিয়া তাহার মনুষ্যত্বের সহজাত নিকৃষ্টতাকে অধিকতর উদ্দীপনে ঘনীভূত করতঃ অত্যাচার-অবিচার-লাঞ্ছনার ক্রমবর্দ্ধমানতায় সন্তপ্ত খৃষ্টানগণের উপর প্রয়োগ করিলেন। সম্রাট নীরোর নিম্নবৃত্তির নিষ্ঠুরতম অভিব্যক্তিতে খৃষ্টান-সমাজ ভগ্নপ্রবণ হইয়াও ভাঙ্গিয়া গেল না বটে, কিন্তু করুণা ও সারল্যের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি সেন্ট্ পল নগরীতে অগ্নিসংযোগকারীদের নেতা ছিলেন বলিয়া নিরূপিত হওয়ার অপরাধে শিরশ্ছেদিত হইলেন।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে সামারিয়া নিবাসী মার্টার জাষ্টিন খৃষ্টীয় জগতের আলোকস্তম্ভরূপে আবির্ভূত হন। প্লেটো, অরিষ্টটল ও পাইথাগোরাসের শিক্ষায় পরিতৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া জাষ্টিন হিব্রু ভাষা আয়ত্ত করিয়া খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। 'লোগস' শব্দের ভাবঘনময়তাই রক্তমাংসসঙ্কুল যীশুখৃষ্টে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল, এই তত্ত্বকে জাষ্টিন দৃঢ়তর ভূমিতে সংস্থাপিত করেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ সর্ব্বাধিপতির পরবর্ত্তী পদাভিষিক্ত ভূমিকাতেই তাঁহার পুত্রের স্থান। ১৭০ খৃষ্টাব্দে গ্রীক খৃষ্টান থিওফিলাস কর্ত্তৃক খৃষ্ট-ধর্ম্মের ট্রিনিটি-তত্ত্ব উদ্ভূত হয়। "God, Logos, and Wisdom"—ভগবান, শব্দ এবং জ্ঞান থিওফিলাসের ব্যাখ্যানুসারে খৃষ্টধর্ম্মের ত্রিত্বের ইহাই মর্ম্ম।

তৃতীয় শতাব্দীতে ক্লিমেণ্ট খৃষ্টীয় জগতের কেন্দ্র-স্বারূপ্যে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি গ্রীসীয় ছিলেন। খৃষ্টানগণের চলনা ও ব্যবহারি[illegible] সম্পর্কে তিনি অমূল্য নির্দ্দেশ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, সৌন্দর্য্য, শান্ত, প্রেম ও পবিত্রতার পূজায় সুন্দর বেশে, শান্তছন্দে, প্রেমপূরিত হৃদয়ে, পবিত্রীকৃত সত্তায় অভিগমন করিতে হইবে। চার্চ্চের উপাসনা পরিচালনায় পৌরহিত্যের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর স্থিতিশীলতা লাভ করে সাইপ্রিয়ানের প্রয়াসে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে।

টার্জ্জান ৯৮ খৃষ্টাব্দে রোমের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বিথিনিয়া প্রদেশের গভর্ণর প্লিনির সাহচর্য্যে টার্জ্জান খৃষ্টীয়-ধর্ম্মের মর্ম্মবোধে প্রচুর আলোক লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটগণ নীরো, ভেস্পাসিয়ান,

াইটাস্ ডোমিটান, নাভা প্রভৃতি খৃষ্টানগণের যাতনা বৃদ্ধি সাধন ব্যতীত ীশুবাণীর তাৎপর্য্য-নিরূপণে আদৌ চেষ্টাপরায়ণ হন নাই। সম্রাট হার্ডিয়ানের শাসনকাল হইতে মার্কাস অরেলিয়াসের মৃত্যু পর্য্যন্ত (১১৭—১৮০ খৃঃ) খৃষ্টানগণের উপর অত্যাচার কথঞ্চিৎ প্রশমিত থাকে। সম্রাট এলিজেবেলাস্ (২২২—২৩৫ খৃঃ) খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারে উৎসাহদাতারূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সম্রাট দেসিয়াস্ ও ডায়োক্লিটিয়ানের রোষ-বহ্নি খৃষ্টানগণের প্রতি রণরঙ্গিনী ব্যঞ্জনায় প্রকটিত হইয়াছিল।

রাজসিংহাসন হইতে যিনি যুগে যুগে দলিত ও লাঞ্ছিত খৃষ্টান-জগতে শান্তি ও পুষ্টি প্রদান করিতে করুণাবিগলিত হৃদয়ে সর্ব্বপ্রথম অগ্রসর হইয়াছিলেন, তিনি সম্রাট কন্‌ষ্টেনটাইন। ৩১২ খৃষ্টাব্দে কন্‌ষ্টেনটাইন রোমান সাম্রাজ্যে প্রচলমান সকল ধর্ম্মের প্রতি রাজকীয় উদারতা প্রদর্শিত হইবে— এইরূপ ঘোষণা প্রকাশ করিলেন। ৩২৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কন্‌ষ্টেনটাইন খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করিলেন যে, রাজ হৃদয়ও তরুণ-ধর্ম্মে সাড়াপ্রবণশীল হয়; সহস্র প্রকারের বিঘ্ন বর্ম্মাবৃত প্রহরীর ন্যায় পরিপূর্ণ সতর্কতায় যাহাকে ঘিরিয়া রাখে, তরুণ ঋষির সদ্য উচ্চারিত বাণীতে তিনিও অমৃতের আস্বাদন লাভ করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম খৃষ্টাব্দে খৃষ্ট-ধর্ম্ম ইউরোপের দেশে দেশে বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ করে। সপ্তম শতাব্দীতে স্পেন, গল (ফ্রান্স), এঙ্গলো-স্যাক্সন (ইংলণ্ড) ও দক্ষিণ জার্ম্মানীতে খৃষ্ট-ধর্ম্ম দ্রুত বিক্রমে প্রসারিত হয়। ৫৯৭ খৃষ্টাব্দের খৃষ্টোৎসবে অগষ্টাইন ক্যাণ্টে ১০ সহস্র বৃটনকে খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। বনিফেস (৭২০—৭৫৫খৃঃ) উত্তর জার্ম্মানীতে লক্ষ লক্ষ লোককে খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। রাশিয়ার রাজা ভ্লাডিমির ৯৮০ খৃষ্টাব্দে খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আপন রাজ্যে তাহার বিস্তার-কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। এবম্প্রকার ঝঞ্ঝাগতিতেই খৃষ্ট-ধর্ম্ম সমগ্র ইউরোপে পরিব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে।

পুরুষোত্তম হজরত মোহাম্মদ ও ইসলাম ধর্ম্মের বিস্তার

(১)

সপারিপার্শ্বিক আরবীয় ভূমি যুগ যুগ ব্যাপিয়া আর্য্য-রশ্মিধারার স্নানে নবনবায়মান ঐশ্বর্য্যে পরিমণ্ডিত হইয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে যে মহান্ পুরুষকে বক্ষে ধারণ করতঃ পবিত্র হইয়াছিল, তিনি হজরত মোহাম্মদ। সপারিপার্শ্বিক আরব বহু কীর্ত্তিমানকে ধারণ করিয়া জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির স্রোত-প্রবাহে আপন অঙ্গকে পরিপূরিত করিলেও আরবীয় সমাজের ফাঁকে ফাঁকে তাহা এমন সব বিরোধী-ভাবের সন্নিবেশও সজ্জিত রাখিয়াছিল, যাহার জন্য জীব-কল্যাণগতপ্রাণ মহান্ পুরুষ মোহাম্মদ তাঁহার প্রেরিতত্ব প্রতিষ্ঠায় বহু প্রকার বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে আর্য্যেতর রক্ত-প্রবাহ তথাকার আর্য্য-শ্রেণী-বিশেষে সংমিশ্রিত হইয়াছিল, তাহা আরবীয় ভূমির সহজ জীবন-যাপন-প্রতিকূল প্রাকৃতিক বিঘ্নাবলী দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া হজরত মোহাম্মদ কর্ত্তৃক আর্য্যগৌরবরশ্মি বিকীরণে বিচিত্র রকমের প্রতিকূলতা সাধন করিয়াছিল। হজরত মোহাম্মদ যখন আপন কোরেশবংশীয়দিগকে আহ্বান করিয়া প্রেমস্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—"তোমাদিগকে উত্তমের পথ পরিদর্শন করাইতে পরমেশ্বর আমাকে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, যদি তোমরা এক পরমেশ্বরের পূজায় ব্রতপরায়ণ না হও, তবে তোমরা ইহলোকে শান্তি ও পরলোকে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না"—তখন হইতেই কোরেশবংশীয়গণ তাঁহাকে যে লাঞ্ছনা ও ক্লেশ উপঢৌকন দিতে লাগিলেন, তাহার সকরুণ পরিসমাপ্তি ঘটে—হজরত মোহাম্মদের মক্কা হইতে সাময়িকভাবে বিদায় গ্রহণ করিবার পরে। ৬২২ খৃষ্টাব্দে হজরত মোহাম্মদ আবুবেকরের সহায়তা-গুণে মক্কা হইতে যাথ্রেবে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মেদিনাৎ এল নবি"—পয়গম্বর বা তত্ত্ব-পুরুষের বাসস্থানরূপ নগরে রূপান্তরিত হল বলিয়া সেই কাল হইতে যাথ্রেব নগর মদিনা নামে পরিশোভিত হইয়াছে।

হজরত মোহাম্মদ ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃমুখদর্শন-বঞ্চিত, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-বিমণ্ডিত বালক মোহাম্মদ মাতা আমিনার যত্ন রক্ষণাবেক্ষণে ষষ্ঠ বর্ষ পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া মাতার পরলোক-গমনে পিতামহ আবদুল মোতালেবের স্নেহরসধারায় শশীকলার ন্যায় প্রবর্দ্ধিত হইতে থাকেন। অষ্টম বর্ষ বয়সে পিতামহ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলে বালক পিতৃব্য আবুতালিবের আত্মোৎসারিত পরিবেষ্টনায় সমাজদেহে এক নৈতিক বিপ্লবের অঙ্কুর উদ্ভিন্ন করিয়া তোলার কার্য্যে পরিচালিত হইতে থাকেন। যে বিপ্লব মনোজগতের অভ্যন্তর হইতে উৎসারিত হইয়া অখণ্ড মনকে পরিশাসিত করিবার জন্য রূপ পরিগ্রহ করে, সেই বিপ্লবের অঙ্কুর মোহাম্মদের পঞ্চম বর্ষ বয়সেই দেখা দিয়াছিল। ঐশ-সাম্রাজ্যের আকর্ষণে বালক মোহাম্মদ তখন যে বাহ্য অচেতনতা প্রাপ্ত হইয়া আন্তর-চেতনা-বিধৃত সন্দীপ্তিতে সমাহিত হইয়াছিলেন, তাহার ফলে এইরূপ কথিত হইয়াছিল যে, বালক মানসিক ব্যাধি-বিশেষে আক্রান্ত হইয়াছেন। তথাকথিত এই ব্যাধি-বিশেষই বালক মোহাম্মদের চিত্তরূপ নিভৃত-নিকুঞ্জে ক্রম-বলশালীত্বে পরিণতি লাভ করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর লাভের গৌরবময় পথে পরিচালনা করিতে থাকে।

জন্মভূমির দুঃখ-দুর্গতিতে বিগলিত-প্রাণ মোহাম্মদ দিব্য-জ্ঞানে বুঝিতে পারিলেন যে, আরব ও তাহার পারিপার্শ্বিকের জনগণের জীবনবৃদ্ধি নীতি-সম্ভারকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার অবশ্যই লাভ করিতে হইবে। সমাজ-জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঈশ্বরের করুণা-ধারা কেমন করিয়া কোন্ কৌশলে প্রবাহিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহা প্রত্যক্ষ ঈশ্বরানুভূতি ব্যতীত বুঝিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। আবাল্য-ধ্যানপরায়ণ হজরত মোহাম্মদ এমনি প্রকার ভাবরাজি দ্বারা কেন্দ্রগমনানুকূল্যে

সমৃদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ৩৩ বৎসর বয়স হইতে মোহাম্মদ এতই ধ্যান-ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন যে, দিবারাত্রির বিভেদবিহীনতায় তিনি ধ্যানে নিমজ্জিত থাকিয়া চৈতন্ত-জগতের স্তরের পর স্তর উন্মোচন করিয়া চলিতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থাতেও মোহাম্মদ যখন ঈশ্বর লাভ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি ঈশ্বর-বিরহে এমনি প্রবলভাবে পীড়িত হইয়া উঠিলেন যে, লৌকিক দৃষ্টি-বিচারে তিনি উন্মাদ আখ্যায় ভূষিত হইলেন এবং সমাজে উন্মাদের সচরাচর যাহা প্রাপ্তি ঘটে, তাহা প্রাপ্ত হইয়া উহাদিগকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া লইলেন। তাঁহার এই বিরহব্যাকুল, প্রেমোন্মাদ ও নিঃসঙ্গ জীবনে যিনি স্নেহ প্রীতি প্রেম ভরসা ও সেবার বারি সিঞ্চিত করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর-লাভে অগ্রবর্ত্তী হইতে সহায়তা করিয়াছিলেন, তিনি তাহার সহধর্ম্মিনী খাদিজা। খাদিজা কতবার ঈশ্বর-বিরহে জর্জ্জরিত-প্রাণ স্বামীকে আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করিয়া জগতের আত্মহত্যা নিবারিত করিয়াছেন! পরিশেষে পরমেশ্বর হজরত মোহাম্মদের আত্মভেদী ব্যাকুলতার উপঢৌকন-স্বরূপ তাঁহাকে মানবীয় জীবন-বর্দ্ধনের সত্য প্রদান করিলেন। প্রচলিত মানবীয় বিধিব্যবস্থায় নব রূপান্তর আনয়নকারী এই সত্য হজরত মোহাম্মদ মক্কার সন্নিকটস্থ হর পর্ব্বতে লাভ করিয়াছিলেন। মোহাম্মদ আপন উপলব্ধির চরম রেখা পর্য্যন্ত চেতনরস-নিঃসৃত-উল্লাসে প্রলিপ্ত করিয়া পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে সমতলে অবতরণ করতঃ সহধর্ম্মিনী খাদিজাকে এই সংবাদ প্রদান করিলেন।

হজরত মোহাম্মদ স্বয়ং নব জীবন লাভ করিয়া সমগ্র দেশে নব জীবন প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে ইচ্ছাপরায়ণ হইলে খাদিজা সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে পয়গম্বর বা প্রেরিত-পুরুষ বলিয়া স্বীকার করতঃ তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তৎপর আবু তালিবের পুত্র আলী মোহাম্মদকে জীবন্ত ইষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিলেন। কিছুকাল পরে জৈয়দ, তৎপর কোরেশবংশীয় প্রবীণ ও জ্ঞানী বলিয়া প্রখ্যাত আবছল্লা (যিনি পরবর্ত্তী কালে আবুবেকর নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) হজরত মোহাম্মদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। আবছল্লার

ংকুল্ল যাজন-বৃত্তির ফলে তাঁহার আত্মীয় তাল্‌হা ও খালিদ, মোহাম্মদের াতুল পুত্র সাদ, মোহাম্মদের পিতৃস্বসাপুত্র অথমান, খাদিজার ভ্রাতুষ্পুত্র জাবেয়ার, জ্ঞানী দানশীল ও প্রতিভাসম্পন্ন আবদুল রহমান, কোরেশ-ংশীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী ব্যক্তি ওথমান মোহাম্মদের জীবন-বৃদ্ধির স্থবাণী গ্রহণ করেন। ৬২০ খৃষ্টাব্দে ছয়জন যাথ্রেববাসী এই নব ধর্ম্মে াক্ষা লাভ করেন। পরবর্ত্তী বৎসরে তাহারা যাথ্রেবের অপর দুই প্রতি-ত্তিশালী জাতির ছয়জন প্রতিনিধিকে মক্কায় লইয়া আসিয়া এই নব ধর্ম্মে দীক্ষিত রেন। এই দ্বাদশ জন যাথ্রেববাসীই দীক্ষা গ্রহণোপলক্ষে দীক্ষা-নিঃসৃত ারবর্ত্তী কার্য্যকলাপকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সর্ব্বপ্রথম প্রতিজ্ঞা-াত্রে স্বাক্ষর করেন। হজরত মোহাম্মদের সত্য লাভের তিন বৎসর কাল ধ্যে তাঁহার ৪৪ জন শিষ্য সমগণ-ভূমিকা রচনায় তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া ণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

হজরত মোহাম্মদ প্রকাশ্যভাবে নব ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইলে তাঁহার শিষ্যগণের উপর যে লাঞ্ছনা বর্ষিত হইতে থাকে, তাহার উপকূলে সর্ব্বপ্রথম াামিয়া নাম্নী একজন ইষ্টৈকপ্রাণা রমণী আবুজ্জাল কর্ত্তৃক নৃশংসভাবে উৎপীড়িত ইয়া প্রাণত্যাগ করেন। হজরত মোহাম্মদ শিষ্যবর্গের উপর ক্রমবর্দ্ধমান পশাচিক উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে আবিসিনিয়া দেশে ামন করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। ৬১৫ খৃষ্টাব্দে ১১ জন পুরুষ ও । জন রমণী মক্কা হইতে আবিসিনিয়াতে পলায়ন করিলেন। ৬১৬ খৃষ্টাব্দে তাহার আরও শতাধিক শিষ্য মক্কা হইতে পলায়ন করিতে এবং তিনি স্বয়ং াক্কা হইতে সাফা শৈলে অর্থান নামক শিষ্যের পরিরক্ষণায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। অর্থানের গৃহেই কোরাণের ঐশীবাণীসমূহ হজরত মোহাম্মদের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হইয়া নিখিল মানবের অস্তিবৃদ্ধিমূলক সত্য-সনাতন সম্পদকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল।

লৌকিক দৃষ্টি ও বোধের অন্তরালে যে জগৎ সনাতন দীপ্তিতে চির-

বিরাজমান, সেই অলৌকিক দৃষ্টি ও বোধের জগতের ক্রিয়াকলাপে অভিজ্ঞান লাভ করিয়াও এবং শিষ্যবর্গের তৎজ্ঞান-উৎসরণায় আপনাকে নব নব রূপে অভিব্যক্ত করিলেও লৌকিক দৃষ্টিতে অলৌকিক ঘটনা দর্শনাভিলাষীকে হজরত মোহাম্মদ বলিতেন যে, তিনি সাধারণ মানুষ। তিনি অলৌকিক কার্য্যকলাপ অবগত নহেন। মিশর নরপতির সকরুণ আবেদনে হজরত মুসা অলৌকিক কার্য্যকলাপ সংঘটিত করিলেও মিশরাধিপতি তাঁহাকে ইষ্টরূপে গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই; প্রকৃতির অভ্যন্তরে গমন করিবার কৌশল অবলম্বন করিলে প্রকৃতির সূক্ষ্ম কার্য্যকলাপ স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

হজরত মোহাম্মদের শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধির সমান্তরালে তাঁহার শিষ্যবর্গের উপর অত্যাচার বর্দ্ধিত হইয়া চরমে উপনীত হইলে তিনি মক্কায় বাস করা সম্ভবপর নহে বলিয়া বুঝিয়া যাথ্রেবে প্রস্থান করিলেন। যাথ্রেবের ইষ্ট বিশ্বাসী বা মোসলেমগণ তাঁহাদের প্রিয় পরমকে উল্লসিত অন্তঃকরণে গ্রহণ করিল। যাথ্রেবে গমনের অল্প দিন পরেই যাথ্রেবের আউস্ ও খাস্রাজ নামক প্রবল-পরাক্রান্ত ও পরস্পর বিবাদমান জাতিদ্বয় মোহাম্মদকে প্রেরিত বলিয়া গ্রহণ করিল। যাথ্রেব বা মদিনায় যে প্রকাশ্য ভজনালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা হইতেই সর্ব্বপ্রথম মোসলমানগণকে প্রকাশ্য ভজনায় আহ্বান করিবার রীতির উদ্ভব হয়। সেই আহ্বান-ধ্বনি বা আজান তৎকাল হইতেই মোসলেম-জগতের ভজনালয়সমূহে প্রত্যহ পাঁচবার ধ্বনিত হইতেছে। হজরত মোহাম্মদ ক্রমে মদিনার রাজ্য-শাসন-সংস্কারে মনোনিবেশ পূর্ব্বক তথায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া মদিনার শাসনকর্ত্তার পদও গ্রহণ করিলেন।

জগৎ-সংস্থিতির বাহ্য ও আন্তর পটে যিনি জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয় লইয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সক্ষম, তাঁহার পক্ষে পূর্ব্বতন দ্রষ্টা-পুরুষগণের অবদান-নির্ভরতায় মানব সমাজের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিধিকে আত্মোপলব্ধি-সঞ্জাত বোধমূলে নবরূপে যন্ত্রায়িত করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাওয়াই

স্বাভাবিক। হজরত মোহাম্মদ মদিনার ধর্ম্মগুরু, সমাজপতি এবং শাসনপতির পদ গ্রহণ করিয়া সেই প্রয়াসকেই রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছিলেন। জ্ঞানবাদ, ভক্তিবাদ ও কর্ম্মবাদের অপূর্ব্ব সমন্বয় উৎসারিত যে তত্ত্ব হজরত মোহাম্মদের নিকট প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাকে কঠোর বস্তুজগতের পক্ষেও কল্যাণপ্রদ করিয়া তুলিবার প্রয়োজন-বোধে তাঁহাকে সশস্ত্র সংগ্রামে জড়িত হইতে হইয়াছিল। হজরত মোহাম্মদ জ্ঞাতি-বিরোধ দমনকল্পে ৯ বৎসর বয়সে যে যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন, যে যুদ্ধ ইতিহাসে 'ফিজার' নামে বিখ্যাত—সেই যুদ্ধে, পরিণত বয়সে বেদুইনগণের সহিত যুদ্ধে, ইহুদিগণের সহিত যুদ্ধে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সহিত যুদ্ধে এবং পরিশেষে মক্কাবাসিগণের সহিত যুদ্ধে সংলিপ্ত হইয়া যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রয়োজনের উৎসরণায় সকল মানবের সকল বৃত্তির খিন্নকরণী-বোধ-সমন্বিত পূর্ণ মানবত্ব প্রকাশের দৃষ্টান্তস্থল বটে।

ইসলাম অর্থ পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ। হজরত মোহাম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও ইসলামধর্ম্ম বর্ত্তমান ছিল। যে আর্য্যবোধ মানবীয় সভ্যতার উষালোকে এশিয়া-মাইনরে প্রকটিত হইয়া মানবগণকে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে আহ্বান করিত, তাহা ইসলামধর্ম্মই ছিল। হজরত মোহাম্মদ যুগ যুগ বাহিত সেই ইসলামধর্ম্মে নবজীবন সঞ্চারিত করিতে আবির্ভূত হইয়া নিখিল মানবের ধর্ম্মবোধে যে অবিনশ্বর পুষ্টি সংযোজনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অন্তরগমনশীল মননে যথার্থরূপে উপলব্ধি হওয়ার যোগ্য।

মদিনা, মক্কা ও সমগ্র আরবে একেশ্বরবাদের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া এবং সহস্র সহস্র ইষ্টগতপ্রাণ মোসলমানের হৃদয়ে শোকাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া পুরুষোত্তম হজরত মোহাম্মদ ৬৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন।

(২)

মক্কা-মদিনার সশস্ত্র সংগ্রামের পরিসমাপ্তিতে মক্কাবাসিগণের পক্ষ হইতে সন্ধি উপলক্ষে যিনি দূতরূপে মদিনায় গমন করিয়াছিলেন, তিনি

মক্কায় প্রত্যাগমন করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যে মূল্যবান বাণী পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, পারস্যরাজ প্রবল প্রতাপান্বিত খস্রুর দরবারে—কনষ্টান্টিনোপলের মহাবলবীর্য্যধারী সম্রাটের দরবারে জনগণের যে সম্ভ্রম, নিষ্ঠা, প্রীতি ও মর্য্যাদা প্রকাশিত হইতে দেখা যায় না, তাহার লক্ষগুণে অধিক সম্ভ্রম, নিষ্ঠা, প্রীতি ও মর্য্যাদা হজরত মোহাম্মদের মদিনাবাসী শিষ্যগণ মোহাম্মদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া থাকেন।

মানব আত্মসংস্থিতির সূক্ষ্ম পটভূমিকায় যে পারস্পরিক সম্বন্ধ গঠন করিয়া লইতে পারে, সেই সম্বন্ধ একমাত্র তত্ত্ব-পুরুষকে কেন্দ্র করিয়াই গঠিত হইয়া থাকে এবং এইজন্যই তত্ত্ব-পুরুষ বা পয়গম্বরের প্রতি সেই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ জনগণ সম্মিলিতভাবে যে সম্ভ্রম, নিষ্ঠা, প্রীতি ও মর্য্যাদা প্রদান করেন, তাহার তুলনা অপর জনগণ মধ্যে পরিদৃষ্ট হইতে পারে না।

হজরত মোহাম্মদ মানবকুলে আপনাকে অমর সত্তায় অভিব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন যে কোরাণের বাণীমালায় (আয়েত), খলিফা ওসমান তাহা মৌলিক কোরেশ ভাষার গর্ভলোক হইতে আহরিত ও একত্রিত করিয়া পুস্তকাকারে সন্নিবদ্ধ করিবার গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যে সুরা ফাতেহা মহাগ্রন্থ কোরাণের আরম্ভস্বরূপ, যাহার আবৃত্তি ও অনুধ্যান ব্যতীত মোসলমানের সমাজগত অনুষ্ঠানসমূহ হজরত মোহাম্মদের সহিত সংযুক্ত হয় না, সেই সুরা ফাতেহাতে ইসলামধর্ম্মের সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সন্নিবদ্ধ আছে, যথা— "তোমাকেই আমরা আরাধনা করিতেছি এবং তোমারই নিকট আমরা সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি।" "আমাদিগকে সরল সত্যপথে পরিচালনা কর"—তাহা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়, আর্য্যহিন্দুর গায়ত্রী মন্ত্র—"তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"—জগতের যিনি পরিচালক, তাঁহার পূজনীয় তেজ ধ্যান করি, যেন তিনি আমাদের বুদ্ধিকে মঙ্গলের দিকে প্রেরণ করেন।

কোরাণ ঈশ্বরবিশ্বাসিগণের পক্ষে ঈশ্বরাভিমুখীনতায় চলিবার পথের অনির্ব্বাণ প্রদীপ।

হজরত মোহাম্মদের মহাপ্রয়াণের পর হজরত আবুবেকর এই কোরাণরূপ প্রদীপ হস্তে লইয়া মোসলমানগণের ধর্ম্মগুরু ও রাষ্ট্রনেতা পদে অভিষিক্ত হইলেন। আবুবেকর সামাজিক সম্পর্কে হজরত মোহাম্মদের শ্বশুর হইলেও তিনি ইষ্ট-সেবাসঙ্কুলতায় অদ্বিতীয় ছিলেন। আবুবেকর যে সমস্ত উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন, যথা আফ্‌জল লোলবশর (নরশ্রেষ্ঠ), সেদ্দিক (সত্যবাদী), আকবর (শ্রেষ্ঠ), ইয়ারেগার (গহ্বরস্থ বন্ধু)—তাহার প্রত্যেকটি তাঁহার আত্মভেদী ইষ্টানুগত্য হইতেই সমুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল। হজরত মোহাম্মদের তত্ত্ব-পুরুষরূপে প্রকটিত হইবার পূর্ব্বে আবুবেকর যে অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন, আত্মাধিকারে সমুন্নত বাহিরা সন্ন্যাসী তাহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন যে, অচিরেই মক্কা নগরীতে এক মহান্ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের আবির্ভাব ঘটিবে এবং তিনি তাঁহার প্রধান সহচররূপে পরিকীর্ত্তিত হইবেন। "ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নহেন, মোহাম্মদ সেই ঈশ্বরের প্রেরিত"—এই বাণী মক্কার কাবা-মসজিদ-প্রাঙ্গণে প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলে আবুবেকর আত্‌বা হইতে যে নির্ম্মম প্রহার লাভ করেন, তাহা তাঁহার ইষ্টনিষ্ঠাকে প্রবর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেই সহায়তা করে। হজরত আবুবেকর সম্বন্ধে হজরত মোহাম্মদ হাদিসে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন,—"আমার অন্তর্গত মণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা স্বর্গে গমন করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে—হে আবুবেকর, আপনিই প্রথম। আপনি গিরিগহ্বরে আমার সঙ্গী ছিলেন, স্বর্গেও আমার সঙ্গী থাকিবেন।"

দুই বৎসর চারি মাস মোসলেম-জগতের খলিফা বা প্রতিনিধির পদে বর্ত্তমান থাকিয়া হজরত আবুবেকর মহাপ্রস্থান করিলে হজরত ওমর ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে খলিফার পদে অভিষিক্ত হন।

কোরেশ দলের দুর্দ্দান্ত নেতার প্ররোচনায় এক শত উষ্ট্র ও এক সহস্র রজত মুদ্রা প্রাপ্তির প্রলোভনে যিনি কাবার বিগ্রহ হবলদেবকে সাক্ষী করিয়া হজরত মোহাম্মদের শিরশ্ছেদন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, ভগিনী ফাতেমা ও ভগিনীপতি নসিম হজরত মোহাম্মদকে গ্রহণ করিয়াছেন শ্রবণ

করিয়া যিনি তাঁহাদিগকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়াছিলেন, সেই ওমর মোহাম্মদের প্রেরিতত্ব লাভের পাঁচ বৎসর পরে তাঁহাকে ইষ্টরূপে গ্রহণ করেন। তিনি মক্কায় উদ্দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, "আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, সেই ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ সেই ঈশ্বরের প্রেরিত।"

হজরত মোহাম্মদ একদা ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন "হে প্রভো, বিশ্বাসী বা মোসলমানগণের রক্ষার জন্য কোরেশদিগের মধ্য হইতে একজন প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী নায়ক আমাকে উপহার দাও।" ঈশ্বর হজরত মোহাম্মদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া ওমর ফারুক্‌কে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

প্রকাশ্যে হজরত মোহাম্মদের ব্রহ্মরসানুষিক্ত বাণীসমূহের ঘোষণা ও তদানুপাতিক আচরণ যখন মক্কা নগরীতে সম্ভবপর ছিল না, তখন ওমর মোহাম্মদের মন্ত্রবাণীকে জপে ধারণ করিয়া প্রত্যহ কাবা-মসজিদ সাতবার প্রদক্ষিণ করিতেন, হজরত ইব্রাহিমের পদচিহ্ন-রক্ষিত-স্থানে প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে প্রত্যহ দুইবার উপাসনা করিতেন। হজরত মোহাম্মদের মদিনায় প্রস্থানের পর মক্কাবাসীদের সম্মিলিত-আক্রোশকে উপহাসে বিকৃত করতঃ যিনি কটিদেশে তরবালশোভিত হইয়া প্রকাশ্য রাজপথে মদিনা যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই ওমর একদা হজরত মোহাম্মদের একান্ত দীন বেশ দর্শনে কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন—পৃথিবীর সম্রাটগণ জীবন্ত ধর্ম্মে সংযুক্ত না থাকিয়াও কত সুখ ভোগ করিতেছেন, আর আপনি ঈশ্বর প্রেরিত হইয়াও এত অভাব ও দুঃখে দিন অতিবাহিত করিতেছেন কেন? খলিফা ওমর "খলিপ্‌তোর রসুল" (প্রেরিত পুরুষের স্থলাভিষিক্ত) উপাধি গ্রহণ না করিয়া "আমিরোল মুমেমিন" (বিশ্বাসীদিগের দলপতি) এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। রোমের দূত রাষ্ট্র-সংক্রান্ত কার্য্য উপলক্ষে মদিনায় গমন করিয়া খলিফা ওমরের নিকট আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চ তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া ইসলামধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হজরত ওসমান ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে মোসলেম-জগতের খলিফার পদে অধিরোহণ করেন। ওসমান হজরত মোহাম্মদের জামাতা ছিলেন। হজরত

মোহাম্মদের প্রেরিতত্ব লাভের প্রথম বৎসরে আবুবেকরের ইষ্ট-যাজন-বৃত্তিতে উদ্বোধিত হইয়া তিনি ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ৬৫৬ খৃষ্টাব্দে হজরত আলী মোসলেম জগতের খলিফা। আলী ইষ্টৈকপ্রাণতার ভিতর দিয়া আপন গণ হইতে আসদোল্লা (ঐশ্বরিক সিংহ), হায়দার (ঐশ্বরিক শার্দ্দুল) উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

হজরত আবুবেকরের নেতৃত্বকালেই মেসোপটেমিয়া, ইরাক, পারশ্য, মধ্য এশিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ, ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশ, সিরিয়া, বস্‌রা, প্রভৃতি স্থান ইসলামধর্ম্মের বিজয়-গর্জ্জনে প্রকম্পিত হইয়াছিল। হজরত ওমরের অধিনায়কত্ব কালে ইসলাম বিস্তৃততর জগতে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাঁহারই সময়ে দামাস্কস্, গ্রীক নগরী এন্টিয়ক্, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি স্থানে মোহাম্মদ বিঘোষিত একেশ্বরবাদ-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে পারশ্য দেশের সর্ব্বাংশে, ভূমধ্যসাগরীয় প্রদেশে ইসলামের বিজয় বৈজয়ন্তিকা উড্ডীন হয়। ৭০০ খৃষ্টাব্দে ইসলামের প্রভাব অধিকতর পরিব্যাপ্ত হয়। উত্তরে গেলিশিয়া ও জর্জ্জিয়া, পূর্ব্বে কাস্‌গর ও সিন্ধু, পশ্চিমে স্পেন ও দক্ষিণে নিউবিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে ইসলাম মধ্যাহ্ণ-মার্ত্তণ্ডের মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। ৯১০ খৃষ্টাব্দে ইসলামধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করে। তৎপর ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমারেখা অতিক্রমণে ইসলামধর্ম্ম সুমাত্রা, জাভা, মালয়, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কথিত আছে, হজরত মোহাম্মদের মহাপ্রয়াণের চারি বৎসর পূর্ব্বে হজরতের এক প্রিয় সহচর চীন-সাগরের উপকূলবর্ত্তী ক্যান্টন প্রদেশে পদার্পণ করিলে তাঁহার নিকট হইতে চীন দেশীয় বহুসংখ্যক লোক ইসলামধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে মিশরে ইসলামধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। তৎশতাব্দীতে মরক্কো দেশেও ইসলাম প্রবর্ত্তিত হয়। নবম শতাব্দীতে সুদান ও আলজিরিয়া দেশে—তৎপর সাইবেরিয়া, বুলগেরিয়া, সার্ভিয়া প্রভৃতি দেশেও ইসলামধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করে।

ভগবান্ বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার

(১)

হিমালয় গিরিমালার পাদরেখায় কল কল প্রবাহিণী পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী রোহিণী—ইক্ষ্বাকুবংশীয় হইতে সমাগত বলিয়া পরিখ্যাত শাক্যবংশীয়গণের যে ভূভাগকে বিধৌত করিয়া প্রবাহিত, তাহারই ক্রোড়ান্তর্গত—শিলাবতী, সঙ্কর, দেবদেহ প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী নগর সন্নিহিত,—শাক্যরাজ্যের রাজধানী কপিলবাস্তুতে আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৬২৩ অব্দে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। বৈদিক ও ঔপনিষদিক ভারতের যে সমুজ্জল জ্ঞান-প্রবাহ শুষ্কতার অভিমুখীনতায় দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাকে প্রতিহত করিয়া অমৃতের পথে পরিচালিত করিবার জন্যই বুদ্ধদেবের শুভ আবির্ভাব। বিশ্বসংস্থিতির গভীরতর স্তর হইতে জন্ম-পরিগ্রহকারী যুগমানব বা তত্ত্ব-পুরুষগণের জন্মকালে কার্য্য-কারণের যে অন্তরতর বৈজ্ঞানিক সঙ্গতি সাধারণের নিকট অলৌকিক বলিয়া অভিহিত হইয়া প্রকটমান হয়, বুদ্ধদেবের জন্মকালেও তাহা প্রকটিত হইয়াছিল।

শিশুর জন্মের পঞ্চম দিবসে পিতা শুদ্ধোধন তাঁহার নামকরণ করিলেন সিদ্ধার্থ। সপ্তম দিবসে শিশুর মাতা মহামায়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মহামায়ার ভগিনী প্রজাপতি গৌতমী কর্তৃক লালিত পালিত হইয়া সিদ্ধার্থ যথাকালে রাজগুরু বিশ্বামিত্রের চরণে সমর্পিত হন। তাঁহার শিক্ষাগুণে সিদ্ধার্থ বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থের তত্ত্বমালায় এবং ক্ষত্রিয়কুলোচিত যুদ্ধবিদ্যাতেও অসামান্য পারদর্শিতা লাভ করেন।

বাল্যকাল হইতেই সিদ্ধার্থ যথোচিত গাম্ভীর্য্যে ও সর্ব্ববিষয়ের সংযমে সুশোভিত ছিলেন। সাধারণ দর্শন ও সাধারণ শ্রবণকে ভেদ করিয়া তাহার অন্তঃস্থলে গমন করিবার একটা স্বতঃকামনা অনুক্ষণের জন্য তাঁহাকে যে মৃদু প্ররোচনা প্রদান করিত, তাহা ক্রমেই কঠোরতর হইয়া উঠিতে লাগিল। রাজা

শুদ্ধোধন রাজকুমারের এবম্প্রকার মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া দণ্ডপাণি দুহিতা, অপরূপ সৌন্দর্য্যশালিনী গোপার সহিত তাঁহার বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করিলেন। যথাকালে সিদ্ধার্থের এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর—মানবের জন্মমৃত্যুজরাব্যাধির মৌলিক তত্ত্বে অভিগমন করিবার জন্য সিদ্ধার্থ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কোন্ ঐশী শক্তির নিয়ন্ত্রণে জরাব্যাধিমৃত্যু মানবের সকল গৌরব অপহরণ করিয়া তাহাকে রিক্ততায় নিক্ষেপ করিতেছে, তাহার সম্যক অভিজ্ঞান লাভ না করিয়া সংসারে অবস্থিতি করা সিদ্ধার্থের নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। পিতার সদয় অনুমতি লইয়া এবং তাঁহাকে যথোচিত সান্ত্বনা প্রদান করিয়া সারথী ছন্দকের সহযোগিতায় সিদ্ধার্থ এক গভীর রাত্রে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনোমা নদীর তীরে রাজবেশ পরিত্যাগান্তে নিরাভরণ হইয়া তথা হইতে একাকী কপর্দ্দকশূন্য-অবস্থায় এক অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

বৈশালীর হিরণ্যবতীর তীরে ঋষি আরাড়কালামের আশ্রম। সিদ্ধার্থ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অল্পকালেই তাঁহার জ্ঞান আয়ত্ত করিলেন; কিন্তু জগতের দুঃখ-নিবৃত্তির মৌলিক হেতুর সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না। তৎপর রুদ্রক ঋষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার জ্ঞানরাশিকে আয়ত্ত করিয়াও জগতের মৌলিক তত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। সিদ্ধার্থ অন্যত্র চলিলেন। রুদ্রক ঋষির পাঁচজন শিষ্য—কৌণ্ডিণ্য, অশ্বজিৎ, ভদ্রীয়, বাষ্প ও মহানাম তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। সিদ্ধার্থ ভাবিলেন, ইন্দ্রিয়সমূহকে দমন করিয়া মনকে বাসনা-বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হইলেই অভীষ্ট লাভ হইবে। এই বোধে পরিপূর্ণ হইয়া সিদ্ধার্থ গয়াশীর্ষ শৈলের সমীপে নৈরঞ্জনা ও মহাফল্গু নদীর সঙ্গমে সুদীর্ঘ ৬ বৎসর কাল কঠোর সাধনায় অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি জগতের মৌলিক সত্তাকে লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। তৎপর এই বোধ তাঁহার মনে সমুদিত হইল যে, কৃচ্ছ্র সাধনা ও ভোগবিলাসের মধ্যবর্ত্তী সত্যপথকে অবলম্বন করিলেই সত্যলাভে সাফল্য-অর্জ্জন সম্ভবপর

হইবে। অতঃপর তিনি যথোচিত স্নানাহারে মধ্যপন্থাকে আয়ত্তাধীনে আনয়ন করতঃ এক স্নিগ্ধ-শ্যামল সন্ধ্যায় বোধিদ্রুমমূলে নবীন তৃণে আসন রচনা করিয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন। সিদ্ধার্থ সঙ্কল্প করিলেন, "এই আসনে আমার দেহ শুষ্ক হইয়া যায়, যাউক। ত্বক অস্থি মাংস ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, হউক। তথাপি বহুকল্প-দুর্লভ বোধি লাভ না করিয়া আমার দেহ এই আসন পরিত্যাগ করিবে না।"

সিদ্ধার্থের সুপ্ত সংস্কার দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। কত তত্ত্ব, কত লোক-লোকান্তর তাঁহার দিব্যজ্ঞানে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তৎপর সাধন-পথের যে অবস্থার কঠোর পরীক্ষা সাধককে পথভ্রষ্ট করিবার উপক্রম করে, সেই অবস্থায় সিদ্ধার্থ উপনীত হইলে তাঁহার সত্তা-নিহিত গভীরতর বাসনা-গ্রন্থিসমূহ সম্মিলিত-ঐক্যে তাঁহার চলার পথের অগ্রগমনশীলতায় বিরাট প্রতিবন্ধকরূপে দণ্ডায়মান হইল। সিদ্ধার্থ পর্ব্বতবৎ সংহত-স্থিতিতে আপনাকে সংগ্রথিত করিয়া অনমনীয় সঙ্কল্পে, অবিচলিত পৌরুষ-ব্যঞ্জনায় কহিলেন, "যদি পর্ব্বতরাজ মেরু স্থানচ্যুত হয়, সমস্ত জগৎ শূন্যে প্রলিপ্ত হইয়া যায়, সমস্ত নক্ষত্র আকাশ হইতে স্খলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়, তথাপি—হে আমার নব সমুদিত, সম্মিলিত সুপ্তবাসনা-প্রতীক (মার), এই দ্রুমমূল হইতে তুমি আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না।" সংস্কার ভেদ হইল, 'মার' পলায়ন করিল। সিদ্ধার্থ অগ্নি-পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইলেন। তিনি মৌলিক বোধিকে প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধ হইলেন। তখন বুদ্ধদেবের বয়স ৩৫ বৎসর।

বুদ্ধদেব বুঝিলেন,—দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ-নিরোধের উপায় এবং নিরোধ—এই চারিটিই সত্য। তিনি উহাদিগকে আর্য্য সত্যচতুষ্টয় বলিয়া অভিহিত করিলেন। বুঝিলেন—তৃষ্ণা, বাসনা বা সুপ্ত সংস্কার হইতেই সকল দুঃখের উদ্ভব হয়। আরও বুঝিলেন—মানবের সকল সংস্কারকে বিনাশ করিতে হইলে সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কর্ম্মান্ত (right action), সম্যক ব্যায়াম (right exertion), সম্যক স্মৃতি ও সম্যক

সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ মার্গকে অবলম্বন করিতে হইবে। মানবের সংস্কারোৎপন্ন সকল দুঃখের মূলীভূত কারণ-জ্ঞান অধিগত করিবার পক্ষে,—তৎমার্গের অনুসন্ধানী-অংশে আপনাকে স্থিতিশীল রাখিয়া এক্ষণে বুদ্ধদেব তৎকাহিনী প্রচারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। জগৎ হইতে দুঃখ দূর করিতে হইলে বিশিষ্ট কৌশল অবলম্বনে সকল দুঃখের উৎসের উপরে অধিরোহণ করিতে হইবে—এই সত্য যদি সুপ্রচারিত না হয়, তিনি ভাবিলেন—তবে আমার সকল সাধনা কি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে না? রুদ্রক ঋষির যে পঞ্চ শিষ্য ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং যাহারা তাঁহার কৃচ্ছ্র সাধনার পন্থা পরিহারের পর তাঁহার প্রতি সন্দেহপরায়ণ হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেব ঋষিপত্তনে গমন করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকেই দীক্ষা ও প্রব্রজ্যা দান করিলেন।

তৎপর যশ নামক কাশীধামের এক ধনশালী বণিকের পুত্র বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষা ও প্রব্রজ্যা লাভ করেন। পুত্রের ইষ্ট-যাজনে বিগলিত হইয়া পিতাও বুদ্ধদেবের গৃহীশিষ্যের (উপাসক) অধিকারে স্থান প্রাপ্ত হইলেন। বুদ্ধদেব স্বয়ং তাঁহার আহরিত সত্যের প্রচার মানসে উরুবিল্বে গমন করিলেন। উরুবিল্বের সর্ব্বাধিপতি-তুল্য আচার্য্য কাশ্যপ আপন সহোদর ভ্রাতা ও শিষ্যবর্গ সহকারে বুদ্ধদেবের চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার নিকট সদ্ধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তৎপর বুদ্ধদেব মগধের রাজধানী রাজগৃহে পদার্পণ করিলেন। মগধরাজ বিম্বিসার রাজৈশ্বর্য্যের মোহপাশ হইতে আপনাকে স্খলিত করিতে সমর্থ হওতঃ বুদ্ধদেবের চরণপ্রান্তে উপগত হইলেন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। মগধ দেশে বুদ্ধদেবের সত্য ক্রমেই বিবর্দ্ধমান প্রচারে পরিব্যাপ্ত হইতে থাকিলে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ে অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়াছিল বটে!

তৎপর বুদ্ধদেব কপিলবাস্তুতে গমন করেন। কপিলবাস্তু নগরে বহুসংখ্যক লোক বৌদ্ধমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে প্রজাপতি গৌতমীর পুত্র নন্দ, দেবদত্ত, উপালি, অনিরুদ্ধ, আনন্দ বৌদ্ধ ইতিহাসে অবিনশ্বর স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সুদত্ত (অনাথপিণ্ডদ) নামক এক সত্যানুরাগী ধনবান ও দানশীল বণিক বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিবার মানসে বিশেষ প্রশ্ন উত্থাপন করিলে বুদ্ধদেব তাহাকে উপলক্ষ করিয়া জগতকে বলিয়াছিলেন, "তুমি সগৌরবে নিজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আপনার শক্তি-সামর্থ্য ব্যবসায়-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিয়োজিত কর। আমার ধর্ম্ম কাহাকেও অকারণে গৃহ পরিত্যাগ করিতে বলে না। আমার ধর্ম্ম অহঙ্কার, মলিনতা ও ভোগবিলাস বর্জ্জন করিয়া সাধুপথে বিচরণ করিবার জন্য মানবকে আহ্বান করিয়া থাকে।" সুদত্ত বুদ্ধদেবকে ইষ্টরূপে গ্রহণ করেন এবং শ্রাবস্তী নগরে বহু অর্থ ব্যয়ে এক মনোরম বিহার নির্ম্মাণ করিয়া বৌদ্ধসঙ্ঘের নামে উৎসর্গ করেন।

বুদ্ধদেবের বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর পনর বৎসর সমাবর্ত্তিত। ইতিমধ্যে বঙ্গ, মগধ, কলিঙ্গ, উৎকল, বারানসী, কোশল প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসার লাভ করিয়াছে। তৎপরবর্ত্তী ২৬ বৎসরের ইতিবৃত্ত কালগর্ভের অন্ধকারে অবলুক্কায়িত। বুদ্ধদেব যখন ৭২ বৎসর বয়সে উপনীত, তখন দেবদত্ত ইষ্টদ্রোহী হইয়া উঠিয়া বুদ্ধদেবের বিশেষ নির্য্যাতনের কারণ হওতঃ কয়েকবার তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেবদত্ত ও তাহার সহানুচরগণ কর্ত্তৃক পর্ব্বত-শীর্ষ হইতে প্রস্তর নিক্ষেপের ফলে বুদ্ধদেবের পদে এক গভীর ক্ষতের উৎপত্তি হইয়াছিল। পরে জীবকের চিকিৎসা-গুণে তিনি তাহা হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে নূতন ধর্ম্মরূপে দেখা দেয় নাই। ধর্ম্মের মৌলিকবস্তুর নূতন স্তর আবিষ্কৃত হইতে পারে—একমাত্র এই অর্থ ব্যতীত অপর কোনও অর্থে ধর্ম্মকে নূতন-পুরাতন সংজ্ঞায় অভিহিত করাও সঙ্গত নহে। বুদ্ধদেব ভগবান্ ও আত্মার স্বারূপ্য-ব্যাখ্যা পরিহার করিয়া সাধারণ মানবীয় বোধে কর্ম্ম সংস্কাররূপ বন্ধনের বিমুক্তির প্রশ্নকেই সকলের উপরে প্রাধান্য দান করিয়াছিলেন। কারণ-জ্ঞান-অধিগমন-বিষয়ে গুরু বা ইষ্ট যখন প্রধানতম অবলম্বন, তখন ইষ্টই ভগবান্ বা আত্মাও বটেন। বুদ্ধদেব বেদ-বিরোধী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে

তিনি বেদের শুষ্ক-ক্রিয়া-কর্ম্মেরই বিরোধী ছিলেন। বেদগ্রন্থের মৌলিক প্রতিপাদ্য বিষয় যাহা, বুদ্ধদেব আচরণে তাহাই প্রকটিত করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের শূন্যবাদ ধ্বংসবাদ আখ্যায় অভিহিত; কিন্তু যথার্থপক্ষে তাহা সচ্চিদানন্দমূলক নির্ব্বাণবাদ, সংস্কারশূন্য-অবস্থা প্রাপ্তির পক্ষে অমৃতবাদ!

বুদ্ধবংশ, ললিত বিস্তর প্রভৃতি গ্রন্থে বহু বুদ্ধের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য তাঁহাদিগকে জন্মজন্মান্তর ব্যাপিয়া সাধন-পথে বিচরণ করিতে হইয়াছে। কুশীনগরের (গোরক্ষপুরের সন্নিকটবর্ত্তী কাশিয়া) মাহাত্ম্য-বর্ণনা-প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, "পূর্ব্বে ইহা অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। আমি এখানে মহাসুদর্শন নাম ধারণ করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলাম।"

বুদ্ধদেবের বয়স এক্ষণে ৮০ বৎসরের উর্দ্ধে। আসন্ন মহা পরিনির্ব্বাণের শান্তি ও গাম্ভীর্য্য তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে প্রতিফলিত। ধর্ম্ম প্রচারব্যপদেশে বৈশালী হইতে কুশীনগরের মল্লদের শালকুঞ্জে উপনীত হইলে তিনি এক সর্ব্বসংহরণশীল দিবসে আনন্দকে শালতরুর অবকাশস্থলে শয্যা রচনা করিতে বলিলেন। আনন্দ তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিলে তিনি উত্তরশীর্ষ হইয়া তথায় শয়ন করিলেন এবং আনন্দকে ধীরস্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আজ রাত্রিশেষে আমার পরিনির্ব্বাণ লাভ হইবে।" তৎপর সমুপস্থিত শিষ্যবর্গকে যথোচিত উপদেশ প্রদান করিয়া তিনি যথাকালে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। সেই ধ্যান আর ভাঙ্গিল না।

(২)

তত্ত্ব-পুরুষগণ মেদমাংস-বিমণ্ডিত হইয়া ধরায় আবির্ভূত হইলে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অনুগামীদের সহিত তাঁহাদের যে বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার মর্ম্ম বোধ করিবার ক্ষমতা সাধারণ লোকের আয়ত্তের বাহিরে। অখণ্ড অস্তিত্বের যে বাহিরের পটে সাধারণ মানব সংগ্রথিত, তত্ত্ব-পুরুষগণের সহিত সংযুক্ত ভাগ্যবান্ মানবসমুদয়ের অধিকাংশই অস্তিত্বের সেই বাহিরের পটকে ভেদ করিতে

সমর্থ হওতঃ আপন আপন ইষ্টনিষ্ঠা, মনন ও ধ্যানশীলতার অনুপাতে তাহার অভ্যন্তরস্থ স্তরের ক্রমিকতায় অধিরোহণ করিয়া থাকেন বলিয়াই তত্ত্ব-পুরুষগণের সহিত তাঁহারা এতখানি প্রগাঢ়তায় সংযুক্ত থাকেন যে, সাধারণ মানুষের সাধারণ বোধ ও যুক্তিতে ফেলিয়া তাহারা তাহার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হন না। এই জন্যই তত্ত্ব-পুরুষগণের জীবন-কাহিনী উদ্ঘাটিত করিলে তাঁহাদের প্রাথমিক শিষ্যগণের সম্পর্কে দেখা যায়, তাহারা এক ক্ষুদ্রায়তন, নূতন জগৎ রচনা করিয়াছেন এবং অল্পসংখ্যাবিশিষ্ট সমগণ লইয়া তাহাতেই বসতি করিয়াছেন। কালক্রমে সেই জগৎ বর্দ্ধিত আকার প্রাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই জগতের আদি স্রষ্টা তখন উহার অনেক দূরেই প্রয়াণ করিয়াছেন।

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ লাভের পর যাহারা বুদ্ধদেবের প্রত্যক্ষ-সংস্রবকে ধারণ করিয়া তাঁহার জীবপ্রেমমূলক ভাবধারার সুবিস্তারে প্রয়াসশীল ছিলেন, তাহাদের মধ্যে যশ, কাশ্যপ, আনন্দ, উপালি, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি ইষ্টানুগত্যে সমুজ্জ্বল হইয়া দেদীপ্যমান। ঈশ্বর, আত্মা, পরমাত্মা প্রভৃতি শব্দ পরিহার করিয়া বাসনা-গ্রন্থির ক্রম-বিলোপকে উপলক্ষ করতঃ বুদ্ধদেব যে মুক্তি বা নির্ব্বাণের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তৎকালীন ভারতের আর্য্য-অনার্য্য সকলেই সমভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিবার সমসৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর, আত্মা, পরমাত্মা সর্ব্বত্রই অনুস্যূত বটে, কিন্তু তাঁহাদের স্বারূপ্যের সন্ধানী লোক প্রকৃতপক্ষেই প্রগাঢ় অনুভূতি সাপেক্ষে প্রকাশশীল। কিন্তু বাসনা-গ্রন্থির স্থূল পর্য্যায়ের সহিত মানবমাত্রেই ঘনিষ্ঠতায় বিজড়িত। এই স্থূল পর্য্যায়ের গ্রন্থিসমূহকে ভেদ করিয়া তাহার ক্রম-সূক্ষ্ম স্তর-পারম্পর্য্যকে ভেদ করতঃ কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রগমনশীল হইয়া চলিবার নির্দ্দেশের পশ্চাৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া এইরূপ অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, বুদ্ধদেব যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া মানব-জীবনকে অবলোকন করিয়াছিলেন, তাহার সহিত পরিচয় স্থাপনে তৎকালীন ভারতের জনগণের পক্ষে বিশেষ সুবিধা ও সৌভাগ্যই উদয় হইয়াছিল।

বুদ্ধদেবের শিষ্যগণের তিনটি প্রধান আশ্রয়—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ। রুদ্রক ঋষির

পাঁচজন শিষ্যকে পুনঃ দীক্ষা প্রদান করিয়া বুদ্ধদেব যে সঙ্ঘের অঙ্কুর উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিলেন, তাহা কালক্রমে বিরাট মহামহীরূপে পরিণতি লাভ করিয়া কোটী কোটী মানবকে ছায়াশীতল আশ্রয় প্রদান করতঃ তাহাদের বহির্বিকাশের গতিশীলতায় অন্তর্বিকাশের জীব উপ্ত করিয়াছে। মগধরাজ বিম্বিসার এবং তৎপুত্র অজাতশত্রু বুদ্ধদেবকে ইষ্টরূপে গ্রহণ করিলেও ইষ্ট যাজন-বৃত্তিতে তাঁহারা এতখানি উৎফুল্লতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, যতখানি উৎফুল্লতাকে অশোকের ভিতর দিয়া প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবার মৌলিক ভূমিকা নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহা একটি অবিসম্বাদী সত্য যে, পূর্ব্ববর্ত্তী শিষ্যগণকে কেন্দ্র করিয়াই পরবর্ত্তী শিষ্যগণ ইষ্টবোধ-ব্যাপ্তিতে দিগ্বিজয়ীপ্রতিভা-প্রকাশে সমর্থ হইয়া থাকেন। যাহাদের অস্তিত্বকে আলিঙ্গন করিয়া তত্ত্ব-পুরুষের আবির্ভাব, তাহাদের ইষ্টপ্রাণতা সমগণে ক্রমে বিবর্ত্তিত হইয়া ইষ্ট-গরিমা-প্রকাশের রাজবর্ত্মের রেখাকে যদি অঙ্কুরিত করিয়া না তুলিত, তবে প্রতিযুগেরই ইষ্ট-প্রগতি স্তব্ধীকৃত হওয়ারই সম্ভাবনা প্রাপ্ত হইত।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কালে ভারতবর্ষে যে সমস্ত প্রধান প্রধান রাজ্য ছিল, তাহার অধিকাংশ রাজ্যেই বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই বিস্তারের খ্যাতিপটে বৌদ্ধ-যাজকগণ বৌদ্ধ-সঙ্ঘের অনুবর্ত্তিতায় বৌদ্ধধর্ম্মের অনির্ব্বাণ আলোকবর্ত্তিকা হইতে দিকে দিকে নব নব দীপশিখা প্রজ্বলিত করতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের বিশ্বপ্লাবন-মূলে যে ভূমিকা রচনা করিয়াছিলেন, মহামতি অশোক সেই ভূমিকায় প্রণত হইয়াই নিখিল জনগণে বুদ্ধদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত এবং পিতা বিন্দুসার বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়াও যেন অশোকে রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্ম-বিস্তারে অপরিমেয় শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ২৯৭ অব্দে অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজত্বের একাদশ বর্ষে তিনি বৌদ্ধ-যাজকরূপে বৌদ্ধ-সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। 'দীপবংশ' ও 'মহাবংশ'এ উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহামতি অশোক কাশ্মীর,

গান্ধার (আফ্‌গানিস্থান), মহিসা (মহীশূর), বনবাস (রাজপুতানা), অপরন্তক (পশ্চিম পাঞ্জাব), মহারাষ্ট্র, যোনলোক (ব্যাক্‌ট্রিয়া ও গ্রীক্‌রাজ্য সমূহ), হিমবত (মধ্য হিমালয়), সুবর্ণভূমি (নিম্নব্রহ্মদেশ) এবং লঙ্কা দ্বীপে বৌদ্ধযাজক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুশাসন-লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, চোলা (মাদ্রাজ), পাণ্ড্য (মাদুরা), সত্যপুরা (সাতপুরা পর্ব্বতশ্রেণী), কেরল (ত্রিবাঙ্কুর), সিংহল এবং সিরিয়ার গ্রীক্‌রাজ এন্টিওকাসের রাজ্যেও তাঁহার ইষ্টৈকপ্রাণতা-নির্গলিত যাজন-বৃত্তির ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিগৃহীত হইয়াছিল। অপর এক অনুশাসন-লিপিতে প্রকাশিত আছে যে, তাঁহার রাষ্ট্রদূতগণ বৌদ্ধ-যাজকের রূপান্তরে সিরিয়া, মিশর, মেসিডন এবং সিরিনের গ্রীক্‌রাজগণের সমীপেও গমন করিয়াছিলেন। অশোক আপন পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে সিংহলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সিংহল রাজ তিস্‌স বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিংহল রাজকুমারী অনুলা সঙ্ঘমিত্রার নিকট বৌদ্ধমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিখিল ভারতে শত শত স্তূপ ও বিহার নির্ম্মাণ করিয়া এবং গিরিগাত্রে ও শিলাস্তম্ভে বুদ্ধবাণীসমূহ উৎকীর্ণ করিয়া অশোক বুদ্ধদেবকে অনুক্ষণের তরে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য যে প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী কালে রাষ্ট্রের নিয়মিত কর্ম্মধারায় এক বিশিষ্ট অভিব্যক্তিতে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। রাজত্বের চতুর্দ্দশ বর্ষ হইতে অশোক 'ধর্ম্মমহাপাত্র' উপাধিধারী একদল রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য-বাসক-জনগণ বৌদ্ধ বিধিসমূহ প্রতিপালন করিয়া গুণে শীলে কর্ম্মে আদর্শ প্রজায় উন্নীত হইতেছে কি না, তাহা পরিদর্শন করাই 'ধর্ম্মমহাপাত্র'গণের কর্ত্তব্য ছিল। অশোক ইউরোপ এবং আফ্রিকাতেও বৌদ্ধ-যাজক প্রেরণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃপক্ষেই বুদ্ধদেব অন্তর-রাজ্যের যে অমৃত আহরণ করিয়াছিলেন, তাহার সুবিস্তৃত পরিবেশনে মহামতি অশোক কালপটে যে দৃষ্টান্ত পরিস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা তুলনাবিহীন।

সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর ৭৮ খৃষ্টাব্দে কুষাণবংশীয় বৌদ্ধ নরপতি কনিষ্ক কাস্পিয়ান সাগর হইতে বিন্ধ্যাগিরি পর্য্যন্ত সুবিস্তারিত সাম্রাজ্যের একাধিপত্য লাভ করিয়া অশোকের পদানুসরণে স্তূপ ও বিহার নির্ম্মাণ, দেশে দেশে বৌদ্ধ-যাজক প্রেরণ প্রভৃতি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহারই রাজত্বকালে চীনদেশে হানবংশীয় সম্রাট মিংতি রাজ্য পরিচালনা করিতেছিলেন। তাঁহার রাজধানী হেনান নগরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পরবর্ত্তী কালে এই কেন্দ্র হইতেই চীনদেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিব্যাপ্তি লাভ করে। তৃতীয় শতাব্দীতে উ-তি চীনের সম্রাট পদবীতে অধিরূঢ় ছিলেন। তাঁহার শাসনকালেও তদ্দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম সবিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধশাস্ত্রের সুবিজ্ঞ ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষ আবির্ভূত হন। তাঁহাকে বৌদ্ধ-জগতের শঙ্করাচার্য্য বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। তিনি বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রবাণীসমূহের মর্ম্মার্থ নির্গলিত করতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের মৌলিকতাকে উদ্ঘাটিত করেন। সপ্তম শতাব্দীতে শ্যাম-রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার লাভ করে। তথা হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম সুমিত্রা, যাভা প্রভৃতি দেশেও ব্যাপ্ত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে জাপান সম্রাট তাইসুঙের রাজত্ব-কালে বৌদ্ধধর্ম্ম চীন হইতে জাপানে প্রচারিত হয়। কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশেও প্রায় তৎকালেই বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার লাভ করে।

আর্য্যধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিস্তার

অতীতের এক স্মরণ-দুর্ভেদ্য যুগে আধুনিক শৈত্য-ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ উত্তর মেরুদেশ যখন চিরবসন্তপ্রায় প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় সমালঙ্কৃত ছিল, তখন সেই দেশের অধিবাসী শ্বেত-ধবল, সুমনোহর দেহগঠন-সম্পন্ন আর্য্যগণ মানবের অস্তিত্ব ও সংবৃদ্ধি যাহা ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহাকে বোধে মননে ধ্যানে অধিগত করিবার জন্য অন্তরগমনশীল প্রচেষ্টায় যে সাধনাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাই ছিল আর্য্যধর্ম্মের মৌলিক ভিত্তি। উত্তর মেরুতে আর্য্য-বসতির কালকে অঙ্কে চিহ্নিত করিবার প্রয়াসমূলক গবেষণায় ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ যে চেষ্টা ও উদ্যম বিনিয়োগ করিয়াছেন, তাহার ফলে আমরা জানিতে পারি যে, উত্তর মেরুতে তুষার যুগের অভ্যাগমের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত আর্য্যগণ তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পীড়নের ভিতর দিয়া উত্তর মেরুতে তুষার যুগের সমাগম সাধিত হইলে আর্য্যগণ দক্ষিণাভিমুখে অবতরণ করেন। পারসিক ধর্ম্মগ্রন্থ আভেস্তাতেও এতৎপ্রকার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।* আর্য্যধর্ম্মও যুগযুগানুক্রমিক পরিবৃত্তিশীলতায় অধিকতর ঐশ্বর্য্যে মহিমান্বিত হওয়ায় উপক্রমে দক্ষিণাভিমুখে অবতরণশীল হয়।

বেদগ্রন্থে একাদিক্রমে ছয় মাস দিবা ও ছয় মাস রাত্রির † সমুল্লেখে—মন্ত্র-বিশেষের অর্থের সহিত শৈত্যাধিক্য, দক্ষিণদিক্‌চক্রবালে সূর্য্যোদয়, নক্ষত্রগণের উদয়াস্তরাহিত্য প্রভৃতির সামঞ্জস্যবিধানে এবং সর্ব্বোপরি বেদ ও

---

* The Avesta expressly tells us that the happy land of the Aryana Vaejo or the Aryan Paradise was located in a region where the sun shone but once a year, and that it was destroyed by the invasion of snow and ice which rendered its climate inclement and necessitated a migration south ward."—Tilak. 'Arctic Home in the Vedas.'

† অভিব্যক্তিবাদ প্রবন্ধের ১১৫ ও ১১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আভেস্তার শব্দরচনার মূলগত ঐক্যে—আভেস্তা-বিঘোষিত আর্য্যগণের উত্তর মেরুদেশে অধিবাস এবং তদ্দেশ হইতে তাহাদের নিম্নে অবতরণ করিবার কাহিনী বেদ-বিঘোষিত-কাহিনী বলিয়াও অধুনা পরিগৃহীত হইয়াছে। মোটকথা, আর্যাধর্ম্ম উত্তর মেরুদেশ হইতে উৎসারিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে প্রসর্পণশীল হইবার ভূমিকা রচনায় মেরুনিম্ন দেশে যে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহা অধুনা ঐতিহাসিক সত্যরূপেই স্বীকৃত।

আর্য্যধর্ম্ম মেরুনিম্ন দেশ প্রবাহিয়া ককেসাস্ পর্ব্বতমালার প্রস্তর ভূষিত দেশে কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া আলোক বিকীরণ করতঃ মেঘলোকপ্রিয়, শ্যামায়মান প্রকৃতি-রাজ্যের অনুসন্ধানে উরাল ও পারস্য অতিক্রমণে ধবলজ্যোতি বিকীরণশীল, প্রলম্বিত হিমগিরিমালার পশ্চিম প্রান্তদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর তাহার অন্তরতর বিকাশে যে ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়, তাহার চেতনমুখরতার পরিণামে সুবিশাল জম্বুদ্বীপ আর্য্যাবর্ত্ত অভিধায় অলঙ্কৃত হয়। আর্য্যাবর্ত্ত বৈদিক ও ঔপনিষদিক যুগদ্বয়কে প্রস্ফুটিত করতঃ আর্যাধর্ম্মের গভীরতর তত্ত্বকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া তোলে। আর্য্যাবর্ত্তের গর্ভলোকে বিশ্ব-সংস্থিতির আদিভূত-তত্ত্বের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সংসাধিত হইয়াছে, তাহা কালক্রমে পুণ্যস্মৃতি উদ্দীপক, সরযূ নদী-বিধৌত অযোধ্যা নগরীতে—দশরথ তনয় শ্রীরামচন্দ্রের রক্তমাংসসঙ্কুল আদর্শ মানবত্বে রূপঘন হইয়া আত্মপ্রকাশ করে।

আর্য্যধর্ম্মের দীপ্তিকে অমরার পটে বিন্যস্ত করিয়া শ্রীরামচন্দ্র মানবত্বের আদর্শ-প্রকাশকে যুগে যুগে রক্তমাংসমেদবিমণ্ডিত সত্তায় পরিস্ফুরণশীল করিয়া তুলিবার যে সুস্পষ্ট সূচনা প্রকাশ করিলেন, তাহা পরবর্ত্তীকালে শ্রীকৃষ্ণে বিবর্ত্তিত হইয়া আর্য্যধর্ম্মকে অধিকতর ধ্যানভেদী করিয়া তোলে।

পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র যথাকালে রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উৎকর্ষতা-অভিমুখী-গতি-নিয়ন্ত্রণে যে সুনিপুণ কুশলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা জগৎ-সংস্থিতির অন্তর-বাহিরের সামঞ্জস্যবিধানের এক সুপবিত্র দৃষ্টান্ত। শ্রীকৃষ্ণ রাজ-সিংহাসনে উপবেশন না

করিলেও তিনি তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠতম রাজনীতিবিৎ ও সমাজনীতিবিৎ বলিয়া পরিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। আর্য্যধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণের সময় পর্য্যন্ত যে ধারায় অভিব্যক্ত হইয়া চলিয়াছে, তাহার মধ্যে আর্য্য মানবের ক্রমবৃদ্ধিগত সংগঠনী-প্রতিভা-উৎসৃষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থা যথোচিত পরিপোষণ লাভ করিয়া অধিকতর স্ফুরণশীলতায় যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্বিকাশ বুদ্ধদেবের জীবন ও বাণীতে বর্দ্ধনশীলতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মানবের জন্মজন্মানুক্রমে আহরিত, পুঞ্জীভূত সংস্কারাবলীকে বিনাশ করিবার উপলক্ষে পুরুষোত্তম বুদ্ধদেব যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে মানব-জীবন-প্রবাহকে অবলোকন করিয়াছিলেন, তাহাতে আত্মা, পরমাত্মা বা ভগবান্ মুখ্যতঃ স্থানপ্রাপ্ত না হইলেও তিনি আর্য্যধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের পরিস্ফুরণে যে একটা বিপুল সম্বেগ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ এই যে, আসমুদ্রহিমাচল আর্য্য ভারত তাঁহাকেই অন্তরের অন্তঃস্থলে আসন প্রদান করিয়া তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যার নব-পর্য্যায়কে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছিল।

যে সমস্ত সমাজবিৎ ও রাষ্ট্রবিৎ বুদ্ধদেবকে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাহারা বুদ্ধদেবের প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাসের বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ গৃহস্থালীয় ধর্ম্মে যে কর্ম্ম ও পৌরুষের অভিব্যঞ্জনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বুদ্ধদেব মানবের বহুধা প্রকাশমান কৃতি-কর্ম্মের সৌধমালাকে অধিকতর গৌরবের আলোকে উদ্ভাসিত করিবার প্রেরণাই দান করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধধর্ম্ম আর্য্য ভারত হইতে অপসারিত হইয়াছে বটে, কিন্তু আর্য্যধর্ম্মের গৌরব-বিধানী-অংশে বুদ্ধদেবের ব্রাহ্মীদীপ্তি চির সমুজ্জ্বল হইয়াই দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর ভারতভূমিতে বহুকাল ব্যাপিয়া পুরুষোত্তমের আবির্ভাব সঙ্ঘটিত না হইলেও পশ্চিম এশিয়ায় পুরুষোত্তম যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবে আর্য্যধর্ম্মে এক বিপুল আলোড়ন সমুদ্ভূত হয়। পূর্ব্ব গোলার্দ্ধে বুদ্ধদেবের আর্য্যধর্ম্মের উল্লম্ফী ব্যাপ্তি সাধনের ন্যায় পুরুষোত্তম যীশুখৃষ্ট পশ্চিম

গোলার্দ্ধে আর্য্যধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের ভিতর দিয়া তাহার ব্যাপ্তি সাধন করতঃ বুদ্ধদেবের সহযোগে প্রায় অখণ্ড পৃথিবীতে আর্য্যধর্ম্মের তেজঃপুঞ্জের বিকাশ সাধন করেন। শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের বাহ্য আচরণগত নির্দ্দেশের সমতুল্যতায় বুদ্ধদেব যেরূপ, পুরুষোত্তম যীশুখৃষ্টও সেইরূপ অধিষ্ঠিত নহেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের আন্তর আচরণের যে নির্দ্দেশে আর্য্য-মানবের সমাজগত ও রাষ্ট্র-গত ব্যবহারিক চলনা উৎকর্ষতা লক্ষ্যে কালদেহে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সেই নির্দ্দেশের উৎস-মূলে পুরুষোত্তম যীশুখৃষ্ট—পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন। যে সহজ প্রীতি ও ভালবাসা মানুষের সহিত মানুষের প্রণয়কে প্রগাঢ় করিয়া তোলে, পশ্চিম গোলার্দ্ধে তাহারই বিস্তার সাধনের প্রয়োজনাধিক্যে—পুরুষোত্তম যীশুখৃষ্ট সূক্ষ্মজগতের বাস্তব অনুভূতিকে ভাষার আকারে গ্রথিত করিয়া তথাকার লোকলোচনের গোচরীভূত করতঃ তাহাদের অনভ্যস্ত বোধে জটিলতার সৃষ্টি করেন নাই। কিন্তু পুরুষোত্তম যীশুখৃষ্ট লক্ষকোটি মানবের অন্তরতর বিকাশে আর্য্যধর্ম্মকে প্রবাহিত করিয়া তাহার অবিনশ্বরতায় যে সন্দীপ্তিময়ী কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর্য্যধর্ম্মের সামগ্র্যের বোধেই প্রকৃতপক্ষে উপলব্ধিগম্য।

মহাত্মা যীশুখৃষ্টের তিরোধানের পর আর্য্যধর্ম্ম তাহার বিস্তার আনুকূল্যে নব ঐশ্বর্য্যে পরিমণ্ডিত হয়, পুরুষোত্তম হজরত মোহাম্মদের ব্রহ্মালোক উদ্ভাসিত জীবনে ও বাণীতে। পুরুষোত্তম বুদ্ধদেব ও যীশুখৃষ্টের বাহ্য আচরণ-শীলতার ব্যতিক্রমে পুরুষোত্তম হজরত মোহাম্মদ সমাজদেহে ও রাষ্ট্রদেহে আপনাকে যে আচরণ বা চলনায় অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা আর্য্যধর্ম্মের পূর্ব্বতন মূর্ত্তিমান্ বিকাশদ্বয় শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের বাহ্য আচরণ বা চলনাকে স্মৃতির মন্দিরে অমৃত-চেতনায় উজ্জীবিত করিয়া তোলে। এশিয়ার যে অংশে আর্য্যধর্ম্ম প্রগাঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই, সেই মরু-কান্তার অধ্যুষিত আরবীয় দেশে পুরুষোত্তম হজরত মোহাম্মদ আবির্ভূত হইয়া নিখিল মানবের এক বিপুল অংশকে আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত করতঃ পূর্ব্বতন পুরুষোত্তমগণের

অসমাপ্ত কার্য্যকে সমাপ্তিতে বিমণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। পুরুষোত্তম যীশুর বাণী যেরূপ বেদ, পুরুষোত্তম হজরত মোহাম্মদের ঐশ বোধ-সঞ্জাত কোরাণও বেদ; তাঁহার হাদিসও উপনিষদেরই নামান্তর। আর্য্যধর্ম্ম উৎসৃষ্ট বিভিন্ন অনুষ্ঠানাবলীকে পুরুষোত্তম হজরত মোহাম্মদ আরবীয় রূপে অভিব্যক্ত করিয়া আর্য্যধর্ম্মের অনুষ্ঠানগত মৌলিকতাকেই মহিমান্বিত করিয়া গিয়াছেন।

তৎপর আর্য্যধর্ম্মকে উৎপ্রগতিপন্নতায় সমৃদ্ধিশালী করিয়া তাহার অনির্ব্বাণ আলোক-উৎসের মূলদেশে নব পুষ্টির উৎসর্গ কল্পে যীশুখৃষ্টের বাহ্য আচরণগত ভাবাধিক্যের সাম্যে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব; দক্ষিণেশ্বরে তাঁহারই বিবর্ত্তনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভ্যুদয়। স্মরণ-দুর্ভেদ্য কাল হইতে আর্য্যধর্ম্ম যুগযুগানুগত বিবর্ত্তনের পটপরিক্রমায় সহস্র সহস্র বৎসরের ব্যাপ্তিতে কোটী কোটী মানবের অস্তিত্ব-বোধের মূলদেশে চরম সংবৃদ্ধি আহরণের যে চাহিদাকে পুঞ্জীভূত করিয়াছে, তাহারই স্থিতিশীলতাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপন ব্রাহ্মীদীপ্তি ভূষিত সত্তায় ধারণ করিয়া তাহার পরিপূরণ-নিঃস্রাবী, রক্তমাংসসঙ্কুল প্রতীভূর আবাহনী-গীতিকে বিবেকানন্দের ভিতর দিয়া মুখর করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন।

আর্য্য পুরুষোত্তমগণই শুধু দ্রষ্টার গৌরবে ভূষিত ছিলেন, তাহা নহে; নানক, কবির, মৌলানা রুম, সমস্‌তব্‌রেজ, হজরত মুসা, জরোয়াষ্ট্রায়ার, শঙ্কর, রামানুজ, নিত্যানন্দ, বিবেকানন্দ প্রভৃতিও আভ্যন্তরিক জগতের কার্য্যকারণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞান লাভ করিয়া দ্রষ্টা-পদবীতে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন ঋষি, দ্রষ্টা, তত্ত্ব-পুরুষ বা পুরুষোত্তমে শ্রদ্ধা অর্পণ করতঃ গভীরতর ও বিস্তৃততর বোধকে লাভ করিবার মানসে যুগে যুগে দেশে দেশে আর্য্য মানবসন্তান যে পরবর্ত্তী পুরুষোত্তমের আবির্ভাবকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন, রক্তমাংস-মেদবিমণ্ডিত সেই পরবর্ত্তীগণের প্রকাশই কালে কালে হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম এবং ইসলামধর্ম্মের নামান্তরে মৌলিক আর্য্যধর্ম্মকে বিশ্বপ্লাবনী ধর্ম্মে পরিণত করিয়াছে।

আর্য্যধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিস্তার

তত্ত্ব-পুরুষ বা পুরুষোত্তমগণের আবির্ভাবে তাঁহাদের আবির্ভাব-স্থলের কেন্দ্রানুবর্ত্তিতায় মানবীয় যে বিধি-ব্যবস্থা—ধর্ম্ম দর্শন সাহিত্য রাজনীতি সমাজনীতি শিল্পবাণিজ্য জ্ঞানবিজ্ঞান প্রভৃতির ভিতর দিয়া প্রকটিত হয়—সেই বিধি-ব্যবস্থা উৎকর্ষতা-লক্ষ্যে প্রবল উদ্দীপনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; প্রতি-পুরুষোত্তমের জীবন-কাহিনী-ঘটিত অতীত ইতিহাস তাহা জলদ-নিনাদেই ঘোষণা করিয়াছে। মানব-সত্তার গুপ্ত ঐশ্বর্য্যকে তাঁহারা পারম্পর্য্যানুক্রমে উদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই—আমরা দেখিয়াছি, প্রতি-পুরুষোত্তমের সহিত তাঁহার শিষ্যবর্গের প্রত্যক্ষ সংযোগ পরবর্ত্তী শিষ্যানুক্রমে বিবর্ত্তিত হইয়া লক্ষকোটী মানবে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করতঃ সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নমুখরতাকে চালনা করিয়া লইয়া গিয়াছে। আর্য্যধর্ম্ম পুরুষোত্তমের যে পারম্পর্য্যকে যুগে যুগে দেশে দেশে প্রকটায়িত করতঃ শত সহস্র বর্ষব্যাপী উৎচেতনায় আর্য্যজনগণকে চেতায়িত করিয়াছে, তাহা হইতে নিখিল-মানব-সমাজ যদি বঞ্চিত থাকিত, যদি আদি-পুরুষোত্তম স্বরূপ-প্রভায় বিকীরিত হইয়া থামিয়া যাইতেন, পুরুষোত্তম-পারম্পর্য্যকে উৎসৃষ্ট না করিতেন, তবে মানব-সমাজের অন্ধকারের মুখব্যাদান হইতে রক্ষা পাওয়ার কোনই উপায় ছিল না।

একের সহিত অপরের শতাধিক বা সহস্রাধিক বৎসরের ব্যবধানে যখনই যে দেশে যে পুরুষোত্তমের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে, সেই দেশে সেই পুরুষোত্তম আবির্ভূত হইয়া দেখিয়াছেন, সেই দেশের অধিবাসিগণ পূর্ব্বতন পুরুষোত্তম বা দ্রষ্টাপুরুষগণের বাণীসমূহ হইতে অমৃত নিঃসারিত করিতে অসমর্থ হওয়ার ফলে অজ্ঞাতসারে সর্ব্বতোমুখী অবনতিকে আমন্ত্রণ করিয়া চলিয়াছে। কেন্দ্রের সহিত প্রত্যক্ষরূপে সংযুক্ত পুরুষোত্তম তাহাদের সেই অবনতিপরায়ণতাকে প্রতিরোধ করিবার মানসে সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকে আপনার সহিত প্রত্যক্ষরূপে সংযুক্ত করিবার প্রয়াস পান। তাঁহারই সহিত প্রত্যক্ষ-সংযোগের ফলে সংযুক্ত মানবে যে সদানুকূল্য দেখা দেয়, তাহাই তাহার বংশানুক্রমিকতার গর্ভলোকে বিচরণ করিয়া মানব-সমাজকে উন্নততর অভিব্যক্তিতে প্রকাশশীল

করিয়া তোলে। মানবত্বের ক্রমোন্নত-পর্য্যায়ে অধিরোহণ করিবার পক্ষে এই যে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা বা সোপান, পুরুষোত্তমের আবির্ভাবকালে অতি অল্পসংখ্যক মানব তাহা বোধে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন বলিয়া পূর্ব্বতন পুরুষোত্তমগণ পারিপার্শ্বিক জনগণ হইতে আপন আপন কার্য্য উৎসৃজনে ও বিস্তারে ন্যূনাধিক পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু জন্মজন্মানুক্রমিক বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া বর্ত্তমান যুগের মানব চিন্তায় ও কর্ম্মে দ্রুত ঈশ্বর যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে অর্জ্জন করিয়াছেন, সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অনুকূল্যে—অতীত যুগের আর্য্য পুরুষোত্তমবর্গের অবদান ধারণ করিয়া এই যুগে পুরুষোত্তম-পারম্পর্য্যের চরম প্রকাশ মানবের চরম কল্যাণ সাধিবার তরে যদি রূপঘন হইয়া প্রকটায়িত হন, তবে মানবজীবন-ঘটিত তাঁহার মৌলিক তত্ত্ব-উদ্ঘাটনশীল কার্য্যাবলী সবিশেষ বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া দ্রুত বিস্তারশীল হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সহস্র সহস্র বৎসরের আর্য্যকৃষ্টির তপস্যা-ভিলিপ্সিকে অঙ্গে ধারণ করিয়াও আর্য্যগৌরবমেখলান্বিত পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ অধুনা যে পঙ্কময় পথে বিভ্রষ্ট হইয়া শোক-তাপ-বেদনায় জর্জ্জরিত হওতঃ সত্যের অভিদীপ্তিকে পুনঃ প্রজ্জ্বলিত করিতে সমর্থ হইতেছে না, দেশের সহিত দেশের সংগ্রাম-বিরোধকে দূরীভূত করিয়া নিখিল জগতে নব প্রাণ, নব চেতনার উৎসৃজন করতঃ আপনাকে জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান-পৌরুষ-বীর্য্যের কেন্দ্রায়িত উৎসে পুনঃ রূপান্তরিত করিতে পারিতেছে না, তাহাকে সেই পথ হইতে উদ্ধার করিয়া অমৃতের পথে পরিচালিত করিবার প্রয়োজনীয়তা যখন আমাদের নীরব, নিঃসঙ্গ চিন্তার বিষয়ীভূত হয়, তখন ভারতভূমিতে নব পুরুষোত্তমের শুভ্র প্রকাশ আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, যথাবিন্যস্তি প্রাপ্ত মননে ও আকুল প্রাণে প্রার্থনা করি।

যুগসন্ধিতে ভগবান্ স্বয়ং নররূপ ধারণ করিয়া পুরুষোত্তমরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এই বাণী শুধু শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠোচ্চারিত বাণী নহে; তাহা আর্য্যধর্ম্মের মৌলিক বাণী। গীতাগ্রন্থের ন্যায় ত্রিপিটক, বাইবেল,

কোরাণেও এই জাতীয় বাণী সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। আর্য্য-ইতিহাসের বিলম্বিত পটে এই বাণীর সার্থক অভিব্যক্তির পরিচয় আমরা কয়েকবার লাভ করিয়াছি।

তাই, অখণ্ড মানব-সমাজে আর্য্যধর্ম্মের অন্তরতম তত্ত্ব উদঘাটনশীল নব বিস্তারের ঐকান্তিক কামনায় আমরা আজ আত্ম ভুলিয়া তাঁহারই জাগরণী-গীতি গাহিতেছি। পুণ্যভূমি ভারতভূমিতে পূর্ণতম সচ্চিদানন্দের বিমলতম জ্যোতিতে তাঁহার ভবভয়হারী আবির্ভাব কোটী কোটী মানবে প্রকটিত হউক। নূতন আশায়, নূতন ভাষায়, নূতন কর্ম্মের মঙ্গল প্রবর্ত্তনায় নিখিল জগৎ পরিপূরিত হউক। তাঁহারই আবির্ভাব-কেন্দ্রে বিশ্ব-মানব-সভার মৌলিক কেন্দ্র উৎসৃষ্টি লাভ করতঃ বাঁচার অধিকারের সম-প্রগতিতে নিখিল মানবের অন্তরে প্রখরতম সংবুদ্ধি-বোধের হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেউক। জগতে ক্রম-বিকশিত অমৃত-যুগের অভ্যুদয়ের সূচনা হউক।

তাই, আমরা আজ গাহিতেছি—

"কোথা তুমি যুগ-সূর্য্য, ধ্বনিয়া অভয় তূর্য্য—
এস নেমে সার্ব্বভৌম, হে শ্রেষ্ঠ মানব!
ধর্ম্ম আজি গ্লানিভরা, নির্য্যাতিত নরনারী,
বিজ্ঞানের যজ্ঞভূমে উদগ্র দানব।
তব অভ্যুত্থান লাগি যুগ যুগান্তর বীর,
অধীর ধরণী ধৃত, ব্যগ্র প্রতিক্ষণ,
এস শৌরি শার্ঙ্গপাণি, নির্ঘোষিয়া পাঞ্চজন্য;
বিশ্বম্ভর, চতুর্ভুজে ধরো সুদর্শন!

* *
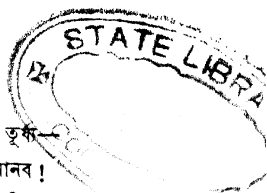
বর্ব্বরের বজ্রবাণ সমুদ্যত ঊর্দ্ধলোকে
মৃত্যু হানে বিষ-বাষ্প নভোবক্ষ ভেদি'
দুর্ব্বার সংহার বৃত্তি কীর্ত্তি নাশে মহত্ত্বের
ধ্বংস মাগে মনু-বংশ নিজ কণ্ঠ ছেদি' !
হিংসা-লেলিহবহ্নী দগ্ধ করে চারিদিক
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত অগ্নিকণা,
নাশ' এই নিষ্ঠুরতা গদাঘাতে গদাধর,
ভস্ম কর ভুজঙ্গের কূট-চক্র-ফণা ।

*　　*

আবির্ভূত হও বিষ্ণু ! বসুধার ব্যভিচার,
দুর্নীতির দুঃশাসন বিচূর্ণিত করি,
আলস্য-জড়তা-দৈন্য, দুর্ব্বলের অক্ষমতা,
ভীরুতার ভয়ক্লেদ দূরে অপহরি' ।
পৌরুষের পঞ্চতপে জাগাও ক্ষত্রিয় বীর্য্য
শৌর্য্যহীন সৌরগ্রহ মৃত্তিকার বুকে,
শুনাও উদাত্ত কণ্ঠে মৃত্যুভয়-হর-গীতা
প্রাণদীপ্তি এনে দাও ম্লান মূক মুখে

*　　*

সত্য শিব সুন্দরের স্পর্শে হোক চিত্ত শুচি'
দাও মুছি মালিন্যের রুক্ষ ধূলি জাল,
মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য স্তব্ধ হোক মর্ত্ত্যলোকে—
অমৃতের মহামন্ত্র দিক মহাকাল ।
সাম্য মৈত্রী অভেদের দীক্ষা দাও জনে জনে ।
খণ্ড ছিন্ন ভূমণ্ডলে হে পার্থ সারথী !
বিসর্জ্জিয়া তুচ্ছ স্বার্থ সঙ্কীর্ণ স্বাজাত্যবোধ
শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্তিলাভে হোক বিশ্ব ব্রতী !" *

---

* ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের শারদীয় সংখ্যা 'পাহাবা'তে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব 'বাসুদেব' শীর্ষক কবিতায় ইহা লিখিয়াছিলেন।

সৃষ্টি-কেন্দ্র

(১)

অব্যক্ত তাহার অরূপ কেন্দ্র-গর্ভ হইতে রূপের স্ফুলিঙ্গ নির্গলিত করিয়া দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া দিয়াছে। উহারা কারণ-কেন্দ্রের এক একটি বিজৃম্ভন (shooting energy) রূপে ভীমগতিতে ঘূর্ণায়মান হইয়া চলিয়াছে, বহির্ম্মুখে—পরিধির দিকে। এক একটি বিজৃম্ভন সেই মহা বিরাট কারণ-সমুদ্রের এক একটি বুদ্‌বুদ্‌। এই বুদ্‌বুদের বিশালতা মানব-মস্তিষ্কের কল্পনায় ধারণা করাও এক অসম্ভব ব্যাপার। মহাকারণের বিজৃম্ভিত সত্তায় থাকে দুইটি গতি; একটি গতিতে উহা নিজেই ঘূর্ণায়মান (moving spiro-elliptically), আর একটি গতিতে উহা চলিয়াছে বহির্ম্মুখে। কোটী কোটী বৎসর বহির্ম্মুখে ধাবিত হওয়ার পর ইহা সূক্ষ্ম বাষ্পাকারে এবং আরও কোটী কোটী বৎসর পর বাষ্পাকারে মহাজ্যোতিরূপে উদ্ভাসিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ ইহাদের এক একটির নামাকরণ করিয়াছেন—নেবুলা (Nebula), ভারতীয় গণিত-জ্যোতিষিবৃন্দ নামাকরণ করিয়াছেন—নীহারিকা।

আবর্ত্তনশীল এই নীহারিকার স্থানে স্থানে জ্যোতিঃপুঞ্জ ঘনীভূত হইয়া এক একটি মহাসূর্য্যের উৎপত্তি করিয়া থাকে। লক্ষ-কোটী বৎসর পরে উহারা বহু কোটী নক্ষত্রে পর্য্যবসিত হইয়া উঠে। তখন উহাদের নাম হয়, Star Cluster Nebula. এক একটি নীহারিকাকে এক একটি ব্রহ্মাণ্ডরূপে অভিহিত করা যাইতে পারে। আর এই প্রকার কোটী কোটী নীহারিকার সমবায়েই এই মহাবিশ্ব।

দার্শনিক ক্যাণ্ট বলেন, "আমাদের এই সৌর জগৎ যাহার বিশালতা কল্পনায় ধারণা করিতেই আমরা দিশাহারা হইয়া যাই, ইহা ছায়াপথ নীহারিকার (milky way Nebula) একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র;

এত ক্ষুদ্র—যেন সমস্ত পৃথিবীর তুলনায় একটি বালিকণা।” জেম্‌স জীন্‌স বলিয়াছেন, “আমাদের এই পৃথিবীর মত লক্ষ লক্ষ পৃথিবী নীহারিকার এক একটি নক্ষত্র ধারণ করিতে পারে। নীহারিকার অঙ্গে এরূপ বিরাট নক্ষত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার ভিতরে কোটী কোটী পৃথিবী স্থান লাভ করিতে পারে।”

এই নিখিল বিশ্ব পরিমিত কি অপরিমিত, তদ্বিষয়ে দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কাহারও কাহারও অভিমত এই যে, বিশ্ব অসীমাকৃতিবিশিষ্ট হইলেও বাস্তবতায় ইহা সসীম। আবার কাহারও কাহারও অভিমত এই প্রকার যে, নীহারিকাগুলি যখন প্রতিনিয়তই পশ্চাৎ অভিমুখে ধাবমান হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, তখন ইহাকে কোন প্রকারেই সসীম বলা যাইতে পারে না—ইহা অসীম। প্রতি মুহূর্ত্ত ব্যাপিয়া যাহা দ্রুত হইতে দ্রুততর গতিতে সীমাহীন লক্ষ্য অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার সীমা কোথায়? আধুনিক গণিত-জ্যোতির্বিদগণের সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় গ্রহ-নক্ষত্র ও সূর্য্যের গতিপথ বৃত্তাভাস পথে গোলাকার। সুতরাং ইহাই বলিতে হয়, কারণ-সমুদ্র হইতে বিনির্গত আলোকপুঞ্জ বা নীহারিকা সমুদয় বৃত্তাভাস পথে বহুকাল চলিয়া আবার সেই কারণেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। পৃথিবীর স্থান-বিশেষ হইতে ক্রমাগত একই দিকে গমন করিলে যেমন পুনরায় সেই স্থানেই প্রত্যাগমন করিতে হয়, সেইরূপ নীহারিকা সমুদয়ও বৃত্তাভাস পথে ক্রমাগত চলিয়া বহু কোটী বৎসর পরে আবার সেই মহাকারণেই আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

আইন্‌ষ্টাইন বলেন, “কোন বস্তুর গতিবেগ আলোকের গতির সমপর্য্যায়ে উন্নীত হইলে তাহার তদ্‌রূপাত্মক অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নহে।” আলোকের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। অসীমের পথে চলিতে চলিতে নীহারিকার গতিবেগ ক্রমবৰ্দ্ধিত হইয়া যখন আলোকের গতির সমতুল্য হইবে, তখন উহা ইলেক্ট্রণ, ক্রমে তাহারও অতীত সত্তায় রূপান্তর লাভ করিয়া অরূপ হইয়া যাইবে।

বর্ত্তমান সময়ের বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সহায়তায় দশ সহস্রেরও অধিক নীহারিকার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি এত দূরে যে, উহারা প্রতি সেকেণ্ডে ৫০০০ মাইল বেগে অসীমের দিকে প্রধাবিত হইয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমানে আমেরিকায় ২০০" ইঞ্চি ব্যাসের যে সুবৃহৎ দূরবীক্ষণ প্রস্তুত হইতেছে, তাহা দ্বারা ৩২ কোটী আলোক-বর্ষ (৫৮৭ সহস্র কোটী মাইলে এক আলোকবর্ষ) দূরের নীহারিকাগুলিকেও পর্যাবেক্ষণ করা সম্ভব হইবে।

কিন্তু কোথায় সেই কেন্দ্র যাহার বক্ষ হইতে বিঘূর্ণিত বেগে ও দ্রুত ব্যঞ্জনায় রূপের তরঙ্গলহরী ছুটিয়া চলিয়াছে? মানুষ চিরদিন তাহাকে 'অবাঙ্‌মানসগোচরম্' রূপে অভিহিত করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে। শাস্ত্রকারও বলিয়াছেন,

"ন প্রবচনেন লভ্যঃ
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"

কে বলিবে, স্থিতির আদি পটভূমিকার কোন্ গহন-দুর্ভেদ্য স্থানে, কি কি উপকরণে বিভূষিত সেই কেন্দ্র! বায়রণ যথার্থই লিখিয়া গিয়াছেন,

"If from great nature's
Or our own abyss
Of thought we could but
Snatch a certaint ,
Perhaps mankind migh
Find the path they miss—"

(২)

বিজ্ঞানময়ী বিংশ শতাব্দী। অঘটনঘটনপটিয়সী প্রকৃতির বিচিত্র রহস্যে অভিজ্ঞান লাভ করিবার দুর্নিবার ক্ষুধায় বিংশ শতাব্দীর স্বতঃ-অনুসন্ধানপ্রিয় বৈজ্ঞানিকবৃন্দ প্রপীড়িত। গেলিলিও, নিউটন, ফ্যারাডে হইতে আরম্ভ করিয়া

রাদারফোর্ড, লজ, আনষ্টাইন প্রভৃতি প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকবৃন্দ জ্ঞানসমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া মাত্র উপলখণ্ডই সংগ্রহ করিয়াছেন। নব্য বিজ্ঞানের ভিত্তি—

আপেক্ষিক তত্ত্ব (Theory of Relativity)

সম্ভাব্যতার তত্ত্ব (Theory of Probability)

অনির্দ্দেশিতার তত্ত্ব (Theory of Indeterminacy) অব্যক্তের কেন্দ্র-গর্ভ হইতে নির্গলিত নিখিল বিশ্বের সমষ্টিগত রহস্যের কতখানি উদ্ঘাটিত করিতে সক্ষম হইয়াছে? ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে আঙ্কিক জগতের দুর্ভেদ্য দুর্গে, বস্তুর প্রাণস্বরূপ ইলেকট্রণ নিশ্চিত হইয়া বিরাজমান। বৈজ্ঞানিকের বজ্রস্পর্শরূপ বিড়ম্বনা তাহাকে যতখানি সহিতে হইয়াছে, ততখানির অধিক সম্বন্ধে ইলেকট্রণ আপাততঃ নিরুদ্বিগ্ন। তাহারই অনন্ত কোটী জ্ঞাতি-কুটুম্ব কোটী কোটী বৎসরে একত্রীকৃত হইয়া আমাদের এই রূপরসগন্ধময় পৃথিবীর মত লক্ষ লক্ষ পৃথিবী ধারণ করিবার সহ-শক্তিতে, সুনীল নভোমণ্ডলে প্রচ্ছন্নস্ত থাকিয়া আমাদের সহিত যে রহস্য করিতেছে, তাহারই বা মর্ম্ম-ভেদ হইয়াছে কতটুকু? ইহা স্বীকার্য্য যে, লক্ষ-কোটী আলোকবর্ষ দূরের, প্রতিনিয়ত পশ্চাৎ অভিমুখে ধাবমান নীহারিকাপুঞ্জকেও বৈজ্ঞানিকবৃন্দ দূরবীক্ষণের চক্ষু লাগাইয়া সন্দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু—

"একই উম্বরু বৃক্ষে লাগে কোটী ফলে।
কোটী যে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে॥
তাতে ভাসে মায়া লঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।
গড়খাইতে ভাসে যেন পূর্ণ রাইভাণ্ড॥"
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আয় যায়।
পুরুষ নিঃশ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায়॥"—বলিয়া সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে উষর বাংলায় আবির্ভূত পরম বৈজ্ঞানিক শ্রীচৈতন্যদেব বাস্তব দর্শনের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া কম্বুকণ্ঠে যে উক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ উক্তির সম্ভাব্যতা আধুনিক যুগে অকল্পনীয় নহে কি?

শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

"উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।"

—ব্রহ্মই জীব, জগৎ এবং বিধাতারূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের অগ্নিময় উক্তি এইরূপ—

"ব্রহ্ম হইতে জন্মে জীব ব্রহ্মায়ে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যাই লয়॥
ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁহা হইতে হয়।
স্থূলসূক্ষ্ম জগতের তিঁহো সমাশ্রয়॥"

বিশ্বপ্রকাশের ক্রমাভিব্যক্তি সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত হইয়াছে,—

"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্॥"

—অর্থাৎ বৃহতের কেন্দ্রগর্ভে অধিষ্ঠিত ব্রহ্ম হইতে ক্রমিক বিভেদে

অন্ন—(জগৎ উৎপত্তির বীজ)

প্রাণ—(সৃষ্টির প্রথম প্রকাশরূপ মহত্তত্ত্ব)

মন—(অন্তকরণ-বৃত্তির বিবিধ ক্রিয়া)

সত্য—(ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত বা সূক্ষ্ম বাষ্প)

লোক—(ব্রহ্মাণ্ড সমুদয়, নীহারিকা বা Nebula)

কর্ম্ম—(সহজাত সংস্কার) এবং অমৃত—(সংস্কারোৎপন্ন কর্ম্মফল) ব্যাবর্ত্ত বৃত্তাভাসে সমুৎপন্ন হইয়াছে। ভাষান্তরে অব্যক্ত বা কারণ-কেন্দ্র বিবর্ত্তনবাদের ভিত্তিতেই সূক্ষ্ম ও স্থূলে, জীবন ও জীবে নিজেকে উৎসৃষ্ট করিয়াছেন। অর্থাৎ দ্রষ্টাপুরুষের দর্শন পাল্লার বাহিরে যে অব্যক্ত 'অবাঙ্মানসগোচরম্' রূপে বিরাজমান, তিনি তাঁহার সর্ব্ব সম্পদের

ব্যক্ততার ভিতর দিয়া জগৎ-রচনায় আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব জীব বলিতে আমরা নামরূপে অভিব্যক্ত, কেন্দ্র-চৈতন্যাংশ বলিয়া বুঝিব না কি?

তাই, কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে বলিয়াছেন :—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াং স্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়-মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥"

তাৎপর্য্য—মনীষিগণ আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে প্রগ্রহ (লাগাম), ইন্দ্রিয়সমূহকে হয় (রথের বাহন), বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়গণের বিচরণস্থল এবং শরীর ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা বা অনুভবকারী রূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন।

ইমার্সনের এতৎ-সম্পর্কিত উক্তিও প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,

"Man himself is nothing but Universal Spirit present in a material organism. Man is of the Divine, lives in the Divine, and in every power he manifests, he shows the Divine life within. The soul is not a separate individuality but part and parcel of God."

তাৎপর্য্য—মানুষ তাহার যান্ত্রিক আবেষ্টনের ভিতর বিশ্বাত্মার প্রতীক স্বরূপ। মানুষ পরম দৈবতের সন্তান, তাঁহাতেই সে অধিষ্ঠিত এবং সর্ব্বশক্তিতে সে তাঁহাকেই আপনার ভিতরে প্রকাশ করিতেছে। আত্মা ব্যষ্টি-বিকাশ মাত্র নহে, উহা পরম দৈবতেরই প্রত্যক্ষ অংশ-বিশেষ।

তাই বলিতে হয়, যাঁহার বক্ষ হইতে ঘূর্ণায়মান বেগে ও ত্বরিৎ-ব্যঞ্জনায় রূপের তরঙ্গলহরী দিগ্‌দিগন্তে বিচ্ছুরিত হইয়া মহাজ্যোতি-রূপ অনন্ত সংখ্যাবিশিষ্ট খণ্ড খণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে পর্য্যবসিত হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক যাঁহার অনন্ত

ঐশ্বর্য্যের তত্বভেদে, তরঙ্গমেখলান্বিত মহাসমুদ্রের তীর-প্রান্তবর্ত্তী বালুকণা সংগ্রহেই কৃতকর্ম্মসাফল্য আয়ত্ত করিয়াছেন, স্থিতির আদি পটভূমিকায় অধিষ্ঠিত সেই কারণস্বরূপ কি ওতঃপ্রোতভাবে আমাদের সহিত সংমিশ্রিত নহেন ?

পরম দ্রষ্টা-বৈজ্ঞানিক শ্রীচৈতন্যদেব কৃপালু কণ্ঠে অমৃত বর্ষণ করিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ (Guide) প্রসাদে পায় ভক্তি-লতা-বীজ ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণকীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়ে বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড (Material world) ভেদী যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদী পরব্যোম (Mental world) পায় ॥
তবে যায় তদুপরি গোলক (Spiritual world) বৃন্দাবন।
'সৃষ্টিকেন্দ্র' কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥"

ধর্ম্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র

(১)

গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের ভিতর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন :—

শিষ্য—"ধর্ম্মের ফল কি সুখ ?"

গুরু—"নয় তো কি ধর্ম্মের ফল দুঃখ ? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে আমি জগতের সমস্ত লোককে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিতাম।"

শিষ্য—"ধর্ম্মের ফল পরকালে সুখ হইতে পারে, কিন্তু ইহকালেও কি তাই ?"

গুরু—"তবে বুঝাইলাম কি ? ধর্ম্মের ফল ইহকালেও সুখ, যদি পরকাল থাকে, তবে পরকালেও সুখ। ধর্ম্ম সুখের একমাত্র উপায়। যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ—না থাকিলে মানুষ মানুষ নয়, তাহাই মানুষের ধর্ম্ম।"

শিষ্য—"তাহার নাম কি ?"

গুরু—"মনুষ্যত্ব।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, মনুষ্যত্বই ধর্ম্ম। এই মনুষ্যত্ব বলিতে আমরা কি বুঝি ? যাহা যাহা লইয়া মানুষ, তাহার সম্যক্ অনুশীলনের ফলে তাহার যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ হয়, তাহাই তাহার মনুষ্যত্ব। মানুষ কতকগুলি সমষ্টিভূত ভাবের জীবন্ত প্রতীক ব্যতীত আর কিছু নহে। ঐ ভাবরাজিকে বিশ্লেষণ করিয়া মানব-সত্তার ভিতরের দিকে উল্‌টিয়া চলিলে দেখা যায়, মানুষের চৈতন্য-সত্তা ভৌম, জলীয়, তৈজস, বায়বীয় ও আকাশীয়—এই পঞ্চতত্ত্বের সমবায়ের ভিতর গ্রথিত। আরও ভিতরের দিকে চলিলে মানুষের চৈতন্য-সত্তাকে আরও সূক্ষ্মতর বস্তুর সহিত সংমিশ্রিত দেখা যায়। এমনি করিয়া ঐ সূক্ষ্মতর ভূমি হইতে ক্রমে ক্রমে আরও আরও সূক্ষ্মতর ভূমিতে অনুপ্রবেশ করিলে মূল কারণের সন্নিহিত প্রদেশে পাওয়া যায়, মানুষের সত্যিকারের অহং। এই অহংএর স্বপ্ন, সুষুপ্তি অর্থাৎ উচ্চতর,

উচ্চতম অবস্থা আছে যাহা মানুষের চরম মনুষ্যত্ব। সুতরাং দেখা যায়, মনুষ্যত্বের ক্রম আছে। যে স্তরের মনুষ্যত্বই আমরা অর্জ্জন করি না কেন, আমাদের রক্তমাংসমেদমণ্ডিত এই দেহের ভিতরেই হয় তাহার তদনুপাতিক প্রকাশ। সুতরাং মনুষ্যত্বের প্রকাশমান অবস্থাটিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই আমরা সত্যিকারের ধার্ম্মিক পদবাচ্যতা লাভ করিতে পারি। এই প্রকাশমানতা ক্রমিকরূপে যত উচ্চস্তরের হইবে, আমাদের ধার্ম্মিকতাও তত গভীর হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র মানুষের যত প্রকার শক্তি থাকিতে পারে, তৎসমুদয়কে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী, চিত্তরঞ্জিনী এবং বলিয়াছেন যে, ঐ চতুর্ব্বিধ শক্তি বা বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন, স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব অর্থাৎ মানুষের ধর্ম্ম।

"যাহা ধরিয়া আছে, তাহাই ধর্ম্ম, যাহা মানবের ব্যষ্টিগত জীবনকে ধরিয়া আছে ও আরও উর্দ্ধে উঠিয়া যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া আছে, তাহাই ধর্ম্ম" (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)। বিশ্বের স্থিতি বা আমাদের অস্তিবৃদ্ধি যাহা ধারণ করিয়া আছে, তাহাই যদি ধর্ম্ম হয়, তবে আমরা হিন্দু হইয়াও ধার্ম্মিক মুসলমান হইতে পারি, মুসলমান হইয়াও ধার্ম্মিক হিন্দু, বৌদ্ধ বা খৃষ্টান হইতে পারি। অথচ এই ধর্ম্ম লইয়াই কত হিংসা, কত বিদ্বেষ ফেনায়িত হইয়া উঠিয়া পৃথিবীখানাকে উৎকর্ষপ্রাণ মনুষ্যের বাসের একান্ত অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। এই ধর্ম্ম লইয়া বীভৎস দ্বন্দ্বের মূলেই আছে, আমাদের বিকট অজানা। তথাকথিত বিশুদ্ধ রাজনীতি লইয়াই যাহাদের কারবার, তাহারা বলেন যে, ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম-সংস্পৃষ্ট বিষয়ে তাহারা সবিশেষ আকৃষ্ট নহেন। আবার ক্ষর-অক্ষর, ব্রহ্ম-পরব্রহ্ম, সবিশেষ নির্ব্বিশেষ, অবিদ্যা-মায়া প্রভৃতি শব্দ সম্বলিত তথাকথিত ধর্ম্ম লইয়াই যাহারা জীবন পথে চলিতেছেন, তাহারা ঐ রাজনীতিকে পরিহার করিয়া চলিতেই ভালবাসেন। উভয়ের চিন্তাধারায় সামঞ্জস্য সাধিত হয় না। অথচ জীবন-চলনায় কাহাকেও ফেলিয়া কাহারও

চলিবার উপায় নাই। অনিবার্য্য কারণে একের উপর অপরের নির্ভরশীলতা আছেই। আমাদের প্রত্যেকের সত্তার ভিতরে এমন একটি মহামহিমময় স্থান আছে, যে স্থানে আমরা সর্ব্ব বিভেদ হইতে মুক্ত হইয়া পরম একত্বে সমাসীন। আমাদের রক্ত-মাংসের দেহে আমরা বহু প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করি; কিন্তু অনুভূতির রকমে কোন তফাৎ আছে কি? তাহা যদি না থাকে, তবে আমাদের সকল সুখ-দুঃখের উৎস একটাই বলিতে হইবে। আমরা বিভিন্ন মতবাদ লইয়া পৃথিবীরূপ রঙ্গমঞ্চে যে কর্ম্ম-কোলাহলময় রঙ্গ করিতেছি, ঐ কথাটা তাহার সম্পর্কেও খাটে। আমরা গণতন্ত্রী, রাজতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী, ফ্যাসিষ্টতন্ত্রী, সাম্যতন্ত্রী এবং আরও কত কি তন্ত্রীবিশিষ্ট হইয়া অখণ্ড মানব জাতির ভিতরে এমন একটা মত-বিষমতাপূর্ণ ভয়াবহ অবস্থার সৃজন করিয়া তুলিয়াছি, যাহার ফলে আমাদের সমষ্টিগত কল্যাণ, বৃদ্ধি ও উন্নয়ন কোন্ তন্ত্রের ভিতর দিয়া আসিবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; অথচ সকল তন্ত্রের উৎস একটাই। যাহা-কিছু লইয়া আমরা মানুষ, তাহার সবই আমাদের ত্রিতলবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ দালানে যথাবিহিত বিন্যস্ত। কারণে-অকারণে হাটে বা বেচাকেনার ক্ষেত্রে যেরূপ গণ্ডগোল অনিবার্য্য, সেইরূপ আমাদের ঐ চৈতন্যরূপ দালানের একতল রূপ হাটে—আমরা কস্মিন্‌কালেও আমাদের মতের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিব না; আমাদের সকল সাধু প্রয়াস গণ্ডগোলে যাইয়াই পর্য্যবসিত হইবে। অতএব আমাদের একতল অতিক্রম করিয়া দ্বিতলে আরোহণ করা প্রয়োজন। সেথায় আরোহণ করিতে পারিলেই আমাদের শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী—এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের একটা রকম আসিবে, আমরা মনুষ্যত্বের একটা ক্রমে যাইয়া পৌঁছিতে পারিব।

গুরু বলিতেছেন, "আধুনিক শিক্ষা-প্রণালীর ভ্রম এই যে, সকলকে এক এক বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ক হইতে হইবে—সকলের সকল বিষয় শিখিবার প্রয়োজন নাই। যে পারে, সে ভাল করিয়া বিজ্ঞান শিখুক, তাহার

সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। যে পারে, সে সাহিত্য উত্তম করিয়া শিখুক, তাহার বিজ্ঞানের প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানসিক সকল বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইল কৈ? সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত মানুষ পাইব কোথায়? যে বিজ্ঞানকুশলী কিন্তু কাব্যরসাদির আস্বাদনে বঞ্চিত, সে আধখানা মানুষ; অথবা যে সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের রসগ্রাহী কিন্তু জগতের অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বে অজ্ঞ, সেও আধখানা মানুষ। উভয়েই মনুষ্যত্ববিহীন; সুতরাং ধর্ম্মে পতিত।"

শিষ্য—"আপনার ধর্ম্ম ব্যাখ্যা অনুসারে সকলকেই সকল বিষয় শিখিতে হইবে।"

গুরু—"না, ঠিক তা নয়। সকলকেই সকল মনোবৃত্তিগুলি সংকর্ষিত করিতে হইবে।"

ভাবার্থ এই যে, মনোবৃত্তির সংকর্ষণের ফলে সকলে যদি সকল বিষয় শিখিতে পারে, শিখুক। আমরাও তাহাই বলি। শিখিবে কে? শিখিবে ত মন? মন যদি সর্ব্ব-সমাহারপ্রাপ্ত হয়, তবে হিন্দুস্থানী শিখিব না বলিয়া সত্যাগ্রহ করিবার প্রয়োজন হয় না, ধ্বন্যাত্মক ও ভাবাত্মক মন্ত্রে পার্থক্য কি, তাহা জানাও নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয় না, অর্থাৎ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজাতীয় বলিয়া কিছু থাকে না। সকলই সকলের পক্ষে শিক্ষনীয় হয়। আমাদের মন ঠিক যেন রেডিও যন্ত্র। রেডিও যন্ত্রের মত তাহার আহরণ-শক্তি ও বিকীরণ-শক্তি দুইই আছে। কিন্তু আমাদের কেন্দ্রে একানুরক্তির অভাবে আমাদের মন তাহার প্রকৃত শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। আমাদের প্রতি মহা-আমি, প্রতি বিরাট-আমির অণুমাত্র জ্ঞান আয়ত্ত করিয়াই যে তুষ্টি-বোধ, এই সকরুণ অবস্থা যে দিন আমাদের বোধের সীমানা হইতে অপসারিত হইয়া আমাদের কেন্দ্রানুরক্তির উদ্বোধন করিবে, সে দিন আমাদের শিক্ষনীয় বিষয়ের অধ্যয়ন সুখ-স্মৃতি বা প্রণয়-কথার জাগরণ বলিয়া বোধ হইবে।

গুরু বলিতেছেন, "যাহারা মনুষ্য-জাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট, তাহারা চেষ্টা করিলে যে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবেন না, এমন কথা স্বীকার করা যায় না। আমার এখনও ভরসা আছে, যুগান্তরে যখন মনুষ্য-জাতি প্রকৃত উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মনুষ্যই প্রকৃত আদর্শ অনুযায়ী হইবে। সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজগণের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, সেই রাজগণ সম্পূর্ণরূপে ঐ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই বর্ণনাগুলি অনেকটা ইতিহাস-পুরাণাদির রচয়িতৃগণের কপোলকল্পিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ রাজগুণ-বর্ণনা যেখানে সাধারণ, সেই স্থলে ইহাই অনুমেয় যে, একটা আদর্শ সেকালের ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়গণের সম্মুখে ছিল। আমিও সেরূপ আদর্শ তোমার সম্মুখে স্থাপন করিতেছি।"

শিষ্য—"এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব?"

গুরু—"ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা অর্থাৎ যাঁহাদের গুণ ও বিদ্যা দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বলিয়া বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন।"

ব্রহ্মজ্ঞ যিনি তিনি ব্রহ্ম। "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মএব ভবতি।" দয়ামায়া, কামক্রোধ প্রভৃতি আমাদের ভিতর অভিব্যক্ত না হইলে যেমন উহাদের প্রকৃত স্বরূপ আমরা বুঝিতে পারি না, সেইরূপ ঈশ্বরত্ব মানব-বিশেষে অভিব্যক্ত না হইলে আমরা ঈশ্বরত্বের ধারণা করিতে পারি না। বালককে তাহার অবিকশিত বৃত্তির বিষয়ে জ্ঞান প্রদান করা যেরূপ, আদর্শকে বাদ দিয়া ঈশ্বর-তত্ত্বকে বোধ করাও সেইরূপ। অথর্ব্ববেদ বলিয়াছেন, "সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং"—অর্থাৎ তোমরা সকলে সম-অন্তঃকরণবিশিষ্ট হও। কিন্তু আদর্শকে বাদ দিয়া আমাদের সম-অন্তঃকরণবিশিষ্ট হওয়ার কোন পথ নাই।

(২)

শিষ্য—"গণিত বা ব্যায়াম-শিক্ষা যদি ধর্ম্মের শাসনাধীন হইল, তবে ধর্ম্ম ছাড়া কি ?"

গুরু—"কিছুই ধর্ম্ম ছাড়া নহে। ধর্ম্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্য-জীবনের সর্ব্বাংশই ধর্ম্ম কর্ত্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। হিন্দুর কাছে ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ লইয়াই ধর্ম্ম।"

বর্ত্তমান কালে ধর্ম্ম লইয়া এক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। রাশিয়া হইতে নাকি ধর্ম্মকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী প্রভৃতি পাশ্চাত্যের অপরাপর দেশেও নাকি ধর্ম্মকে একমাত্র চার্চ্চের পোষাকী বস্তুতে পরিণত করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে কেহ বলিতেছেন, ধর্ম্ম কুসংস্কার, কেহ বলিতেছেন সুসংস্কার, আবার কেহ কেহ ধর্ম্মকে মাথা ফাটাফাটি করিবার কৌশল হিসাবেও ব্যবহার করিতেছেন। বস্তুতঃ, ধর্ম্ম বস্তুটি কি ?

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কারণ বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভ-সিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥"

তাৎপর্য্য—শ্রীরাধার যে প্রেমে আমি মুগ্ধ হই, সেই প্রেম কী বস্তু ? শ্রীরাধা এই প্রেমে আমার যে মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্য্য কিরূপ ? আমার মাধুর্য্য অনুভবজনিত শ্রীরাধার যে সুখানুভূতি, সেই সুখই বা কেমন ? এই ত্রিবিধ ভাবে বিভাবিত কৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে আবির্ভূত হইয়াছেন।

সৃষ্টি-কেন্দ্রের এই রাধারূপ হ্লাদিনী শক্তিই আনন্দ। তাহার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে, চৈতন্য। এই আনন্দ ও চৈতন্য আদি স্থিতিতে

বর্ত্তমান থাকিয়া নিখিল বিশ্বকে ধারণ করতঃ চালনা করিতেছে। এই জন্যই মনীষিগণ বলেন—যাহা আমাদের অস্তিত্ব এবং স্থূল জগৎ ও সূক্ষ্ম জগতের ভিতর দিয়া আমাদের কেন্দ্রাভিমুখী গতি বা সংবৃদ্ধি ধারণ করিয়া রাখে, তাহাই ধর্ম্ম। অতএব ধরিয়া রাখা এবং বৃদ্ধির মুখে ঠেলিয়া দেওয়াই যদি ধর্ম্ম হয় এবং রাশিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশ যদি অস্তিত্ব রক্ষায় প্রয়াসশীল এবং বস্তুজগতের বিচারেও যদি ক্রমোন্নতিশীল দেশ হয়, তবে ইহা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, রাশিয়া হইতে ধর্ম্মকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে বা ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ধর্ম্মকে চার্চ্চের পোষাকী বস্তুতে পরিণত করা হইয়াছে? ধর্ম্মের নামে কতকগুলি অনুষ্ঠান বা কতকগুলি আচারব্যবহারই ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ নহে। কি প্রকারে আমাদের অবস্থিতি ক্রম-দৃঢ়ীকৃত হইতে পারে, কেমন করিয়া আমাদের মনুষ্যত্ব ক্রম-প্রকাশশীল হইয়া উঠিতে পারে, তাহার নিয়মগুলিকে আমরা যত অধিক পরিমাণে জানায় আয়ত্ত করিয়া কার্য্যে সক্রিয় করিয়া তুলিতে পারিব, আমরা তত বেশী ধার্ম্মিক হইবে। ধর্ম্মের এই সত্য ও সনাতন বোধ-ভঙ্গিমায় মনুষ্যজীবনের সর্ব্বাংশই একান্তরূপে ধর্ম্ম কর্ত্তৃক অনুশাসিত বটে। অতএব শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ব্যাঙ্ক ও কলকারখানার প্রতিষ্ঠা—এমন কি থিয়েটার, বায়োস্কোপ, যাত্রাভিনয় ইত্যাদি যাহা-কিছু আমাদের জীবন-চালনার ভিতরে দেখা দিয়াছে, তাহা যদি আমাদের পরিশুদ্ধতা ও উন্নয়নের পোষক হয়, তবে তাহাদিগকে ধর্ম্মের গণ্ডী হইতে কিছুতেই বিচ্যুত করিবার উপায় নাই।

পরিপূর্ণ ধর্ম্মের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ সম্বন্ধে গুরু বলিতেছেন, "তোমরা কেবল জয়দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার কৃষ্ণ চেন। তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝ না। তাহার পশ্চাতে ঈশ্বরের সর্ব্বগুণসম্পন্ন যে কৃষ্ণ-চরিত্র কীর্ত্তিত আছে, তাহার কিছুই জান না। তাঁহার শারীরিক বৃত্তিসকল সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া অননুভবনীয় সৌন্দর্য্য ও অপরিমেয় বলে পরিণত। তাঁহার মানসিক বৃত্তিসকল সেইরূপ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য্য এবং জ্ঞানে পরিণত এবং

প্রীতিবৃত্তির তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্ব্বলোকের সর্ব্বহিতে রত। তাই তিনি বলিয়াছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব্ব নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।

নমো নমস্তেহস্তু সহস্রকৃত্বঃ।
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে।"

শ্রীচৈতন্য সৎ চিৎ ও আনন্দের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের বহুধা প্রকটিত ভাবরাজির একটি ভাবকেই রূপ-সমন্বিত করিয়াছিলেন। জয়দেব, চণ্ডীদাসও তদনুরূপ আচরণ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা জনগণের আনন্দপ্রবণতাকে জাগাইয়া তাহাদের কর্ম্মপ্রবণতাকে উদ্বোধিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মহাত্মা যীশুখৃষ্টের আচরণেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই। কিন্তু বুদ্ধদেব ও হজরত মোহাম্মদের ভিতর আমরা তাহার ব্যতিক্রম দেখি। তাঁহারা জনগণের কর্ম্মপ্রবণতার ভিতর দিয়া আনন্দপ্রবণতাকে স্বাগতম্ বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। যে কালে যে দেশে মানব-চিত্তে যে ভাবের আধিপত্য স্বতঃ হইয়া উঠিবার লক্ষণ দেখা দেয়, অস্তিত্ব ও কেন্দ্রমুখী গতির আদি নিয়মকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া তত্ত্বপ্[illegible]গণ সেই দেশে, সেই কালে তৎপ্রভাব অনুযায়ী আচরণই অবলম্বন [illegible]য়া থাকেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার সর্ব্ব ভাবের যে মহান্ বিকাশ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে আমরা যদি একটি মাত্র ভাবকে অবলম্বন করিয়া আমাদের অস্তিত্বের পরিপোষণ করিতে চাই, তাহা হইলে যুগের চাহিদা মাফিক আমাদের রকমারি প্রয়োজনগুলির উন্নত পরিপূরণ হয় না, হইতে পারে না। অতএব আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, জয়দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার

কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র কৃষ্ণ নহেন। যাহা যাহা লইয়া আমরা ব্যষ্টি ও সমষ্টি, যাহা যাহা লইয়া আমাদের সমাজ ও দেশ, তাহা তাহার সম্যক্ নিয়ন্ত্রণ ও উদ্বর্দ্ধনের প্রেরণা আমরা যে চরিত্র হইতে লাভ করিতে পারিব, তিনিই আমাদের প্রাণারাম ও আত্মারাম কৃষ্ণ। তাঁহাকেই আমরা নমস্কার করিয়া বলিব—

"নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে॥"

গুরু বলিতেছেন, "আজকাল যোগধর্ম্মের একটা হুজুক উঠিয়াছে, তাহাতে কিছু বিরক্ত হইয়াছি। কতকগুলি বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন উচ্ছেদ, কতকগুলির প্রতি অমনোযোগ এবং কতকগুলির অধিক সম্প্রসারণ, ইহা যোগের উদ্দেশ্য। এখন যদি সকল বৃত্তির উচিত স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য ধর্ম্ম হয়, তবে তাহাদের এই ধর্ম্ম অধর্ম্ম। লম্পট ও পেটুক অধার্ম্মিক; কেননা—তাহারাও আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া দুই-একটির সমধিক অনুশীলনে নিযুক্ত। যোগীরাও অধার্ম্মিক; কেননা—তাঁহারাও আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া দুই-একটির সমধিক অনুশীলন করেন। নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট ভেদে লম্পটকে নীচ শ্রেণীর অধার্ম্মিক বলিলাম এবং যোগীদিগকে উচ্চ শ্রেণীর অধার্ম্মিক বলিলাম।"

ভগবানের নিরাকারত্ব ভগবত্তার একটি দিক্ মাত্র। ভগবান যখন আপন কেন্দ্রসত্তায় রূপাতীত, তখন তিনি ব্যক্ত জগতের ভিতর দিয়া আকৃতিবিশিষ্ট। তাই বলা হয়, "যত্র জীব তত্র শিব।" তাই বিজ্ঞানবিৎ প্রমাণ করিয়াছেন, সজীব ও তথাকথিত নির্জীব আপন আপন সত্তার বৈশিষ্ট্যের অনুপাতে একই পর্য্যায়ভুক্ত। এই শিবাভিহিত জীব-জগৎ এবং সচেতন বস্তু-জগতের ভিতরে থাকিয়া আমাদের বৃত্তিসমষ্টিকে বা তাহার এক অংশ-বিশেষকে অশিব ও অচেতন করিয়া রাখা একান্ত পক্ষেই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিরোধী। তাই, যোগীর দেশের মানুষ

আমরা—আমরা বলিতে চাই, কর্ম্মশীল ইউরোপ আমাদের অপেক্ষা বেশী ধার্ম্মিকই বটে।

গুরু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জ্ঞানের সমালোচনা করিয়া পরে বলিতেছেন— "আমি কেবল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছি না। আমরা যে মহাপ্রভুদিগের অনুকরণ করিয়া মনুষ্য-জন্ম সার্থক করিব বলিয়া মনে করি, তাহাদিগেরও জ্ঞান সংকীর্ণ, বুদ্ধি পীড়াদায়ক।"

শিষ্য—"ইংরাজের জ্ঞান সঙ্কীর্ণ? আপনি এত বড় কথা বলিতে সাহস করেন? আবার বুদ্ধি পীড়াদায়ক?"

গুরু—"আমি গোষ্পদ বলিয়া যে ডোবাকে সমুদ্র বলিব, এমত হইতে পারে না। যে জাতি একশত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়া ভারত-বাসীদিগের সম্বন্ধে একটা কথাও বুঝিতে পারিল না, তাহাদের অন্য লক্ষ গুণ থাকুক, তাহা স্বীকার করিব, কিন্তু তাহাদিগকে প্রশস্ত-বুদ্ধি বলিতে পারিব না।"

জ্ঞান ও বুদ্ধি বলিতে আমরা কি বুঝি? জ্ঞান অর্থ জানা। জানার ক্ষেত্র অনন্ত। সেই অনন্ত ক্ষেত্র হইতে আমরা যত অধিক জানা আহরণ করিব, আমরা তত বড় জ্ঞানী হইব। বিষয়ের সাড়া আমাদের চিৎশক্তিকে আঘাত দিলে আমাদের ভিতর বোধের উন্মেষ হয় এবং এই বোধ যে অভিব্যক্তি লইয়া একটা ধারণার সৃষ্টি করে, তাহাকে বলে বুদ্ধি। আর এই বুদ্ধি চিৎশক্তির স্পন্দনমুখরতা অনুপাতিক সুখদায়ক হয়। সুতরাং দেখা যায়, অপ্রশস্ত ক্ষেত্র হইতে যে জ্ঞান আহরিত হয়, তাহা সঙ্কীর্ণ হয় এবং স্পন্দনমুখরতাবর্জ্জিত চিৎশক্তি যে বোধের প্রকাশ করে, তাহার বুদ্ধিও পীড়াদায়ক হয়।

(৩)

শিষ্য—"স্থায়ী সুখ কাহাকে বলেন?"

গুরু—"চিত্তরঞ্জিণীবৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের যে ফল, তাহা স্থায়ী সুখ। তুমি পরকাল মান বা না মান, আমি মানি। তোমার মত সহস্র

সহস্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী এক্ষণে আর পরকাল মানে না। যদি 'ল অব কনটিন্যুইটি' অর্থাৎ মানসিক অবস্থার ক্রমান্বয় ভাব সত্য হয়, তবে পরকাল সম্বন্ধে যে অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পার, আমি এমন কোন পথ দেখিতেছি না। আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, পবিত্র হও, শুদ্ধচিত্ত হও, ধর্ম্মাত্মা হও। আমরা এই ধর্ম্মব্যাখ্যার ভিতরে যত প্রবেশ করিব, ততই দেখিব যে, এক্ষণে যাহাকে সমুদয় চিত্তবৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি বলিতেছি, তাহার শেষ ফল - পবিত্রতা, চিত্তশুদ্ধি। তুমি যদি নাও মান, তথাপি শুদ্ধচিত্ত ও পবিত্রাত্মা হইলে তুমি নিশ্চয়ই পরকালে সুখী হইবে। কিন্তু স্থায়ী সুখ কি—এই প্রশ্ন যখন উঠিল, তখন বলিতে হয় যে, অনন্তকাল স্থায়ী যে সুখ, ইহকাল-পরকাল উভয়কালব্যাপী যে সুখ, সেই সুখ স্থায়ী সুখ।"

পরলোকবাদের উপরেই হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ যাহা যাহা আমাদের অস্তিত্ব ও সংবৃদ্ধি ধারণ করিয়া রাখে, আর্য্য হিন্দু তাহা জানায় আরম্ভ করিয়া তাহার সমষ্টির রূপকে যে সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছিলেন, তাহার মূলে আছে পরলোকতত্ত্ব। অস্তিত্ব ও সংবৃদ্ধি ধারণ করিবার বিষয় যিনি যতটুকুই আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি মুসলমান বা খৃষ্টান বা বৌদ্ধ হইলেও, ততটুকুর সমষ্টির ভিত্তিমূলে কোন-না-কোন ভাবে বা ভাষায় পরলোকের প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেনই। যাহাদের বোধগ্রাহী মস্তিষ্ককোষ অতিমাত্রায় সাড়াপ্রবণশীল, তাঁহারাই অর্থাৎ দ্রষ্টাপুরুষগণই আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা ও সংবৃদ্ধি সাধনের মৌলিক বিধিগুলিকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে অবগত হইতে পারেন। সেই দ্রষ্টাপুরুষগণ যে শ্রেণীর মানবই হউক না কেন এবং দেশ-বিশেষ ও সমাজবিশেষের সমষ্টি মানবের সর্ব্বদিক্ প্রসারী সমুন্নতির জন্য ধর্ম্ম প্রতিপালনের আইনরূপে যে প্রকার বিধিনিয়মাদি প্রণয়ন করিয়াই থাকুন না কেন, মূলতঃ তাঁহাদের সকলেরই সূক্ষ্মানুভূতি মস্তিষ্ককোষের গ্রহণ-ক্ষমতার অনুপাতে একরূপই হইয়া থাকে। বিভিন্ন সমাজে ধর্ম্মনৈতিক

অনুষ্ঠানে বাহ্যতঃ যে বিভিন্ন ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা সরাইয়া লইলে ধর্ম্মের মূলে যখন এক সত্য ও সনাতন বস্তুরই দর্শন পাওয়া যায়, তখন যাঁহার অস্তিত্ব ও সংবৃদ্ধি ধরিয়া রাখিবার নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করেন, তাঁহাদের সকলেরই অনুভূতি-মূলে একই বস্তুর বিরাজমানতা থাকিবে না কি ? অতএব ইহা একটি সত্য সিদ্ধান্ত যে, পরলোকবাদের উপর শুধু হিন্দু ধর্ম্মের নয়, সকল ধর্ম্মেরই প্রতিষ্ঠা বটে।

এদেশে এরূপ বহুলোক জন্মগ্রহণ করিতেন, এখনও কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা পরলোককে বাস্তব বোধে প্রত্যক্ষ করিতেন বা করেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী॥"

এই বাণীটিকে এক্ষণে আমরা আমাদের লিখন-কথনরূপ পাণ্ডিত্যের পোষাকী বস্ত্র রূপে ব্যবহার করিয়া থাকি বটে, কিন্তু এই উক্তি ইহলোকের অন্তরাল-স্থিত যে পরলোকের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে, আসলে তাহা অনুভববেদ্যই বটে।

প্রাচীন গ্রীসীয় জাতির মধ্যে পরলোকতত্ত্বের প্রচলন ও তাহার প্রতি বিশ্বাসের অস্তিত্ব সুস্পষ্টরূপেই দেখা যায়। পাইথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো প্রভৃতি পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাস করিতেন। পাইথাগোরাস তাঁহার পূর্ব্বগত চারি জন্মের সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। এদেশেও দিল্লী বা মথুরায় কে একজন জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়াছেন বলিয়া বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলাম। এই জাতিস্মরত্ব বা স্মৃতিবাহী চেতনার জাগরণকে পরলোকের অস্তিত্ব নির্দ্দেশক না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে ? ব্যষ্টির পক্ষে যাহার অস্তিত্ব সন্দেহশূন্য, সমষ্টির পক্ষে তাহা প্রমাণীকৃত হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত না

হইলেও আসলে তাহা সত্যই। বৃক্ষের জীবন আছে, উহারা আমাদেরই মত সুখ-দুঃখ অনুভব করে, ইহা শুধু ব্যষ্টির পক্ষে প্রমাণীকৃত হইয়াও সমষ্টি কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছে না কি ?

আধুনিককালে সাইকিক সায়েন্স লইয়া যে গবেষণা চলিতেছে, তাহার মৌলিক প্রতিপাদ্য তত্ত্ব প্রধানতঃ দুইটি :—

(১) মৃত্যু বা ইহলোকের পর আত্মা বা পরলোকের অস্তিত্ব।

(২) মৃত ব্যক্তির সহিত বা পরলোকের সহিত যোগাযোগ স্থাপন। সাইকিষ্টগণ অটোমেটিক রাইটিং এবং মিডিয়াম যোগে তত্ত্বাধিবেশন-চক্র পরিস্থাপন দ্বারা পরলোকের অস্তিত্ব প্রমাণে সচেষ্ট। সাইকিষ্টগণ বলেন যে, ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব—যুক্তি ও বিশ্বাসের বলে নহে, পরন্তু দর্শনের সাহায্যে। বিখ্যাত পাশ্চাত্য সাইকিষ্ট জিরাল মার্সি বলেন যে, সাইকিক সায়েন্স ধর্ম্মকে (ইহলোক-পরলোক ব্যাপ্ত অস্তিত্ব ও সংবৃদ্ধির নিয়মগুলিকে ?) অসীম সত্যরূপে (বাস্তব দর্শনের বস্তুরূপে ?) প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং তাহাকে মতগত বিশ্বাসের রাজ্য হইতে উঠাইয়া জীবনে (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে ?) স্থাপিত করিবে। যে কোন পন্থায় হউক না কেন, পরলোকতত্ত্ব আমাদের নিকট বাস্তব হইয়া উঠুক, ইহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণেই কামনা করি।

এক্ষণে স্থায়ী সুখ বলিতে আমরা কি বুঝিব ? ইহলোক-পরলোক সমবায়ে যদি লোকের অখণ্ডত্ব সাধিত হয়, তবে ইহ-আমি এবং পর-আমির সমবায়ে আমাদের আমিরও অখণ্ডত্ব সাধিত হয়। সুতরাং যে যে নিয়ম আমাদের অখণ্ড আমির সংবৃদ্ধি ধারণ করে, সেইগুলিকে জানিয়া তদনুসারে জীবন পরিচালনা করিলেই ইহকাল-পরকালব্যাপী সুখ অর্থাৎ স্থায়ী সুখ আমাদের লাভ হইতে পারে।

শিষ্য—"বুঝিয়াছি সুখ কি ? কিন্তু কোন্ বৃত্তির কি প্রকার অনুশীলন করিতে হইবে, তাহার কিছু উপদেশের প্রয়োজন নাই কি ?"

গুরু—"সকলগুলির যথাসাধ্য অনুশীলন শৈশবে আরম্ভ করিতে হইবে।"

শিষ্য—"আশ্চর্য্য কথা। শৈশবে কি প্রকারে সকল বৃত্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইব ?"

গুরু—"এই জন্যই শিক্ষকের সহায়তার আবশ্যক। শিক্ষক এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই মনুষ্য মনুষ্য হয় না, সকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। এইজন্যই হিন্দুধর্ম্মে গুরুর এত মান। আর গুরু নাই, গুরুর সম্মান নাই, কাজেই সমাজের উন্নতি হইতেছে না।"

কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এক্সপার্ট বা বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ প্রত্যেক দেশেরই গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার একটি মৌলিক নীতি। বিভিন্ন প্রকারের কমিটি-কমিশন নিযুক্ত করিবার মূলে গভর্ণমেণ্টের যে উদ্দেশ্য থাকে, তাহার অর্থ বিশেষজ্ঞগণের মতামত সংগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ব্যক্ত জগতকে পরিবেষ্টন করিয়া যে অব্যক্ত জগৎ অসীমাকৃতি বিশেষে অবস্থান করিতেছে, যাহা হইতে যাহা-কিছু সব উৎসারিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে যাঁহারা জ্ঞানসিদ্ধ ছিলেন বা আছেন, তাঁহারা কি আমাদের জীবন ও কর্ম্ম পরিচালনার ব্যাপারে পরম বিশেষজ্ঞ নহেন ? তুলসী দাস গাহিয়াছেন—

"সবহি ঘটমে হরি বসে
যেঁও গিরিস্থ্বমে জ্যোতি।
জ্ঞানগুরু চকমকি বিনা
কৈসে প্রকট হোতি॥"

তাৎপর্য্য—যেরূপ প্রস্তরে অগ্নি বিদ্যমান, সেইরূপ সকল জীবেই পরমপুরুষ বিরাজমান। কিন্তু লৌহের আঘাত ভিন্ন যেমন প্রস্তর হইতে অগ্নি স্ফুরিত হয় না, সেইরূপ গুরু বা বিশেষজ্ঞের উপদেশ-রূপ চকমকি ভিন্ন পরমপুরুষের অস্তিত্ব কি প্রকারে প্রত্যক্ষীভূত হইবে ? চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

"তত্ত্ব না জানিয়া করে শ্রবণ কীর্ত্তন।
বহু জন্মে না পায় সে কৃষ্ণ প্রেমধন॥"

এস্থলেও গুরু, বিশেষজ্ঞ বা গাইডের প্রয়োজনীয়তাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ভগবদ্গীতার সন্ন্যাস আলোচনায় গুরু বলিতেছেন—"গীতার উপদেশ কর্ম্ম এমন চিত্তে কর, যাহাতে সন্ন্যাসের ফল প্রাপ্ত হইবে। নিষ্কাম কর্ম্মই সন্ন্যাস—সন্ন্যাসে আবার বেশী কি আছে? এক নিষ্কামবাদের দ্বারা সমুদয় মনুষ্য জীবন শাসিত এবং নীতি ও ধর্ম্মের সকল উচ্চতত্ত্ব একতা প্রাপ্ত হইয়া পবিত্র হইতেছে। যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম্ম একত্র হইবে, সেইদিন মনুষ্য দেবতা হইবে।"

আদর্শে সম্যক্ প্রকারে ন্যস্ত ভাবের নাম সন্ন্যাস। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—আলু যত সিদ্ধ হয়, ততই বেধা হয়। সেইরূপ আদর্শগতপ্রাণতার অনুপাতে সন্ন্যাস ভাবও বৰ্দ্ধিত হয়। কিন্তু আমাদের দেহ ত রক্তমাংসের অর্থাৎ বস্তুতান্ত্রিক? সুতরাং তাহারই সহধর্ম্মী বিজ্ঞান ও শিল্প জগৎ আমাদের দেহরক্ষার পক্ষে এক অপরিহার্য্য অঙ্গই বটে। এই অবস্থায় সেই অঙ্গকে যদি আমরা আমাদের সন্ন্যাসভাব প্রবর্দ্ধিত করিবার সমান্তরালে বস্তুজগতের পক্ষে কল্যাণপ্রসূ করিয়া তুলিতে পারি, তবে আমরা দেবতা বা দীপ্তিশীল মনুষ্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মনুষ্যপদবীতে অতি অবশ্যই আরোহণ করিতে পারিব।

(৪)

গুরু স্বদেশপ্রীতি সম্পর্কে বলিতেছেন, "অনুশীলনের উদ্দেশ্য, সমস্ত বৃত্তিগুলিকে স্ফূরিত করিয়া ঈশ্বরমুখী করা। ইহার সাধন কর্ম্মীর পক্ষে ঈশ্বরাদিষ্ট কর্ম্ম। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, তজ্জন্য সমস্ত জগৎ আত্মবৎ প্রীতির আধার হওয়া উচিত। জাগতিক প্রীতির ইহাই মূল। সমস্ত জগৎ কেন আপনার মত ভালবাসিব? ইহা ঈশ্বরাদিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া।

পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি যে, সমাজের বাহিরে মনুষ্যের কেবল পশু-জীবন আছে মাত্র, সমাজের ভিতরে ভিন্ন মনুষ্যের ধর্ম্ম-জীবন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমাজ-ধ্বংসে সমস্ত মনুষ্যের সকল প্রকার মঙ্গল ধ্বংস। যদি তাহাই হইল,

তবে আগে সমাজ রক্ষা করিতে হয়। আবার আত্মরক্ষা ও সমাজরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষাও ঈশ্বরাদিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া জানিবে। কেননা, ইহা সমস্ত জগতের হিতের উপায়। পরস্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বা অধঃপতিত হইয়া কোনও পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত হইলে পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। এইজন্য সর্ব্বভূতের হিতের জন্য সকলেরই স্বদেশরক্ষা করা কর্ত্তব্য। ইহাও সহজেই নিষ্কাম কর্ম্মে পরিণত করা যাইতে পারে।"

যে কেন্দ্র হইতে স্খলিত হইয়া সুপ্ত-কেন্দ্র-চৈতন্য সহকারে আমরা এই জগৎ-প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়াছি, সেই কেন্দ্রাভিমুখী গতিকে আশ্রয় করিয়া কেন্দ্রাধিপতির নিকট গমন করার একটা স্বতঃ-কামনা আত্মোৎকর্ষলিপ্সু মনুষ্য মাত্রেরই চলায়, বলায়, কর্ম্মে, চিন্তায় পরিব্যক্ত হইতে দেখা যায়। অখণ্ড মানব জাতির ইতিহাসের উৎকৃষ্ট অংশের সার মর্ম্ম যদি সংক্ষেপতঃ ব্যক্ত করিতে হয়, তবে ঐ আত্মোৎকর্ষলিপ্সু মনুষ্যদের অন্তরতম চাহিদা এবং চাহিদা অনুপাতিক তাঁহাদের কর্ম্ম-প্রয়াসের কথাই প্রকাশ করিতে হয়। সাহিত্য, কাব্য, রাষ্ট্র, সমাজ, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানবের মস্তিষ্কচালনী বিষয়গুলি তাঁহাদের ঐ চাহিদার পক্ষে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে অন্তরায় উৎপাদন করে, এরূপ অভিমত যদি কেহ ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে তাহাকে বলিতে হয় যে, সুন্দরের পুষ্পবৃষ্টি হয় না যে সাহিত্যে, যে কাব্যে, যে রাষ্ট্রে, যে সমাজে, যে বিজ্ঞানে—সেই সাহিত্য, কাব্য, রাষ্ট্র প্রভৃতি কি প্রকৃতপক্ষে তৎ তৎ অভিধায় পরিশোভিত হইবার উপযুক্ত? সুতরাং ইহাই প্রতিপন্ন হয় না কি—মানব জীবনের অনুশীলনের উদ্দেশ্য, মানবের বৃত্তি যাহা-কিছুর চর্চ্চায় নিরত থাকুক না কেন, যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়া সেই বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিয়া তোলা? কিন্তু সমস্যার বিষয় ইহাই যে, আমাদের সুপ্ত ইচ্ছা বা করণোদ্দীপনা যখন পারিপার্শ্বিকে পরিপোষণ পাওয়ার পরিবর্ত্তে আঘাত লাভ করতঃ থেৎলাইয়া যাইয়া তাহার স্বভাব-সরল গতিভঙ্গী হারাইয়া ফেলে, তখনই তাহার প্রকাশে অসামঞ্জস্য ঘটে। আর ইহা জন্মজন্মানুক্রমিক কর্ম্ম-গুণে সমষ্টি মানবের অধিক অংশেই সংঘটিত

হইয়া থাকে বলিয়া সমাজের বাহিরে অর্থাৎ ব্যষ্টি ছাড়াইয়া বিশেষ সমষ্টি-মানবে প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবন পরিচালনার দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয়-পরিজনকে হত্যা করিতে হইবে—এই চিন্তায় অর্জ্জুন যখন একান্ত কাতর হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করতঃ বসিয়া পড়িলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ক্ষাত্র-বীর্য্যকে চেতনোদ্দীপ্ত করিবার জন্য বলিলেন,

"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"

অর্জ্জুনের এই সাময়িক যুদ্ধস্পৃহাশূন্যতাকে শ্রীকৃষ্ণ অনার্য্যোচিত, স্বর্গের (সু+ঋজ্ = উত্তমে গমন) প্রতিবন্ধক এবং অকীর্ত্তিকর বলিলেন। • কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূলে যদি পরস্বলোলুপ দুর্য্যোধনের কবল হইতে সমাজ-রক্ষা ও দেশ-রক্ষার প্রশ্নই নিহিত থাকে, তবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ঐ কথা না বলিয়া আর কি বলিতে পারিতেন? আপনাকে আপনার রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি যদি জীব-স্বভাবের আদিম বৈশিষ্ট্য হয়, তবে বহু ব্যষ্টির সমবায়ে যে সমাজ বা দেশ সংগঠিত হয়, সেই সমাজবদ্ধ বা দেশবদ্ধ মনুষ্যের স্বজন-রক্ষা এবং স্বদেশ-রক্ষাও তাহাদের সমষ্টি-স্বভাবের আদিম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আধুনিক কালে স্বজন ও স্বদেশের সংজ্ঞা লইয়া যে নিত্য দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হইতেছে, তাহার ফলে মানবের স্বতঃ-বোধ-সারল্য একটা অবাঞ্ছিত, নিষ্ঠুর উৎপীড়ন লাভ করিয়া নিগৃহীত হইতেছে না কি? এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতবর্ষের প্রদেশীয় স্বজন ও সীমারেখা লইয়া যে সরব ও নীরব দ্বন্দ্ব চলিতেছে এবং ইউরোপে দেশীয় স্বজন ও সীমারেখা লইয়া যে সশস্ত্র সংগ্রাম চলিতেছে, তাহার বিচার করিলে প্রদেশ বা দেশের স্বজন ও সীমার সংজ্ঞায় একটা পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবার আবশ্যকতাই উপলব্ধ হয়। তৎকল্পে বাহ্য নির্দ্দেশরূপ স্বতঃমান্য বা রাষ্ট্রসিদ্ধ আইনের যেরূপ প্রয়োজন আছে, আমাদের মনন, কর্ম্ম ও আচরণকেও

নিষ্কামমূলক ভাবে পরিচালনা করিবার কৌশল আবিষ্কার করারও তদ্রূপ প্রয়োজন আছে।

গুরু অন্যত্র বলিতেছেন, "জাগতিক প্রীতি ও সর্ব্বত্র সমদর্শনের এম তাৎপর্য্য নহে যে, পড়িয়া মার খাইতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখ সকলেই আমার তুল্য, তখন আমি কখনও কাহারও অনিষ্ট করিব না আপনার সমাজের যেমন সাধ্যানুসারে ইষ্ট সাধন করিব, সাধ্যানুসারে প সমাজেরও তেমনি ইষ্ট সাধন করিব। পর সমাজের অনিষ্ট করিয়া আমা সমাজের ইষ্ট সাধন করিব না এবং আমার সমাজের অনিষ্ট করিয়া কাহাকে তাহার সমাজের ইষ্ট সাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদর্শন আমি তোমাকে যে দেশপ্রীতি বুঝাইতেছি, তাহা ইউরোপীয় পেট্রিয়টিজ নহে। ইউরোপীয় পেট্রিয়টিজম একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপী পেট্রিয়টিজমের ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পর সমাজের ধন কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহ করিতে হইবে। এই দুরন্ত পেট্রিয়টিজম প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতি লুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষের কপালে যেন এরূপ দেশ-বাৎসল্য-ধর্ম্ম ন লিখেন।"

আমরা "আমি-আমি" রবে নিত্য যে আমিত্বের গর্ব্ব করিতেছি এব এই গর্ব্ব লইয়া অপরের সহিত যে রেষারেষি ও হানাহানি করিতেছি, সেই "আমির" বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নির্ভরশীল অস্তিত্ব একান্তরূপেই "তুমির" উপর সংন্যস্ত। যেখানে "তুমি" নাই, সেখানে "আমি"-ও নাই। সুতরাং "তুমিই" আমার "আমির" স্বতঃসৃষ্ট পারিপার্শ্বিক— যে পারিপার্শ্বিকবিহীনতায় আমার "আমি" অস্তিত্বশূন্য হইয়া যায়। অতএব আমরা যদি পারিপার্শ্বিককে আমাদের পক্ষে উন্নত প্রেরণা-প্রদায়ক করিয়া তুলিতে না পারি, অথবা বলিষ্ঠ পারিপার্শ্বিক যদি স্বতঃ হইয়া আমাদিগকে উন্নয়নে চেতায়িত করিয়া না তোলে, তবে আমাদের অধোগমনশীলতা অনিবার্য্যরূপেই সাধিত

হয়। আমরা ব্যষ্টিগতভাবে এবং জাতিগতভাবে যে অর্থ-বিত্ত-ধন-ঐশ্বর্য্য আহরণ করিবার জন্য উন্মত্ততা প্রদর্শন করিতেছি, সেই অর্থ-বিত্ত-ধন-ঐশ্বর্য্য যদি সেই ব্যষ্টি বা জাতির পারিপার্শ্বিকের সেবার প্রতিদান না হইয়া বঞ্চনার উদ্গীরণ হয়, তবে তাহা ব্যষ্টিতে বা জাতিতে স্থায়ী হইয়া থাকে না। ব্যষ্টি বা জাতির সমবায় লইয়া যে অখণ্ড মানবগোষ্ঠী বিরচিত, তাহার প্রতি-মানবে চৈতন্যরূপী এরূপ একটি নির্ম্মলতম বস্তু আছে, পারিপার্শ্বিকে পরিপোষণ দান করিয়া সৃজনশীল হইয়া চলাই যাহার আদিম বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যকে ব্যক্তিগতভাবে বা জাতিগতভাবে যখনই আমরা উল্লঙ্ঘন করিয়া চলি, তখনই আমাদের চৈতন্য-সত্তা অপঘাত লাভ করে, আমরা অর্থে ও ঐশ্বর্য্যে, জ্ঞানে ও কর্ম্মে এবং আত্ম-সংরক্ষণে দুর্ব্বলতর হইতে থাকি। ব্যষ্টির ও জাতির উত্থান ও পতন এই শাশ্বত নিয়ম প্রবাহিত হইয়াই চলে। ভারতবর্ষের উপর ইংলণ্ডের অধিনায়কত্বের প্রশ্নই তত দিন উঠে নাই, যত দিন ইংলণ্ড ভারতবর্ষের উন্নয়নে নিরত ছিল। সেই অধিনায়কত্ব ভারতবর্ষে আর কত কাল প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তাহাও একান্তরূপেই নির্ভর করে, ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের পরিপোষণ-নীতির সক্রিয় প্রয়োগ-সমর্থতার উপরে। সুতরাং অখণ্ড মানব-জীবন পরিচালনা-মূলে যদি একের পারিপার্শ্বিকের সহিত সেই একের প্রতি সেই পারিপার্শ্বিকের সেবা ও পুষ্টির আদান-প্রদানের তত্ত্বই নিহিত থাকে, তবে পড়িয়া মার খাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না এবং তথাকথিত ইউরোপীয় পেট্রিয়টিজমের এবং দেশ-বিশেষে তাহার ব্যর্থ অনুকরণেরও কোনই মূল্য থাকে না।

(৫)

শিষ্য—"ঈশ্বরে ভক্তি সম্বন্ধে কিছু উপদেশের প্রার্থনা করি।"

গুরু—"যখন মানুষের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।"

শিষ্য—"বুঝিলাম না।"

গুরু—"যখন জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরানুসন্ধান করে, কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, চিত্তরঞ্জনীবৃত্তিগুলি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করে এবং শারীরিকী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের কার্য্যসাধনে বা ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই ভক্তি বলে। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম্ম ঈশ্বরে আনন্দ ঈশ্বরে এবং শরীরার্পণ ঈশ্বরে, তাহারই ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে। এ কথাটা এত গুরুতর, ইহার ভিতর এমন সকল গুরুতত্ত্ব নিহিত আছে যে, ইহা তুমি যে একবার শুনিয়াই বুঝিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই। অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইবে, অনেক গোলমাল ঠেকিবে, অনেক কিছু দেখিবে, হয়তঃ পরিশেষে ইহাকে অর্থশূন্য প্রলাপ বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও সহসা নিরাশ হইও না। দিন দিন, মাস মাস, বৎসর বৎসর এই তত্ত্বের চিন্তা করিও। কার্য্যক্ষেত্রে ইহাকে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিও। ইন্ধনপুষ্ট অগ্নির ন্যায় ইহা ক্রমশঃ তোমার চক্ষে পরিস্ফুট হইতে থাকিবে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে তোমার জীবন সার্থক হইল বিবেচনা করিবে। মনুষ্যের শিক্ষনীয় এমন গুরুতত্ত্ব আর নাই। একজন মনুষ্য সমস্ত জীবন সৎ-শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া যদি শেষে এই তত্ত্বে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবেই তাহার জীবন সার্থক হইবে।"

সৎএ অনুরক্তিই ভক্তি। অস্ ধাতু হইতে সৎ শব্দ নিষ্পন্ন। অস্ ধাতু অর্থ—থাকা, স্থিতি। যাহা সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া বিরাজমান, অক্ষয় ও অমর তাহাই সৎ। কুলার্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে,

"ব্রহ্মাবিষ্ণু-মহেশাদি-দেবতা ভূতজাতয়ঃ।
সর্ব্বে নাশং প্রয়াস্যন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥"

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতা এবং সৃষ্টির যাবতীয় বস্তু বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং আপন আপন কল্যাণের অনুধাবন কর।

আধুনিক যান্ত্রিক গবেষণায় অস্তিত্বের স্তর কতখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে ?

এক টুক্‌রা বরফ-বিশ্লেষণে জলের অস্তিত্ব, জলের বিশ্লেষণে বাষ্পের অস্তিত্ব, বাষ্পের বিশ্লেষণে অণু-পরমাণুর অস্তিত্ব, অণু-পরমাণুর বিশ্লেষণে একমাত্র energy বা শক্তির অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে। এই শক্তিরও ক্রম-সূক্ষ্ম স্তর আছে। এই অস্তিত্বের স্তর সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, একটি স্তরের উপরে আর একটি স্তর—ইহা এইভাবে সজ্জিত নহে। জল, বরফ ও বাষ্প স্তরভেদে পৃথক হইয়াও যেরূপ একত্রীকৃত, সেইরূপ গোটা অস্তিত্বও স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম স্তর লইয়া একত্রীকৃত। এই অস্তিত্বের যে স্তর নিত্য-বিরাজমান, কাল-প্রবাহে ধ্বংসশীল নহে, সেই স্তর-কেন্দ্র বা সৎ-কেন্দ্র হইতে শ্রীকৃষ্ণ ভূতলে অবতরণ করিয়া সৎ-ঘন দেহ ধারণ করতঃ অর্জ্জুনের ভিতর দিয়া তাঁহার সমসাময়িক জগৎকে বলিয়াছিলেন,

"সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

বস্তুতঃ পক্ষেই সমজাতীয় প্রাণীতে সমজাতীয় প্রাণীর প্রীতি উৎপন্ন হয়—ইহা যদি সত্য হয়, তবে সৎ-ঘন স্থূল দেহেই আমাদের যথার্থ অনুরক্তি জন্মিতে পারে।

যীশুখৃষ্ট যেরূপ বলিয়াছিলেন, "আমিই সত্য, আমিই জীবন, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কেহ পিতার নিকট গমন করিতে পারে না"—সেইরূপ হজরত মোহাম্মদও বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি খোদা ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের (রছুলের) আজ্ঞাকারী হয়, সেই ব্যক্তিই সিদ্ধি লাভ করে।"

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে,

"মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি র্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা॥"

বিবেক-কল্পিত দেবমূর্ত্তি যদি মনুষ্যদিগকে মোক্ষ বা সৎ-এ অনুরক্তির ফল প্রদান করিতে পারে, তবে মনুষ্যগণ স্বপ্নলব্ধ রাজ্য-দ্বারাও রাজা হইতে সমর্থ হয়।

সৎ হইতেই যে আমাদের অবতরণ সম্ভব হইয়াছে, ইহার স্মৃতি হইতে আমরা বিক্ষিপ্ত নহি। কিন্তু সেই স্মৃতির উদ্দীপন হইতে পারে, কার্যে এইরূপ আচরণ অবলম্বন না করিলে তাহা ইন্ধনপুষ্ট অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া আমাদিগকে সৎ-কেন্দ্রে পৌঁছাইয়া দিবে কেমন করিয়া ?

শিষ্য—"এরূপ দুষ্প্রাপ্য তত্ত্ব আপনি কোথায় পাইলেন ?"

গুরু—"অতি তরুণ অবস্থা হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, এই জীবন লইয়া কি করিব ? সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য-নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী ও বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। 'এই জীবন লইয়া কি করিব'—এই প্রশ্নের ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল উত্তর অযথার্থ। লোকের সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ ফল ; ইহাই একমাত্র সুফল। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি এই তত্ত্ব কোথায় পাইলাম ? সমস্ত জীবন ধরিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া এত দিনে উহা পাইয়াছি। তুমি এক দিনে ইহার কি বুঝিবে ?"

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"জগতে যত মহৎ আছে

হইব নত সবার কাছে

হৃদয় যেন প্রসাদ যাচে

তাঁদের দ্বারে দ্বারে।" (দেশের উন্নতি)

চলনে, ব্যবহারে, মননে আপনাকে বিনয়-গর্ব্বিত করিয়া লইতে না পারিলে জীবনের প্রশ্ন ঔদরিক ক্ষুধার ন্যায় জীবন্ত হইয়া দেখা দেয় না। লৌকিক দৃষ্টিতে যাহারা বিনত, আন্তর পরিমাপে তাহারাই উন্নত। ঋগ্বেদে আছে,

"সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়াণি বঃ।

সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সসহাসতি॥" ১০।১৯১।৪

তোমাদের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক, তোমাদের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্বাংশে ও সম্পূর্ণরূপে একরূপ হও।

আপন আপন সত্তা-উৎসারিত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও একই ভাবের ঐক্যে সংগ্রথিত হইবার অভিলাষ করিলে মনুষ্যমাত্রেরই মৌলিক একের প্রতি অনুরক্ত হওয়া আবশ্যক। আর তাহার একমাত্র উপায় শ্রেষ্ঠে বিনত হওয়া, শ্রেষ্ঠ হইতে আত্মবোধের পরিমার্জ্জনী উপকরণসমূহ আহরণ করিয়া আন্তর পরিমাপে উর্দ্ধ-গমনপরায়ণ হইয়া চলা। প্রাচীন ভারতের আর্য্যগণের এইরূপ চলনার বহুল সমাবেশের ভিতর হইতেই ধ্বনিত হইয়াছিল,

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা

আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত—

মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

হে অমৃতের পুত্র সকল, তোমরা শুন। আমি তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। একমাত্র তাঁহাকেই জানিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। ইহা ব্যতীত আর পথ নাই।

ঈশ্বরানুবর্ত্তিতা বা ভক্তির জন্মদায়িনী এই বাণীই যথার্থ, আর সকলই অযথার্থ। মানব-জীবনের চরম নির্য্যাস এই ফল। ইহাই একমাত্র সুফল।

ধর্ম্মতত্ত্বের সমাপ্তি-করণে গুরু বলিতেছেন, "অনুশীলন-তত্ত্ব সমাপ্ত করিলাম। যাহা বলিবার তাহা সব বলিয়াছি, এমন নহে। সকল আপত্তির মীমাংসা করিয়াছি, এমনও নহে। তবে স্থূল মর্ম্ম যে বুঝিয়াছ বোধ করি এমন প্রত্যাশা করিতে পারি।"

শিষ্য—"তাহা আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব। তাহাই ধর্ম্ম। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যই সুখ। ঈশ্বরমুখীনতাই উপযুক্ত অনুশীলন। সেই অবস্থাই ভক্তি। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। এইজন্য সর্ব্বভূতে প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত। সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম্ম নাই। আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি—এই গুলিও প্রীতির অন্তর্গত। এই হইল স্থূল কথা।"

গুরু—"তবে তুমি ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিয়াছ। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ঈশ্বরে ভক্তি দৃঢ় হউক।"

শ্রীবিগ্রহ

(১)

শ্রীচৈতন্যের যুগের প্রতিমা-বিগ্রহের পরম বিস্ময়কর লীলা সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃত হইতে কিঞ্চিৎ পাঠ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই লীলা-কাহিনী খুব বেশী দিনের পুরাতন নহে।

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী বৃন্দাবন দর্শন করিতে গিয়াছেন। বৃন্দাবনবিহারীর সুমধুর স্মৃতিতে ভরপুর হইয়া তাঁহার চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, শ্রাবণের ধারার ন্যায় তাঁহার দুই নয়ন বাহিয়া প্রেমাশ্রু বিনির্গত হইতেছে। কোথায় যাইবেন, কোথায় থাকিবেন—সে সম্বন্ধে উদ্দেশ্যবিহীন শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী প্রেমভারে অবনত হইয়া কখনও উঠিতেছেন, কখনও পড়িতেছেন, স্থানাস্থান ভেদ নাই। সর্ব্বহৃদয়-প্রাণন-পরিমল যে কৃষ্ণস্মৃতি, তাহা তাঁহাকে একান্তরূপে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী ভ্রমিতে ভ্রমিতে গোবর্দ্ধনে আসিলেন, তারপর শৈল পরিক্রমা করিয়া গোবিন্দকুণ্ডে আসিলেন। তথায় স্নানকার্য্য সমাপন করিয়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন করতঃ শ্যামসুন্দরের চিন্তায় নিবিষ্ট হইলেন। তখন চিদৈশ্বর্য্যবিমণ্ডিত মাধুর্য্যে ভরপুর হইয়া এক বালক সেখানে উপস্থিত হইল। বালক শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীকে অনিন্দ্যসুন্দর কণ্ঠস্বরে কহিল,

"পুরী এই দুগ্ধ লইয়া কর তুমি পান।
মাগি কেনে নাহি খাও কিবা কর ধ্যান॥"

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী বালকের দিব্যকান্তি দর্শনে এবং স্বরের অমৃত ঝঙ্কার শ্রবণে আনন্দে পাগলপারা হইয়া উঠিলেন। ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে বালক, কোথায় তোমার বসতি? কেমন করিয়া তুমি জানিতে পারিলে যে, আমি আজ উপবাসী?

বালকের মুখ-ইন্দু পুনরায় সঞ্চালিত হইল। সপ্তলোকের স্বরসুষমা আপনার স্বর গ্রামের ভিতর ঢালিয়া দিয়া বালক পুনরায় কহিল,

"গোপ আমি এই গ্রামে বসি।
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী॥
কেহ অন্ন মাগি খায়, কেহ দুগ্ধাহার।
অযাচক জনে আমি দেই ত আহার॥"—বলিয়া বালক দুগ্ধের ভাণ্ড রাখিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রিশেষে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী স্বপ্নে দেখিলেন—সেই বালক, সেই কান্তি, সেই দৃষ্টি! বালক যেন ত্রিভুবন জিনিয়া সকল রূপ হরণ করতঃ যেখানে যাহা যেমনিভাবে প্রয়োজন, দেহ-কমলের সেখানে তাহা তেমনিভাবে সংস্থাপন করিয়াছে। বালক তাঁহার হস্ত সম্প্রসারণ করিয়া শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর হস্ত ধারণ করিল, তারপর তাঁহাকে এক গঞ্জে লইয়া গেল। বালক গঞ্জ দেখাইয়া কহিল,

"আমি এই গঞ্জে রই।
শীতবৃষ্টি দাবাগ্নিতে মহাদুঃখ পাই॥
গ্রামের লোক আনি আমা কাড় গঞ্জ হইতে।
পর্ব্বত উপরে লইয়া রাখ ভালমতে॥
এক মঠ করি তাঁহা করহ স্থাপন।
বহু শীতল জলে কর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন।
বহু দিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন॥
তোমার প্রেম-বশে করি সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার॥
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী।
ব্রজের স্থাপিত আমি ইহা অধিকারী॥"—বলিয়া বালক চলিয়া গেল। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সুখস্বপ্ন অপনোদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার

চিত্তরাজ্যের সপ্তসিন্ধু শোকে, দুঃখে উথলিয়া উঠিল। হায়! হায়! আমি কি করিয়াছি! দুগ্ধদানের ছলনায় আমার পরম প্রিয় কঙ্কালরক্তমাংস-মণ্ডিত হইয়া বালক-বেশে আমাকে দর্শন দান করিয়াছিলেন, আমি ত তখন তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই—এই দুর্ব্বহ চিন্তায় শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী উঠিতে যাইয়া ছিন্নমূলতরুর ন্যায় ভূমে নিপতিত হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। পরম দেবতা অন্তরীক্ষে থাকিয়া ভক্তের এই দহনাতুর ব্যাকুলতা দর্শনে বোধ হয় সুখ পাইলেন।

বিদ্যুৎ-গতিতে এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে বিসর্পিত হইল। ক্রমে বহুদূর দেশাগত ভক্তজনের ভক্তিভারে ব্রজভূমি টলটলায়মান হইয়া উঠিল। মহাসমারোহের সহিত ভক্তগণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরি শ্রীগোপালবিগ্রহ স্থাপিত করিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী নিশিদিনের তরে শ্রীবিগ্রহের সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করিলেন। দুই বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পরে শ্রীগোপালবিগ্রহ আর এক অপরূপ লীলা প্রকটিত করিলেন। শ্রীগোপাল এক রাত্রে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া কহিলেন,

"পুরী আমার তাপ নাহি যায়।
মলয়জ চন্দন লেপ তবে সে জুড়ায়॥
মলয়জ আন যাই নীলাচল হইতে।
অন্য হৈতে নহে তুমি চলহ ত্বরিতে॥"

দিকচক্রবালরেখার অস্তগমনোন্মুখ রবিরশ্মিও বুঝি সীমায়িত, কিন্তু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সৌভাগ্য সীমায়িত নহে। শ্রীগোপালবিগ্রহের সেবায় অপর লোক নিযুক্ত করিয়া শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী প্রেমানন্দে ডগমগ হইয়া চলিলেন গৌর-দেশে। শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যকে দীক্ষা প্রদান করিয়া গমন করিলেন, রেমুনাতে। রেমুনাতে শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত।

"রেমুনাতে কৈল গোপীনাথ দরশন।
তাঁর রূপ দেখিয়া হইল বিহ্বল মন॥"

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী শ্রীগোপীনাথের সেবকগণকে বিনত প্রশ্ন করিলেন কি কি উপচার দ্বারা শ্রীগোপীনাথের ভোগ দেওয়া হয়। সেবকগণ তাহ যথাযথ বিবরিয়া কহিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন,

"সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর অমৃতকেলি নাম।
দ্বাদশ মৃৎপাত্র ভরি অমৃত সমান॥"

শুনিয়া শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী মনে মনে বিচার করিলেন,

"অযাচিত ক্ষীর প্রসাদ অল্প যদি পাই।
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই॥"

রাত্রিতে শ্রীগোপীনাথ সেবাইতকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া কহিলেন,

"উঠহ পূজারি কর দ্বার বিমোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ॥
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা ক্ষীর এক হয়।
তোমরা না জানিলা ইহা আমার মায়ায়॥
মাধব সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া।
তাহাকে ত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লইয়া॥"

রাত্রি প্রভাতে সেবাইত অদ্ভুত-স্বপ্ন-বৃত্তান্ত-স্মরণে রোমাঞ্চিতকলেবর হইলেন। তারপর যথাস্থানে ধড়ার আঁচলে ঢাকা ক্ষীর পাইলেন মাধব সন্ন্যাসী কে গো—এই বলিয়া হাটে যাইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন এব তাঁহাকে বিগত রাত্রের স্বপ্ন-সমাচার অবগত করাইয়া ক্ষীর প্রদান করিলেন

তারপর শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী নীলাচলে গমন করিলেন। নীলাচলে শ্রীজগন্না দর্শনে তাঁহার ভক্তিনদীতে প্রেমের তুফান ছুটিল। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী যথাসম্ভ ত্বরান্বিত করিয়া শ্রীজগন্নাথের সেবকগণের নিকট হইতে চন্দন সংগ্রহ করিলেন ঐ চন্দন লইয়া পুনরায় রেমুনাতে আসিয়া উপনীত হইলেন। সেই রাত্রে তি দেবালয়ে শয়ন করিলেন। রাত্রিশেষে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী স্বপ্নে শ্রীগোপালে দর্শন লাভ করিলেন। শ্রীগোপাল কহিলেন,

"শুনহ মাধব।
কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব॥
কর্পূর সহিত ঘষি এসব চন্দন
গোপীনাথের অঙ্গে সব করহ লেপন॥
গোপীনাথ আমায় যে এক অঙ্গ হয়
ইহাকে চন্দন দিলে আমার তাপ ক্ষয়॥
দ্বিধা না ভাবিহ না করিহ কিছু মনে।
বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে॥"

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোপীনাথের সেবকগণকে এই স্বপ্নঘটিত বিষয় অবগত করাইলেন এবং সেবকগণ শ্রীগোপালের আদেশ যথাবিহিতরূপে প্রতিপালন করিলেন।

ব্রজভূমির শ্রীগোপাল বিগ্রহ এবং রেমুনার শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের এই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ কাহিনী শ্রীচৈতন্য স্বয়ং নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত এবং মুকুন্দ দত্তের নিকট বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া নীলাচলে যাওয়ার পথে রেমুনাতে উপনীত হইলে স্থান-মাহাত্ম্য-বর্ণনা-প্রসঙ্গে এই অপূর্ব্ব কীর্তিকাহিনী তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের শেষ অমৃত বাক্ এইরূপ,

"নিত্যানন্দ করহ বিচার।
পুরীসম ভাগ্যবান্—জগতে নাহি আর॥
দুগ্ধ দান ছলে কৃষ্ণ যারে দেখা দিল।
তিন বার স্বপ্নে আসি যারে আজ্ঞা কৈল॥
যার প্রেমে বশ হইয়া প্রকট হইল।
সেবা অঙ্গীকার করি জগৎ তারিল॥
যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হইল ক্ষীর-চোরা করি॥"

বিদ্যানগরের অধিবাসী দুই ব্রাহ্মণ বহু তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া বৃন্দা আসিলেন। এক ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ এবং উচ্চ-বংশীয়; অপর যুবক এবং অপেক্ষা নিম্ন-বংশীয়। যুবকের সাহচর্য্য ও সেবা প্রাপ্ত না হইলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের তীর্থপর্য্য সম্ভবপর হইত না। যুবকের প্রতি অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া বৃদ্ধ তাহা আপন কন্যা সম্প্রদান করিতে প্রতিশ্রুতি দান করিলেন। কিন্তু বিদ্যানগ প্রত্যাগমন করিয়া বৃদ্ধ আত্মীয়স্বজন ও সমাজের নিপীড়ন ভয়ে সেই প্রতিশ্রু অনুসারে কার্য্য করিতে অসম্মত হইলেন। অধিকন্তু সেই প্রতিশ্রুতির কাহিনী সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বহু বাদানুবাদের পর পরিশেষে গ্রামিকে সভায় এইরূপ সিদ্ধান্ত সাধিত হইল যে, যদি শ্রীগোপাল স্বয়ং আসিয়া গ্রামিবে বিচার-সভায় যুবক ব্রাহ্মণের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করেন, তবে তাহাকে ক সম্প্রদান করা হইবে। এই সিদ্ধান্তের পর যুবক ব্রাহ্মণ বৃন্দাবনে গমন করি শ্রীগোপালের শরণাগত হইলেন এবং হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য উজার করিয়া ঢালি দিয়া তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেন,

"ব্রাহ্মণ্যদেব তুমি বড় দয়াময়।
দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হইয়া সদয় ॥
কন্যা পাব মোর মনে নাহি ইহা সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা এই বড় দুঃখ ॥
এত জানি তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময়।
জানি সাক্ষী নাহি দেহ তার পাপ হয়।"

কারুণ্যস্বরূপের করুণ হৃদয় বিগলিত হইল। শ্রীগোপাল কহিলেন,

"বিপ্র তুমি যাহ স্ব ভবনে।
সভা করি মোরে তুমি করিহ স্মরণে ॥
আবির্ভাব হইয়া আমি তাহা সাক্ষী দিব।
তবে দুই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥"

ব্রাহ্মণ ভক্তিবিনন্দিত কণ্ঠে বলিলেন,

"এই মূর্ত্তি গিয়া যদি এই শ্রীবদনে।
সাক্ষী দেহ যদি তবে সর্ব্বলোক শুনে॥"

শ্রীগোপাল কহিলেন,

"প্রতিমা চলে কোথাহ না শুনি।"

ব্রাহ্মণ পুনরায় ভক্তিদৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন,

"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য্যকরণ॥"

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগোপাল হার মানিলেন, কহিলেন—

"শুনহ ব্রাহ্মণ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন॥
উলটিয়া আমা না করিহ দরশনে।
আমাকে দেখিলে আমি রহিব সেই স্থানে॥
নূপুরের ধ্বনিমাত্র আমার শুনিবা।
সেই শব্দে আমার গমন প্রতীত করিবা॥"

শ্রীগোপাল সেই গ্রামিকের বিচার-সভায় যাইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। সেই ঘটনা হইতেই তাঁহার নাম সাক্ষীগোপালরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

বিদ্যানগরের রাজা প্রতিমাবিগ্রহের এই অলৌকিক কাহিনী আদ্যোপান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে আপন রাজধানীতে আনয়ন করেন এবং আপনি স্বয়ং তাঁহার সেবার ভার গ্রহণ করেন। পরে উড়িষ্যার রাজা শ্রীপুরুষোত্তম তাঁহাকে কটকে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীগোপালের নাসিকায় মুক্তার অলঙ্কার পরিধান করাইতে শ্রীপুরুষোত্তম-মহিষীর অত্যন্ত সাধ হইল। কিন্তু শ্রীগোপালের নাসিকায় ছিদ্র ছিল না। শ্রীগোপাল রসঘন জীবন্ত মূর্ত্তিতে রাণীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া কহিলেন,

"বালক কালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি।
মুক্তা পরাইয়াছিল বহু যত্ন করি॥
সেই ছিদ্র অদ্যাপিহ আছেতে নাসাতে।
সেই মুক্তা পরাহ যাহা চাহিয়াছ দিতে॥"

শ্রীচৈতন্য চতুঃসঙ্গী সমভিব্যাহারে রেমুনা ছাড়িয়া কটকে উপনীত হইলে নিত্যানন্দ গোস্বামী সাক্ষীগোপালের এই লীলামৃত কাহিনী শ্রীচৈতন্যের সমীপে নিবেদন করিয়া তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য যখন প্রথম সাক্ষীগোপাল দর্শন করেন, তখন তাঁহাদের উভয়কে কিরূপ দেখাইয়াছিল ?

"গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি
ভক্তগণে দেখে যেন দুঁহে এক মূর্ত্তি॥
দুঁহে এক বর্ণ, দুঁহে প্রকাণ্ড শরীর।
দুঁহে রক্তাম্বর দুঁহে স্বভাবগম্ভীর॥
মহাতেজোময় দুঁহে কমল-নয়ন।
দুঁহার ভাবাবেশে দুঁহার চন্দ্র-বদন॥"

রথযাত্রার সময়ে শ্রীজগন্নাথ যে লীলা প্রকটিত করিলেন, তাহা নিখিল ভক্তজনগণের হৃদয়মনের পরম উল্লাসকর। রথোপবিষ্ট শ্রীজগন্নাথ কেমন করিয়া চলিতেছেন ?

"গৌর যদি পাছে চলে, শ্যাম হয় স্থিরে
গৌর আগে চলে শ্যাম চলে ধীরে ধীরে॥
এই মত গৌর শ্যাম দুঁহে ঠেলাঠেলি।
স্বরথে শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী॥"

শ্রীচৈতন্য যখন বলগণ্ডীর পুষ্পোদ্যানে বিশ্রামরত, তখন সংবাদ আসিল যে, শ্রীজগন্নাথের রথ চলিতেছে না। রাজা প্রতাপরুদ্র বৃহৎকায় হস্তীর সাহায্যে রথ চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তথাপি রথ চলিতেছে না

শ্রীচৈতন্য-সঙ্গ-বিহনে শ্রীজগন্নাথ যেন বিরহ-কাতর হইয়া চলিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র পুষ্পোদ্যান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া—

"রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া।
হড়্ হড়্ করি রথ চলিল ধাইয়া॥
ভক্তগণ কাছি হাতে করি মাত্র ধায়।
আপনে চলয়ে রথ টানিতে না পায়॥"

প্রতিমা-বিগ্রহের এবম্বিধ অলৌকিক লীলাকাহিনী কতই না আছে আর্য্য হিন্দুর স্মৃতির মণিকোঠায়, আর্য্যধর্ম্ম-গ্রন্থের পাতায় পাতায়।

বন্দে শ্রীবিগ্রহ-চরণম্

(২)

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে যাহা-কিছু বিরাজমান এবং উৎসৃজ্যমান, শুধু তাহাই যে কেন্দ্রাভিমুখী-গতিসম্পন্ন, তাহা নয়, গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র, সূর্য্য-মহাসূর্য্য অর্থাৎ নিখিল বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার রচনাতেই এই কেন্দ্রাভিমুখী-গতি বিদ্যমান। এই তত্ত্ব হইতে ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে, মানুষও স্বরূপতঃ কেন্দ্রমুখী। কোন বস্তুকে পৃথিবীর সমতল পৃষ্ঠে পরিমাপ করিয়া পুনরায় পর্ব্বতোপরি পরিমাপ করিলে যেরূপ তাহার ওজন হ্রাস পায় অর্থাৎ তাহার কেন্দ্রাভিমুখী-গতিতে ন্যূনতা দেখা দেয়, সেইরূপ মানুষও যখন জন্মজন্মানুক্রমিক বিচিত্র কর্ম্ম-সংস্কার দ্বারা তাহার আত্মাকে আবরিত করিয়া ফেলে, তখন সে কেন্দ্র অর্থাৎ পরমাত্মার সমাকর্ষণ হইতে দূরে সরিয়া যায়। কিন্তু কেন্দ্রাধিপতির রচনার অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার সমাকর্ষণ একেবারে পরিহার করিয়া চলিবার তাহার উপায় নাই। এই সমাকর্ষণ তাহার

অবোধ্য হইতে পারে, কিন্তু উহার প্রভাব তাহার বোধের বাহিরেও তাহা: উপর বিদ্যমান আছেই।

শ্রীচৈতন্যের চিৎস্পন্দন মুখরিত, প্রেমাভিসিঞ্চিত বাণী আমরা শুনিয়াছি—

"কৃষ্ণের যতেক লীলা
সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।"

নরলীলাই কেন্দ্রাধিপতির শ্রেষ্ঠতম লীলা ; আর এই লীলা তিনি যুগে যুগে অভাগা, অন্ধ জীবের প্রত্যক্ষ বোধগম্যতার তরে তাহার ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রকটায়িত করেন, তাঁহার নরবপুর ভিতর দিয়া। জীবের পক্ষে এরূপ সমুন্নত আশা-ভরসার অগ্নিবাণী আর কোথায় ধ্বনিত হইয়াছে, একমাত্র আর্য্য ভারত ছাড়া ?

রামানন্দ রায় নীলাচলে শ্রীচৈতন্য-চরণ দর্শন করিতে আগমন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন কি না। পরে যাইয়া দর্শন করিব—রামানন্দ রায় এরূপ বলিলে শ্রীচৈতন্য কহিলেন,

"রায়, তুমি কি কার্য্য করিলে।
ঈশ্বর না দেখি কেনে আগে এথা আইলে॥"

রামানন্দ বলিলেন,

"চরণ রথ, হৃদয় সারথি।
যাহাঁ লঞা যায়, তাহাঁ যায় জীবরথী॥
আমি কি করিব মন ইঁহা লইয়া আইল।
জগন্নাথ দরশনে বিচার না কৈল॥"

রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়দেশ হইতে বৈষ্ণবগণ নীলাচলে আসিয়াছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহাদের পরিচয় জানিবার

ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভট্টাচার্য্য রাজাকে লইয়া এক সু-উচ্চ অট্টালিকায় আরোহণ করতঃ একে একে তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিলেন। তারপর রাজা প্রশ্ন করিলেন, তাঁহারা সকলে শ্রীজগন্নাথ দর্শন না করিয়া শ্রীচৈতন্যের বাসা অভিমুখে ধাবিত হইয়া চলিয়াছেন কেন? ভট্টাচার্য্য উত্তর দিলেন,

"এই স্বাভাবিক প্রেমরীত।
মহাপ্রভু মিলিবারে উৎকণ্ঠিত চিত ॥
আগে তাঁরে মিলি সবে তাঁরে সঙ্গে লইয়া।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবেন গিয়া ॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবনে গমন করিবেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে গদাধর পণ্ডিত এবং আরও ভক্তগণ চলিলেন। কটকে আগমন করিয়া শ্রীচৈতন্য গদাধর পণ্ডিতকে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস অর্থাৎ নীলাচল-বাস পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। তাহার ফলে উভয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত প্রকার কথোপকথন হইল :—

পণ্ডিত— "যাহাঁ তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল ॥"
শ্রীচৈতন্য—"ইহাঁ (কটকে) কর গোপীনাথ সেবন।"
পণ্ডিত— "কোটী সেবা ত্বৎপদদর্শন।"
শ্রীচৈতন্য—"সেবা ছাড়িবে আমায় লাগে দোষ।
ইহাঁ রহি সেবা কর, আমার সন্তোষ ॥"
পণ্ডিত— "সব দোষ আমার উপর।
তোমা সঙ্গে না যাইব, যাব একেশ্বর ॥"

গদাধর পণ্ডিত অবশ্য শ্রীচৈতন্যের পদানুসরণ করিতে পারিলেন না। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের হাতে সঁপিয়া দিয়া একাকীই গৌড়ে

চলিলেন। এই প্রসঙ্গে সন্তশাস্ত্রের একটি বাণী স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে। বাণীটি এই :—

"পপিহা অপনা পণ নহি ত্যাগে।
জ্বলে পতঙ্গা জ্যোতি আগে ॥
মছলি কো জৈসে জলধারা।
গুরুমুখ কো সতগুরু অস প্যারা ॥"

চাতক পক্ষী যেরূপ মেঘবারি পান করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে না, পতঙ্গ অগ্নিতে আত্মসমর্পণ করিয়া পুড়িয়া ভস্মীভূত হয়, কিন্তু আত্ম-সমর্পণের দুর্ব্বার ইচ্ছাকে যেরূপ দমন করিতে পারে না, জল যেরূপ মৎস্যের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় বস্তু, সেইরূপ গুরুমুখী মানব সর্ব্ব-প্রাণতায় গুরুকে অনুসরণ করিয়া তাঁহারই চরণে আত্ম-সমর্পণ করিবার ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করিতে পারেন না, সদ্‌গুরু তাহার অস্তিত্বের একমাত্র প্রতীক।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য অভেদ পরমাত্মা। শ্রীচৈতন্য ঈশ্বর। পতঞ্জল ঋষি ঈশ্বরের সংজ্ঞা দিয়াছেন এইরূপ :—"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্ট পুরুষ-বিশেষ ঈশ্বরঃ"—ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনিই ঈশ্বর।

ক্লেশ—অজ্ঞানাদি এবং তজ্জাত দুঃখ।

কর্ম্ম—নানাপ্রকার ক্রিয়া।

বিপাক—কর্ম্মপ্রতিক্রিয়া যাহা সুখ-দুঃখাদির ভোগ নামে পরিচিত।

আশয়—সংস্কার বা কৃতকর্ম্মের ছাপ। গলিতার্থ এই যে, যিনি জীবের ন্যায় ক্লেশভোগী নহেন, যিনি সর্ব্বকর্ম্মবিপাকবিমুক্ত, যিনি সংস্কারাতীত, যিনি পরাৎপর, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ—তিনিই ঈশ্বর। সহজ কথায় যাঁহার ভিতরে ঈশ্বরের চেতনা অভিব্যক্ত হইয়া মানুষের বোধলোকে প্রসর্পিত হয়, তিনি মানুষের ঈশ্বর। ঋষি পতঞ্জল আরও বলিয়াছেন, "স পূর্ব্বেবামা

গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ”—তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুদিগেরও গুরু বা উপদেষ্টা অর্থাৎ তিনি পূর্ব্বতনেরই অভিপ্রকাশ, কালের দ্বারা তিনি পরিচ্ছিন্ন নহেন। শ্রীচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ তাঁহারাও তাঁহাদের ইষ্টে বা গুরুতে আনত ছিলেন। যাঁহারাই গুরুকৃপাবলে ঈশ্বরকে বোধ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহাও লিখিয়া গিয়াছেন,

“উত্তমো ব্রহ্ম-সদ্ভাবো ধ্যান-ভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জ্জপোঽধমোভাবো বহিঃ-পূজাঽধমাধমা॥”

ব্রহ্ম সদ্ভাবই উত্তম; আর যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই ঈশ্বর বা কেন্দ্রাধিপতির রক্তমাংসসঙ্কুল জীবন্ত প্রতীক।

আর্য্য-হিন্দুর স্মৃতির মণিকোঠায়, আর্য্যধর্ম্ম-গ্রন্থের পাতায় পাতায় প্রতিমা-বিগ্রহের যে অলৌকিকত্ব পরিবিরাজমান, গুরুবিগ্রহ সেই প্রতিমা-বিগ্রহকেও ছাপাইয়া উর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছেন।

বন্দে শ্রীগুরুবিগ্রহ-চরণম্

প্রাচীন ভারতে দৃষ্টি-নিক্ষেপ

(১)

প্রাচীন ভারতের সবিশেষ পরিচয়-স্থল বেদগ্রন্থ। বেদ সম্বন্ধে বৃহস্পতি না কি বলিয়া গিয়াছেন, "ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচরাঃ। অথর্ব্ব-বেদ সংহিতা-বেদ বা বেদের পরিশিষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাই, বেদের অপর নাম ত্রয়ী এবং এই ত্রয়ীকে ধরিয়াই বৃহস্পতি না কি বেদকর্ত্তৃদিগকে গালিগালাজ করিয়াছেন। চার্ব্বাকও না কি তাঁহাদিগকে গালি পাড়িয়া নাস্তানাবুদ করিতে কম করেন নাই। আমরা তাঁহাদের তৎপ্রকার গালিগালাজের মর্ম্মার্থ আবিষ্কার করিতে অক্ষম। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৮২৯-১৮৫২ খৃষ্টাব্দ) ইউরোপে বেদগ্রন্থসমূহের চর্চ্চা আরম্ভ হয়। ইংরাজ পণ্ডিত রোসেন, ম্যাক্সমূলার—ফরাসী পণ্ডিত লাঙ্লে—জার্ম্মান পণ্ডিত উইগ্, গ্র্যাসম্যান যথাক্রমে ইংরাজী, ফরাসী ও জার্ম্মান ভাষায় বেদগ্রন্থ অনুবাদ করেন। উইলসন্, ষ্টিভেনসন্, অধ্যাপক হোগ প্রভৃতি ইংরাজ পণ্ডিতগণ ভারতে বেদ-গ্রন্থের প্রচার করিয়া প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। বেদের প্রতি কোন সময়েই শ্রদ্ধা ছিল না—এইরূপ লোক উনবিংশ শতাব্দীতে বাঁচিয়া থাকিলে হয়তঃ ঐ বিদেশী ভদ্রলোকদিগকে সহজে ক্ষমা করিতেন না।

যাহা গত হইয়াছে, তাহার উপর ভর করিয়াই অনাগতের উদ্ভব হয়। সরীসৃপ-জাতীয় জীব হইতে পক্ষীর উৎপত্তি, বানরের দেহ ফুড়িয়া মানুষ। সুতরাং যাহা হইতে সুকোমল নব কিশলয়ের উৎপত্তি, সেই গলিত-পলিত বৃক্ষকে বাপ-ঠাকুরদাদার আমলের পুরাতন বলিয়া উপেক্ষার দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে চলিবে কেন? মহেঞ্জোদারোর গর্ভ চিড়িয়া প্রাচীন ভারতের যে গৌরবদীপ্ত পরিচয় আবিষ্কার করা হইয়াছে, তদ্দর্শনে কোন্ ভারতবাসী উৎফুল্ল হইয়া উঠিবেন না? সুতরাং বেদগ্রন্থের মূল্য কখনও লুপ্ত হইবার নহে।

প্রাচীন ভারতের প্রতিবিম্বের অংশ লইয়া এই বেদগ্রন্থরূপ যে অমূল্য রত্ন কালজয়ী হইয়া এখনও আমাদের হৃদয়-মনের পোষকতা সাধন করিতেছে, সেই অমূল্য বস্তুর উৎপত্তি-কাহিনীতে যদি সর্ব্বজনবোধ্য বৈজ্ঞানিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়, তবে বেদের আসল বস্তুর যথার্থতা সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের সন্দেহের সমুৎপত্তি হওয়ার কারণ অবশ্যই ঘটে। বিষ্ণুপুরাণ বলেন, জগৎপিতা ব্রহ্মার চারি মুখ। তাঁহার পূর্ব্ব মুখ হইতে ঋগ্বেদ, দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ, পশ্চিম মুখ হইতে সামবেদ এবং উত্তর মুখ হইতে অথর্ব্ববেদ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে (বিষ্ণুপুরাণ—প্রথম অংশ, পঞ্চম অধ্যায়)। মনুসংহিতা বলেন, ঈশ্বর যজ্ঞকার্য্যসাধনার্থ অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ দোহন করিলেন (মনুসংহিতা—প্রথম অধ্যায়, ২৩ শ্লোক)। মনুসংহিতা অথর্ব্ববেদের নাম উল্লেখ করেন নাই। সায়নাচার্য্য বলেন, যজুর্ব্বেদ ভিত্তিস্বরূপ, তাহার উপর ঋক্ ও সামবেদ চিত্রিত হইয়াছে। সিদ্ধান্ত এই যে, অথর্ব্ব বেদ পরে রচিত হইয়াছে অর্থাৎ তাহার উৎপত্তির ক্ষেত্র ভিন্ন। মোটকথা, আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ ঘোষণা করিয়াছেন যে, বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয়।

ইংরাজীতে একটি কথা আছে—"God has made men after his own image."—অর্থাৎ জগদীশ্বর মনুষ্যদিগকে তাঁহারই মত করিয়া গঠন করিয়াছেন। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তই গঠন করিতে হয় যে, যিনি নিখিল বিশ্বের পিতা, তিনি এক জন বৈজ্ঞানিকও বটেন। তিনি যদি বৈজ্ঞানিক না হন, তবে গেলিলিও, এডিসন, মাইকেল ফ্যারাডে, আনষ্টাইন, জেম্‌স্ জীনস্, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতিকে আমরা বৈজ্ঞানিকরূপে লাভ করিতে পারিতাম না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিজ্ঞান বা কার্য্যকারণ-সম্পর্ক বিশ্বসৃষ্টির গোড়াতেই বিদ্যমান। এই অবস্থায় কোনও গ্রন্থ-বিশেষের উৎপত্তি-কাহিনীতে যদি এইরূপ কোন বিষয় সংযোজিত থাকে, যাহার কার্য্য-কারণ-ধারা আমরা সহজ বুদ্ধিতে আবিষ্কার করিতে অক্ষম হই, তবে যে

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী-পরিচালনায় আমরা সক্ষম, তাহা-দ্বারাই আমরা তৎগ্রন্থ বিশেষের উৎপত্তির বিষয় বিচার করিব না-কি ?

বেদ শব্দের উৎপত্তি বিদ্ ধাতু হইতে। বিদ্ ধাতুর অর্থ জানা সুতরাং বেদ শব্দের অর্থও জানা বা জ্ঞান। জ্ঞান বস্তুটি অনাদি ও অপৌরুষেয়। এই অর্থে বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয় বটে।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক তৎপ্রণীত 'আর্কটিক হোম ইন্ দি বেদজ' নামক গ্রন্থে ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, আর্য্য জাতির আদিম নিবাস ছিল উত্তর মেরুতে। তুষার যুগের অভ্যাগম জনিত প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে আর্য্যগণ উত্তর মেরু পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অবতরণ করিতে বাধ্য হন। এই তত্ত্বের আলোক-সম্পাতে তিলক উক্ত গ্রন্থে বেদের অনাদিত্ব এবং অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে যে পৌরাণিক মত প্রচলিত আছে, তাহার সহিত ঐতিহাসিক মতের যে সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি :—

পৌরাণিক মত—বেদ নিত্য, অনাদি এবং অপৌরুষেয়।

ঐতিহাসিক মত—উত্তর মেরুতে বৈদিক ধর্ম্ম তুষার যুগের পূর্ব্ব কালেও প্রবর্ত্তিত ছিল। কিন্তু তাহার আদিম উৎপত্তিকাল এখন পর্য্যন্তও আবিষ্কৃত হয় নাই।

পৌরাণিক মত—মহাপ্রলয়ে বেদলুপ্তি।

ঐতিহাসিক মত—তুষার যুগ যখন প্রচণ্ড হইয়া দেখা দিল, তখন বৈদিক ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি উত্তর মেরুতে অবলুপ্ত হয়।

পৌরাণিক মত—প্রলয়ের পর ঋষিগণ তপস্যাবলে বেদের সারমর্ম্ম অবগত হন এবং তাহা শ্রুতিপরম্পরায় সমাজে বর্ত্তমান থাকে।

ঐতিহাসিক মত—আর্য্যগণ উত্তর মেরুতে যে বৈদিক স্তোত্র গান করিতেন, তাহা তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিকট হইতে শ্রুতিপরম্পরায় লাভ

করিয়াছিলেন। তুষার যুগের পরেও তাহা শ্রুতিপরম্পরায় প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছিল।

তিলকের এই সমন্বয়-সাধনকার্য্যের স্বীকৃতির আলোকে দেখা যায়, বেদগ্রন্থের যাহা ঐশ্বরিক জ্ঞান বা ব্রহ্মবিজ্ঞান, তাহা যুগে যুগে ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে। সেই জ্ঞান বা ব্রহ্মবিজ্ঞান অনাদি, অপৌরুষেয় এবং নিত্য ত বটেই; কিন্তু মুদ্রিত অক্ষরে আমরা যে বেদ পাঠ করিতেছি, তাহাকে আমরা প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-কর্ম্মের ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিব না কেন?

আধুনিক কালের ইতিহাসে যে চিত্র যেরূপে স্থান পাইতেছে, বেদগ্রন্থেও তৎকালীন ভারতের চিত্র সেইরূপে স্থান পাইয়াছে। ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় দেখা যায়, প্রাচীন ভারতের আর্য্যগণ সতত ঈশ্বরের সান্নিধ্য খুঁজিয়া ফিরিতেন। ঋষিগণ ছিলেন সমাজের আদর্শ পুরুষ। তাঁহাদের সহায়কারী ছিলেন, অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা। আর্য্যগণ ঐশী শক্তির নানারূপ বিকাশে ইন্দ্র, অগ্নি, মরুৎ প্রভৃতি নাম দিয়া উপাসনা করিতেন। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা পরমপিতা যে এক, তাহা আর্য্যগণ সবিশেষ জানিতেন। ঋগ্বেদের দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম—বিশেষ করিয়া দশম মণ্ডলের একাধিক শ্লোকে তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।

বৈদিকযুগে যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি, হানাহানি যে সংঘটিত হইত না, তাহা নহে। সুদাস নামে মৎস্যদেশে এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তে তাঁহার দেশরক্ষা, রাজ্যশাসন এবং ধর্ম্মপ্রাণতা সম্পর্কে সুমধুর বর্ণনা আছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৩৩ সূক্তে তাঁহার যে একটি সঙ্গীত আছে, তাহা হইতে কয়েকটি বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"যাহারা স্বীয় দেশরক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ অঙ্গীকার করে, সংগ্রামে ঈশ্বরই তাহাদের নেতা হন।"

যুদ্ধগমনের পূর্ব্বে সুদাস প্রার্থনা করিতেছেন, "হে ঈশ্বর, এই নদীনদ-ভূষিত, সুবর্ষাসিক্ত ভূমির ধনধান্য তুমিই উৎপাদন করিয়াছ ও পোষণ করিতেছ,

এক্ষণে শত্রুকুল তাহা উৎসন্ন করিতে অগ্রসর। তুমি যাহার উৎপাদক, তুমিই তাহার রক্ষক হও। আমরা তোমার ক্রোধকেই প্রধান শত্রু বলিয়া জানি, অন্য শত্রু আমাদের নগণ্য।"

শত্রুর সহিত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়াও কেমন করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিবেন, তজ্জন্য সুদাস প্রার্থনা করিতেছেন, "হে ঈশ্বর, যেন সকল অবস্থাতেই আমরা তোমার প্রতিষ্ঠিত 'ঋত' (ধর্ম্মমার্গ) হইতে বিচলিত না হই,—তুমি সেই পথ দিয়া আমাদিগকে পাপের পারে লইয়া যাও।"

দেশের বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি সাধনের কর্ম্মকৌশল লাভ করিবার জন্য সুদাস প্রার্থনা করিতেছেন, "হে ঈশ্বর, আমাদিগকে সেই বিষয় উপদেশ কর, যাহা নিরন্তর ধন প্রদান করে; যাহাতে আমার শাসনাধীনা ধরিত্রীধেনু সহস্র ধারায় ক্ষীর প্রসব করিয়া আমার প্রজা বৃদ্ধি করে।"

ঋগ্বেদের ক্ষীণ বর্ণনার ভিতর দিয়াও আমরা রাজর্ষি সুদাসের যে সমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের পরিচয় লাভ করি, তাহা তৎকালীন ভারতের অখণ্ড রূপেরই পরিচায়ক বটে।

গৃৎসমদ ঋষির সুমধুর প্রার্থনা শুনুন। তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, "হে ঈশ্বর, আমাদিগকে ধন, সৌভাগ্য এবং কর্ম্মদক্ষতা দাও, আমাদের বাক্যাবলীকে পুষ্টিপ্রদ ও মিষ্ট কর। আমার পূর্ব্বপুরুষ যে ঋণ করিয়াছিলেন এবং আমি যে ঋণ করিয়াছি, তাহা যেন শোধ করিতে পারি, আমাকে যেন অন্যের উপার্জ্জিত ধন ভোগ করিতে না হয়।" (২।২[illegible]৬, ২।২৮।৯ ঋক্)

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে, ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ"—অথর্ব্ব বেদ

সর্ব্বপ্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাতমাত্রই সর্ব্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। বৈদিক ঋষি এই হিরণ্যগর্ভের প্রতীক **প্রণব বা ওঁকার তত্ত্ব** অবলম্বন করতঃ ধর্ম্ম সাধন করিতেন।

ধর্ম্মের মূলগত অর্থ, যাহা ধরিয়া রাখে অর্থাৎ ক্রমদৃঢ়ীকৃত অবস্থিতি হইতে যাহা পড়িয়া যাইতে দেয় না। সুতরাং প্রকৃতপক্ষেই যদি ধর্ম্মনীতি

উন্নতি সাধন করা যায়, তবে গৃহনীতি, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির উন্নতিও অনিবার্য্যরূপে দেখা দেয়। গৃহ, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ যাহাতে বিবর্দ্ধনের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতে পারে, তজ্জন্য সমাজবদ্ধ মানুষের স্বাবলম্বন স্পৃহাকে জাগরিত করিয়া অর্থ-বিত্ত আহরণে প্রবুদ্ধ হইতে হয়, ব্যবহারিক বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে খরতর করিতে হয়, চলন-চরিত্র ও বাক্যকে পোষণপ্রদ করিয়া তুলিতে হয়। বৈদিক যুগে ধর্ম্মের সাথে সাথে ধর্ম্মের এই অনুষঙ্গগুলিও যে তৎকালীন যুগোপযোগিতায় ক্রমোন্নতির পথে চলমান থাকিয়া ভারতকে জয়, যশ ও গৌরবে সমুদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল, ঋগ্বেদে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

(২)

রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রা' কাব্যে উর্ব্বশীকে প্রশ্ন করিয়াছেন—

"আঁধার পাথার তলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মাণিক মুকুতা লয়ে করেছিলে শৈশবের খেলা,
মণি-দীপ-দীপ্ত কক্ষে সমুদ্রের কল্লোল সঙ্গীতে
অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল-পালঙ্কে ঘুমাইতে কার অঙ্কটিতে ?"

এই উর্ব্বশী কে ? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "নারীর মধ্যে সৌন্দর্য্যের যে শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, উর্ব্বশী তাহারই প্রতীক।" অতএব রবীন্দ্রনাথের উর্ব্বশী কল্পনাময়ী। কিন্তু আমরা যদি তাহার বাস্তব রূপ খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করি, তবে আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ পর্য্যালোচনা করিতে হয়। যজুর্ব্বেদ সংহিতায় উর্ব্বশী-পুরূরবা দুইখানি অরণিকাষ্ঠ মাত্র। পদ্মপুরাণে উর্ব্বশী ইন্দ্র-সভার নর্ত্তকী। পুরূরবার সৌন্দর্য্য-বাণে বিদ্ধ হইয়া নৃত্যকালে তাল-মান ভঙ্গ করিয়া ফেলাতে ইন্দ্রের অভিশাপে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া পুরূরবার সহিত মর্ত্ত্যে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর তপস্যা ভঙ্গের জন্য তিনি

ইন্দ্র কর্ত্তৃক সৃষ্ট। হরিবংশে নারায়ণের বিরাট বপু হইতে অপরূপ রূপবত
উর্ব্বশী উৎপন্না।

• যাহা আমাদের জানার জগৎ, তাহার বাহিরের অজানিত রহস্য-তত্ত্ব লই
সেই জানার জগৎকে বুঝিতে চেষ্টা করিলে বুঝা যায় না, তাহার সহি
রহস্যই করা হয়। সুতরাং উর্ব্বশীকে জানিতে হইলে অন্য পথ অবলম্বনীয়।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত উর্ব্বশী-পুরূরবার উক্তি প্রত্যুক্তিতে
পূর্ণ। তাহার সারমর্ম্ম এই যে, রাজা পুরূরবা বহু পত্নী থাকা সত্ত্বে
অপরূপ লাবণ্যবতী উর্ব্বশীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের মূলে তিনি
কোনও বিষয়ে উর্ব্বশীর নিকট প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ ছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি
তিনি পালন করিতে পারেন নাই বলিয়াই উর্ব্বশী গর্ভাবস্থায় তাঁহাকে ছাড়িয়া
চলিয়া যাইতেছেন। চারিটি শরৎকাল তিনি পুরূরবার গৃহে ছিলেন
উর্ব্বশী রাজাকে বলিতেছেন, "সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে তোমার নিকট পাঠাইয়া
দিব।" রাজা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে না দেখিয়া সে কি কাঁদিবে
না?"—তখন উর্ব্বশী রাজাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন, "না কাঁদিবে না
আমি সতত তাহার মঙ্গল চিন্তা করিব।" উর্ব্বশী চলিয়া গেলেন। রাজা
ধর্ম্মকর্ম্মাদিতে মনোযোগ প্রদান করিয়া উর্ব্বশীর বিরহ-ব্যথা দূর করিবার
চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

উর্ব্বশী পুরূরবাকে যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা
বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে। প্রতিশ্রুতি এই যে, "উর্ব্বশীর গৃহ ভিন্ন পুরূরবা
অন্য কোথাও বিবস্ত্র হইতে পারিবেন না, (এই প্রতিশ্রুতি দ্বারা উর্ব্বশী
রাজার উপর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাই আমরা
বুঝিতে পারি) এবং উর্ব্বশী যে দুইটি কোমল লোমাবৃত উরনক বা মেষ সঙ্গে
লইয়া আসিয়াছিলেন, পুরূরবা উহাদিগকে উর্ব্বশীর শয়নগৃহে রাখিতে বাধা
দিতে পারিবেন না।" পুরূরবা গান্ধার দেশের (বর্ত্তমান আফগানীস্থান) রাজা
ছিলেন। তদ্দেশ বর্ত্তমানের ন্যায় পূর্ব্বেও মেষাদির জন্য বিখ্যাত ছিল

ঋগ্বেদের ১।১২৬।৭ ঋকে কোনও স্ত্রী স্বামীকে বলিতেছেন,—"আমার অঙ্গে অল্প লোম মনে করিও না, আমি গান্ধার দেশীয়া মেষীর ন্যায় লোমপূর্ণা এবং পূর্ণাবয়বা।" সুতরাং গান্ধার দেশীয়া, "পর্ব্বতচরা ও স্বাধীনতাপ্রিয়া" উর্ব্বশী পুরূরবার নিকট ধরা দিয়াও তাঁহার নিকট হইতে সহজেই ছুটিয়া যাইবার ফাঁক রাখিয়াছিলেন এবং তাহারই সহায়তায় ছুটিয়াও গিয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনা হইতে এইরূপই বুঝা যায়।

পুরূরবা-উর্ব্বশীর বংশাবলীর এক শাখার পরিচয় এই প্রকার :—

পুরূরবা-উর্ব্বশী

আয়ু	অনাধৃষ্টি
নহুষ	মতিনার
যযাতি	তৃংসু
যদু, পুরু	ঈলিন
	দুষ্মন্ত
রৌদ্রাশ্ব	ভরত

আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে রাজা সুদাস এবং গৃৎসমদ ঋষির কথা উল্লেখ করিয়াছি। পুরূরবার বংশ হইতেই রাজা সুদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গৃৎসমদ ঋষিও উক্ত বংশাবলীর অপর এক শাখায় উদ্ভূত হইয়াছিলেন। "পুরূরবা-উর্ব্বশীর বংশাবলী হইতে অনেক ব্রাহ্মণকুল ও ক্ষত্রিয়কুল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে তাঁহাদের বংশ 'ব্রাহ্ম-ক্ষত্রের' যোনি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে।" সুতরাং যদু-বংশের ও কৌরব-বংশের অর্থাৎ চন্দ্র-বংশের আদি মাতা এই উর্ব্বশীকে অরণিকাষ্ঠ অথবা "উষার রূপক" বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কষ্টকর বলিয়াই মনে হয়।

ডক্টর স্রেডার (Schrader) তৎপ্রণীত 'প্রিহিষ্টরিক এণ্টিকুইটিজ অব দি এরিয়ান পিপ্‌লস্' গ্রন্থে ভাষাতত্ত্বের সাহায্য লইয়া অবিভক্ত, আদিম আর্য্যগণের যে সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সুধীমণ্ডলীতে

সমাদর লাভ করিয়াছে। মধ্য-এশিয়ায় যাযাবর জীবন অতিবাহিত করার পর এই অবিভক্ত আর্য্যগণের যে শাখা গান্ধার দেশে উপনীত হইলেন, তাহাদিগকে লইয়াই প্রাচীন আর্য্য-ভারতের ইতিহাসের সূচনা।

প্রিয়দর্শী অশোক অথবা একান্ত আধুনিক কালের রাজা রামমোহনকে যেরূপ আমরা যুগ-বিশেষের প্রবর্ত্তক বলিয়া গণনা করিয়া থাকি, সেইরূপ পিতা মনু প্রাচীন ভারতের সভ্যতা-রাগদীপ্ত যুগের প্রবর্ত্তক বলিয়া গণনীয়। "মানব বলিতে এক্ষণে আমরা মানব জাতি বুঝি, কিন্তু বৈদিক ভাষায় মনু বংশীয় নরনারিগণই মানব বলিয়া পরিগণিত।" এই হিসাবে এবং মনুসংহিতা মতে পিতা মনু মানব-বংশের আদিম মানবই বটেন এবং পিতা মনুর কাহিনী প্রারম্ভে লইয়া যে মনু-বংশের পরিচয়-কাহিনী বা 'মনুসংহিতা' বিরচিত হইয়াছে, তাহার নামাকরণও সার্থক বটে। পিতা মনু ঋগ্বেদে বিশেষরূপে খ্যাত। কালে বিবস্বান্ নামক এক ব্যক্তি মনু উপাধি ধারণ করিয়া মানব-বংশে রাজা হন। তিনিই বৈবস্বত মনু।

বৈদিক যুগের পর উপনিষদের রচনা। উপনিষদ বেদের জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ শেষ ভাগ বা অন্ত বলিয়া তাহার অপর নাম বেদান্ত। এই বেদান্ত বা উপনিষদের সংখ্যা শতাধিক। তত্ত্বের গভীরতায় উহাদের ভিতর শ্রেণী-বিভাগ আছে। শঙ্কর, রামানুজ, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি উপনিষদের নানাপ্রকার টিকা-টিপ্পনী লিখিয়া উহাদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত সোপনহায়ার, দয়সন্ প্রভৃতির জীবনে উপনিষদ প্রভূত পরিমাণে আলোক বিকীরণ করিয়াছে। রাজা রামমোহন, বিবেকানন্দ, অরবিন্দের সাধনার মূলে আছে উপনিষদের প্রেরণা। বৈদিক এবং ঔপনিষদিক যুগের ঋষিগণ সত্য বা সূক্ষ্ম সত্তার অবস্থিতির ক্রমিক স্তরের আবিষ্কার সাধন করিয়া গিয়াছেন। অনেক উপনিষদ প্রণবকেই চরমতত্ত্ব বলিয়াছেন। আবার ধ্যানবিন্দু উপনিষদ **প্রণবস্ত্র্যগ্রং**—এইরূপ বলিয়াছেন।

আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন, চন্দ্রগুপ্ত, আকবরের সামরিক অভিযান

যদি দেশের ধনধান্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের একটা উন্নত অবস্থার পরিজ্ঞাপক হয়, তবে ব্রহ্মতত্ত্ব আবিষ্কারের অভিযানও দেশের সর্ব্বাঙ্গীন একটা উন্নত অবস্থারই পরিজ্ঞাপক বটে। দুর্ভিক্ষপীড়িত সামাজিক অবস্থার ভিতর দিয়া কোন প্রকার অভিযানই চলিতে পারে না। গৃহ, সমাজ, রাষ্ট্রকে বাদ দিয়া আধ্যাত্মিকতা লাভের প্রয়াস, আর মরণাস্তিকতার আমন্ত্রণ—একই কথা। বৈদিক ও উপনিষদিক যুগের ভারতে এই মরণাস্তিকতা ছিল না। তখন ছিল গৃহে, সমাজে, রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম্মের সর্ব্ব স্তরে জীবন ও বৃদ্ধির তৎকালোপযোগী একটা অবিরাম স্রোত-প্রবাহ।

(৩)

আদি কবি বাল্মীকি সর্ব্ব প্রথম প্রচলিত লৌকিক ভাষায় রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করেন। "যে কালে বৈদিক পন্থা বর্জ্জন করিয়া লৌকিক রীতিতে গ্রন্থরচনার সূত্রপাত হইয়াছিল, রামায়ণ সেই কালের গ্রন্থ। রামায়ণে যে আর্ষ প্রয়োগের ছড়াছড়ি দেখা যায়, তাহা বৈদিক সাহিত্যের প্রভাবেরই পরিচয় দান করে। মনু-টীকাকার কল্লুক ভট্ট লিখিয়াছেন, যাহা বৈদিক তাহাই আর্ষ।" পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের কাহারও কাহারও অভিমত এই যে, রামায়ণ 'এপিক' বা মহাকাব্য। তাঁহারা বলেন, ভারতবর্ষে যেরূপ রামায়ণ, প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে তেমনি ইলিয়ড। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "রাম যে একই কালে আমাদের কাছে দেবতা ও মানুষ, ইহা কখনও সম্ভব হইত না যদি এই মহাগ্রন্থের কবিত্ব ভারতবর্ষের পক্ষে সুদূর কল্পলোকেরই সামগ্রী হইত, যদি তাহা আমাদের সংসার-সীমার মধ্যে ধরা না দিত। * * * * ভারত-বাসীর ঘরের লোক এত সত্য নহে, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা তাহার পক্ষে যত সত্য।" (রামায়ণী কথা) হোমার, ভার্জ্জিল, মিল্টন, কালিদাস প্রভৃতি কল্পনার জালবুনানি দ্বারা যে মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, রামায়ণ কখনও তত্তুল্য গ্রন্থ নহে।

রামায়ণে মানব-চরিত্রের পাশাপাশি বানর-চরিত্র ও মনুষ্যভুক রাক্ষস চরিত্রের সমাবেশ এক অত্যদ্ভুত সামাজিক অবস্থার পরিজ্ঞাপক। কিন্তু আসলে কি তাহা সত্য ? জীব জগতের ক্রমাভিব্যক্তি সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বর্ত্তমানে পরিগৃহীত, তাহার অনুসরণে ইহা বলিতে হয় যে, নরে বানরে ও নরভুক্ রাক্ষসে মনুষ্যোচিত সখ্যতা বা শত্রুতা একটা সম্ভবাতীত ব্যাপার।

হনুমান এবং রাবণ চরিত্রের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় কপিকুল ও রাক্ষসকুলের সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত বোধে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হয় কি না, দেখা যাউক।

হনুমান কিষ্কিন্ধ্যার (আধুনিক মহীশূর) রাজা সুগ্রীবের সচিব। সুগ্রীবের আদেশে হনুমান ঋষ্যমূক পর্ব্বতে শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের পরিচয় গ্রহণ করিতে আসিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিলেন, তৎশ্রবণে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন, "বৎস, আমি সুগ্রীবের অন্বেষণ করিতেছিলাম, এক্ষণে তাঁহারই মন্ত্রী আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। ইনি বীর ও বক্তা, তুমি সস্নেহে মধুর বাক্যে ইহার সহিত আলাপ কর। ইনি যেরূপ কহিলেন, ঋক্, যজু ও সামবেদে যাহার প্রবেশ নাই, তিনি এরূপ বলিতে পারেন না। ইনি অনেক বার ব্যাকরণ শুনিয়া থাকিবেন। বিস্তর কথা কহিলেন, কিন্তু একটিও অপশব্দ ইহার ওষ্ঠে বহির্গত হয় নাই। ইহার কথাগুলি কেমন স্বল্পাক্ষর, সরল ও মধুর। যে রাজার এইরূপ দূত না থাকে, জানি না, তাঁহার কার্য্য কি প্রকারে সম্পন্ন হয়। ফলতঃ এতাদৃশ গুণবান্ লোক যাঁহার উত্তর-সাধক, তাঁহার সকল কার্যই কেবল বাক্যগুণে সফল হইয়া থাকে।" (কিষ্কিন্ধা কাণ্ড, তৃতীয়সর্গ)

লঙ্কায় গমন করিয়াও সীতা-উদ্ধারে বিফলকাম হইয়া হনুমান বিলাপ করিতেছেন, "আমি জানকীর উদ্দেশ না লইয়া সুগ্রীবের নিকট কোন ক্রমেই যাইতে পারিব না। সুতরাং আমি এই স্থানে বানপ্রস্থাশ্রম আশ্রয়-পূর্ব্বক তরুতলে বাস করিব। অথবা এই জীবনেই বা প্রয়োজন কি ?

আমি সাগরতীরে জলন্ত চিতা প্রস্তুত করিয়া এই দেহ ভস্মসাৎ করিব।" (সুন্দর কাণ্ড, এয়োদশ সর্গ)

অশোক বনে সীতার সন্ধান লাভ করিয়া কিরূপে সীতাকে সম্ভাষণ করিবেন, তৎবিষয়ে হনূমান এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, "যদি ব্রাহ্মণের ন্যায় সংস্কৃত কথা বলি, তাহা হইলে সীতা হয়তঃ আমাকে রাবণ জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত ভীত হইবেন, বস্তুতঃ এক্ষণে অর্থসঙ্গত মনুষ্য বাক্যে আলাপ করা আমার আবশ্যক হইতেছে।" (সুন্দর কাণ্ড, ত্রিংশ সর্গ)

সীতা উদ্ধারের পর অযোধ্যায় গমন করার পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্র হনূমানকে ভরতের নিকট প্রেরণ করেন। হনূমান ভরত সমীপে যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "আপনি যে দণ্ডকারণ্যবাসী, জটাচীরধারী রামের জন্য এইরূপ শোক করিতেছেন, তিনি আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনি দারুণ শোক পরিত্যাগ করুন। রামের সহিত অচিরাৎ আপনার সাক্ষাৎ হইবে। তিনি রাবণকে বধ ও জানকীকে উদ্ধার করিয়া পূর্ণ মনোরথে মহাবল মিত্রগণ ও তেজস্বী লক্ষ্মণের সহিত আগমন করিতেছেন।" (যুদ্ধকাণ্ড, ষড়বিংশ সর্গ)

বাল্মীকি হনূমানের অন্তর্নিহিত সদ্গুণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "হনূমান তেজ, বীর্য্য, যশ, সরলতা, সামর্থ্য, বিনয়, নীতি, পৌরুষ, বিক্রম ও বুদ্ধিসম্পন্ন।" (যুদ্ধকাণ্ড, ঊনত্রিংশ সর্গ)

এক্ষণে রাবণ সম্পর্কে আলোচনা করা যাউক। লঙ্কায় গমন করার পর হনূমান রাবণ সমীপে নীত হইলে রাবণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "আপনি ধর্ম্মার্থদর্শী, তপোবলে ধনধান্য সংগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং পরস্ত্রীকে অবরোধ করিয়া রাখা আপনার উচিত হইতেছে না। যে কার্য্য ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ও অনিষ্টমূলক, তদ্বিষয়ে ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনই প্রবৃত্ত হন না।" (সুন্দর কাণ্ড, একান্ন সর্গ)

যুদ্ধের আশঙ্কা যখন প্রবল হইল, তখন বিভীষণ রাবণকে উপদেশ

দিতেছেন, "রাজন্, ক্রোধরিপু সুখ ও ধর্ম্ম নাশের কারণ। আপনি এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করুন। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লোকানুরাগের নিদান। আপনি এক্ষণেই তাহা রক্ষা করুন। অধার্ম্মিকের পক্ষে স্বর্গসুখলাভ সফল হইবার নহে। আপনি জানকীকে পরিত্যাগ করুন। প্রসন্ন হউন। ইহাতে আমরাও স্ত্রী-পুত্র লইয়া সুখী হইব।" (যুদ্ধকাণ্ড, নবম সর্গ)

যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণের প্রথম দর্শন লাভে শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন, "রাবণ কি তেজস্বী! ইঁনি স্বীয় প্রভাজালে সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া আছেন। বলিতে কি ইঁহার সর্ব্বাঙ্গ তেজপুঞ্জে আচ্ছন্ন বলিয়া আমি ইঁহার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিলাম না। ইঁহার যেমন দেহভাগ্য, দেব ও দানবেরও এরূপ নহে।" (যুদ্ধকাণ্ড, ঊনষষ্ঠি সর্গ)

রাবণের মৃত্যুতে তাঁহার প্রধানা মহিষী মন্দোদরী বিলাপ করিতেছেন, "তোমার এই মুখ উজ্জ্বলতায় সূর্য্য, কমনীয়তায় চন্দ্র, শোভায় পদ্মের তুল্য। আমি হতভাগিনী, তাই আমার বৈধব্যদশা ঘটিল।"

রাবণের শেষকৃত্যও বেদবিধি অনুসারে সম্পন্ন করা হইয়াছিল। বিভীষণ কৃতস্নান হইয়া আর্দ্রবস্ত্রে দর্ভমিশ্রিত তিলোদকে তাঁহার তর্পণ করিয়াছিলেন। "বেদবেদাঙ্গবিৎ ও যজ্ঞশীল ব্রহ্মরক্ষঃগণ" তখন বেদধ্বনি করিয়াছিলেন।

হনূমানের চরিত্র সমালোচনায় আমরা তাহাকে "কামনাশূন্য, বিলাস-বিহীন দৃষ্টি-সমন্বিত, তীক্ষ্ণভাবে ভবিষ্যৎ-দর্শী, ঋষির ন্যায় স্বীয় চরিত্রের কঠোর বিচারক, ত্যাগী ও স্থির-লক্ষ্য" বলিয়া বুঝিতে পারি। রাবণের সমালোচনায় আমরা তাঁহাকে দিব্যকান্তিবিশিষ্ট, মহাশক্তিশালী, কূটনৈতিকবুদ্ধি-সম্পন্ন, দুৰ্দ্ধর্ষপ্রকৃতিবিশিষ্ট, কৌশলী এবং যে শক্তি হইতে নিখিল বিশ্বের রচনা, সেই শক্তি বা উৎসের একান্ত বিরোধী বলিয়া বুঝিতে পারি।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের ঘোষণা এই যে, আর্য্য ও ভারতীয় অনার্য্য (দ্রাবিড় জাতীয়) মানবের উৎপত্তি সমসাময়িক। সুতরাং এই তথ্যদ্বারা এই সিদ্ধান্তই গঠিত হয় যে, আর্য্যগণ জীবন ও বৃদ্ধি লাভের যে কৌশল আয়ত্ত করিয়াছিলেন,

অনার্য্যগণ তাহা আয়ত্ত করিতে না পারিলেও সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করিবার অপরিহার্য্য প্রয়োজনে তাহারা একটা সামাজিক ব্যবস্থা এবং তদনুপাতিক একটা সভ্যতাও ভারতবর্ষে গঠন করিয়াছিলেন এবং তাহা ভারতীয় আর্য্যগণের সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীনতরই ছিল। অপর পক্ষে ইহাও বক্তব্য যে, রামায়ণী যুগে দক্ষিণ ভারত সম্পূর্ণরূপে অনার্য্যগণ-কর্ত্তৃক অধ্যুষিত থাকিলেও তৎকালে দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বতোপত্যকা বা সুরম্য উপবনে দুই একটি আর্য্য ঋষির আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বটে। এই অবস্থায়ও ভারতে আর্য্য বসতি যে সুপ্রাচীনত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা হনুমান এবং বিশ্রবা মুনির পুত্র রাবণকে আর্য্য ও অনার্য্য রক্তের সংমিশ্রণ হইতে জাত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে কোন বাধা দেখি না। আর্য্য-বৈশিষ্ট্য তাহাদের স্বভাবে আংশিকরূপে পরিস্ফুরিত হইয়াছিল, ইহা যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তবে সমগ্র কপিকুল এবং রক্ষঃকুলেও তাহা ক্রমিকভাবে বিসর্পিত হইয়াছিল, ইহা ধরিয়া লইবার কোনই কারণ নাই। তাই বলিয়া হনুমানের স্বজাতি কপিগণ চতুষ্পদী বানর ছিলেন, ইহা কখনও সমর্থনযোগ্য নহে এবং কদাকৃতিবিশিষ্ট ও নিকৃষ্ট স্তরের অনার্য্য মনুষ্য রাবণের স্বজাতীয় রক্ষঃগণও মনুষ্যেতর জীব ছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবারও কোন কারণ দেখি না। এই অবস্থায় রামায়ণের কপিকুল ও রক্ষঃকুলকে যথাসঙ্গতভাবেই মানবোচিত পর্য্যায়ে উত্তোলন করিয়া লইলে রামায়ণী যুগের ভারতীয় মানব-সমাজের সমাজ-বিজ্ঞান-বিরোধী চিহ্ন-সকল দূরীভূত হইয়া যায়; ফলে আমরা তৎকালীন ভারতের একটি স্বচ্ছতর চিত্রের সহিত পরিচিত হইতে পারি।

আপন আপন অস্তিত্বকে মননে ও কর্ম্মে বিস্তারশীল করিয়া তোলার মূলে যে নীতি বিদ্যমান, তাহাই আর্য্যনীতি। এই নীতিকে সক্রিয়তার ভিতর দিয়া চালাইয়া লইয়া সার্থকতায় প্রতিষ্ঠা করিবার কার্য্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম পারিপার্শ্বিক হইতে যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন সমুপস্থিত হয়, আর্য্যগণ সতত তাহার উপর তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিতেন। রামায়ণী যুগের আর্য্যগণ আত্মিক উন্নয়নে বৈদিক ও

ঔপনিষদিক যুগ হইতে অধিকতর অগ্রবর্ত্তী হইলেও তৎকালীন ঋষিবর্গের গৃহে অবস্থান এবং গৃহধর্ম্ম-পালন-কার্য্য প্রচুর পরিমাণেই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্রের কৌলগুরু, আর্য্যকুলগৌরব বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, অত্রি, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ গৃহী ছিলেন।

লক্ষ-কোটী হিন্দুর চক্ষে রামায়ণী যুগের কেন্দ্রপুরুষ শ্রীরামচন্দ্র ভগবানের অবতার। এই অবতারত্ব বা দেবত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।" (রামায়ণী কথা)

ভরত শ্রীরামচন্দ্রের অনুসরণে চিত্রকূট পর্ব্বতে (যুক্তপ্রদেশের আধুনিক কাম্‌তা পাহাড়) গমন করিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিলে শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে রাজ্যের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসাচ্ছলে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার ভিতরে আমরা তৎকালীন ভারতের রাজনীতি, রণনীতি, ধর্ম্মনীতি, গৃহনীতি, শিল্প-বাণিজ্য নীতির যে পরিচয় লাভ করি, তাহা বৈদিক ও ঔপনিষদিক যুগ অপেক্ষা উন্নততর অবস্থারই পরিজ্ঞাপক বটে। অর্থাৎ সমাজ ও সভ্যতার ক্রম-বিবর্ত্তনে রামায়ণী যুগ তখন অধিকতর সংস্থিত, অধিকতর বলিষ্ঠ ও অধিকতর ক্রিয়াপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল।

(৪)

রামায়ণী যুগের আলোচনায় আমরা দেখিতে পাইয়াছি, তৎকালে সংস্কৃত ভাষাই আর্য্যগণের প্রচলিত ভাষা ছিল, কিন্তু মহাভারতীয় যুগে আমরা তাহার ব্যতিক্রম দেখি। রামায়ণী যুগে আর্য্যসভ্যতা দক্ষিণ ভারতে সুবিস্তার লাভ করে নাই; কিন্তু মহাভারতীয় যুগে তাহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

রামায়ণের ন্যায় মহাভারত সম্বন্ধেও ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ যথেষ্ট

আলোচনা করিয়াছেন এবং কেহ কেহ মহাভারতকেও 'এপিক' বা মহাকাব্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহা সত্য যে, রামায়ণের ন্যায় মহাভারতেও অতিপ্রাকৃত ঘটনার বাহুল্য বিদ্যমান। কালের স্রোতে ভাসমান অবস্থায় বিভিন্ন গ্রন্থকারের হাতে পড়িয়া মহাভারতেও গল্পরূপ আবর্জ্জনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অন্তরালে ঐতিহাসিক সত্যের অনির্ব্বাণ আলোক একান্তভাবেই সমুজ্জ্বলতায় দেদীপ্যমান। অধিকন্তু রামায়ণের ন্যায় মহাভারতও নৈতিক প্রেরণায় আমাদের মননে, চরিত্রে, সমাজ-জীবনে এমনি এক পবিত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, তাহা হইতে আমাদের বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবার উপায় নাই।

মহাভারতের আদি পর্ব্বের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে, "পুণ্যাত্মা লোকদিগের জন্য এই শত সহস্র (লক্ষ) শ্লোকাত্মক মহাভারত প্রণীত হইয়াছে, কিন্তু ব্যাসদেব প্রথমে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে এই মহাভারত-সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন।" পণ্ডিত ব্যক্তিগণের সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, গল্পাংশ পরিত্যাগ করিলে মহাভারতের মূল শ্লোকের সংখ্যা এরূপই হয়।

রাবণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ যেরূপ রামায়ণকে, সেইরূপ পাণ্ডবদিগের সহিত কৌরবদিগের যুদ্ধও মহাভারতের ঘটনাবলীর বৃহত্তম অংশকে কৃষ্ণ ছায়ায় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে।

এই যুদ্ধ নিবারিত করিতে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। এমন কি তজ্জন্য তিনি দুর্যোধনাদির কটূক্তি, অপমান ও লাঞ্ছনাকে বরণ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন বুঝিলেন, দুর্যোধনাদির অন্যায় সংগ্রাম-লিপ্সা দূরীভূত হইবার নহে, তখন তিনি ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা পাণ্ডবগণকে সম্যক্ প্রকারে বুঝাইয়াছিলেন। সন্ধির প্রস্তাব লইয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর (আধুনিক দিল্লী) যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহারই শিক্ষাদীক্ষা-প্রাপ্তা দ্রৌপদী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "হে জনার্দ্দন, অবধ্যকে বধ করিলে যেরূপ দোষের সম্ভাবনা, বধ্যের

অবধেও যে সেইরূপ দোষে পতিত হইতে হয়, তাহা ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন।"

কুরুপাণ্ডব-সংগ্রামে ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি ছিল না। এই সংগ্রাম সম্পর্কে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিতেছেন, "আমার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিও না। যুদ্ধবিগ্রহে আমার মত ছিল না। আমার পুত্রে এবং পাণ্ডুপুত্রে আমি কোন পার্থক্য দেখি না। পুত্রেরা আমাকে বৃদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য করে। আমি নেত্রহীন ও দীন, সুতরাং পুত্রস্নেহে আমি সমুদয় সহ্য করি।"

রামায়ণের যুদ্ধ সম্পর্কে যেরূপ, মহাভারতের যুদ্ধ সম্পর্কেও সেইরূপ একটি প্রশ্ন সমুদিত হয়, যাহার মীমাংসা সাধন আবশ্যক বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক সূত্র-পরম্পরায় তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, শ্রীরামচন্দ্র-হনুমান-রাবণ-বিভীষণাদি এবং শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণ-দুর্যোধনাদিকে ঐতিহাসিক সূত্র-পারম্পর্য্যের ভিতর প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম না হইলেও আমরা তাঁহাদিগকে ঐতিহাসিক পুরুষ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছি। এতৎপ্রকার বোধভঙ্গিমায় যে প্রশ্নটি আমাদের চিত্তে জাগ্রত হইয়াছে, তাহার যে মীমাংসা আমরা লাভ করিয়াছি, তাহা যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা কোন বাধা দেখি না। প্রশ্নটি যদি প্রশ্নই থাকিয়া যায়, তবে রামায়ণ-মহাভারতকে যাহারা 'এপিক' বা মহাকাব্য বলিয়া ঘোষণা করেন, তাহারা আমাদের দ্বারাই সমর্থিত হন। প্রশ্নটি এই যে, রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধ সম্পর্কে আমরা যে সব অস্ত্রশস্ত্র এবং যে আকাশবিহারী রথের পরিচয় লাভ করি, তাহা বিজ্ঞানসিদ্ধ কি না? প্রাক্ বৈদিক যুগের দ্রাবিড়ী সভ্যতার যে পরিচয় মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার ভূগর্ভে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তৎকালীন ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রচুর সাক্ষ্য আছে। দ্রাবিড়ী সভ্যতা অপেক্ষা আর্য্য সভ্যতা উন্নততর বলিয়া যখন পরিগৃহীত হইয়াছে, তখন আর্য্যগণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দ্রাবিড়িগণের অপেক্ষা উন্নততর ছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত স্বতঃই গঠিত হয়। আমাদের অভিমত এই যে, লঙ্কা ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পরস্পর বিবাদমান পক্ষদ্বয় যে সকল মরণাস্ত্র ব্যবহার

করিয়াছিলেন, তাহা বিজ্ঞান বলেই আবিষ্কৃত হইয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই ব্যবহৃত হইয়াছিল। অবশ্য এরূপ লিখিয়া আমরা তৎ-তৎ-কালীন ব্রাহ্মণ্য গৌরবের পুণ্যপ্রভায় জ্যোতিষ্মান্ যোদ্ধ-বিশেষের তপঃসিদ্ধ মন্ত্রশক্তির কাহিনী অস্বীকার করিতেছি না। মোটামোটি আমাদের বক্তব্য এই যে, দশাননের যেরূপ, দুর্য্যোধনাদিরও সেইরূপ বিজ্ঞানদৃপ্ত স্বেচ্ছাচারই লঙ্কা ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালের অর্থাৎ ঐতিহাসিক যুগের যুদ্ধবিগ্রহে আমরা যে সমস্ত মরণাস্ত্রসমূহের পরিচয় লাভ করি, যাহা বৈদেশিক শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়া ভারতের মৌলিক আবিষ্কৃত অস্ত্ররূপে পরিগণিত, তাহা রামায়ণী ও মহাভারতীয় যুগেরই দান ব্যতীত আর কিছু নহে।

মহাভারতীয় যুগে শিল্পকলা কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহা ময়-কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত যুধিষ্ঠিরের রাজসভার বিবরণে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ হয়। মহাভারতের আদি পর্ব্ব এবং উদ্যোগ পর্ব্ব হইতে তৎকালীন ভারতবাসীর অর্ণবযান-দ্বারা বিস্তৃত সমুদ্র অতিক্রম করার বিষয়ও অবগত হওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের অভিষেক উৎসবে কাম্বোজ রাজ, গান্ধার রাজ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের ভগদত্ত, মধ্য এশিয়ার শকতুখারাদি জাতিগণ এবং লঙ্কাদ্বীপবাসিগণ যে সকল মহামূল্যবান্ শিল্পদ্রব্য উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবর্ষের অতুলনীয় সম্পৎ-সমৃদ্ধি, সভ্যতা ও বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্বরূপতার পরিচায়ক বটে। উপরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যুদ্ধোপকরণের বৈজ্ঞানিকতা সম্পর্কে আমরা যে মত ব্যক্ত করিয়াছি, মহাভারতীয় যুগের ভারতবর্ষের এই শিল্পকুশলতা এবং সভ্যতা-সমৃদ্ধি ও বিজ্ঞানের এই কেন্দ্রস্বরূপতা তাহার পোষকতাই বিধান করিতেছে।

রাজা কি প্রকারে রাজ্য পরিচালনা করিবেন, তৎসম্পর্কে শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, "যেরূপ ক্ষীরার্থী ব্যক্তি উধশ্ছেদন করিলে দুগ্ধ লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ অসদুপায় অবলম্বন করিয়া রাজ্যকে নিপীড়িত করিলে সেই রাজ্যের সমৃদ্ধি কখনও পরিবর্দ্ধিত হয় না। যেরূপ যে ব্যক্তি নিয়ত পয়স্বিনী গাভীর সেবা করে, সে-ই দুগ্ধ লাভ করে, সেইরূপ যে নরপতি

উপায়ানুসারে রাজ্য পালন করেন, তিনি সুখ লাভ করিয়া থাকেন। যেরূপ মাতা শিশুকে স্তন্য দান করেন, সেইরূপ বসুমতী নরপতি-কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা হইয়া দোগ্ধীর ন্যায় সকলকেই ধান্যহিরণ্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন। মহারাজ প্রসূনসঞ্চয়কারী মালাকারের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া রাজ্য রক্ষা করিবে।"

ভারতীয় রাজন্যবর্গের সকলে না হইলেও কেহ কেহ তখনও রাজ্য পালনে তৎপ্রকার আচরণই অবলম্বন করিতেন।

মহাভারতের হিড়িম্ব, কির্ম্মির, বক, ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষসবর্গকে আর্য্য-অনার্য্য রক্তের সংমিশ্রণ হইতে উদ্ভূত বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। রামায়ণী যুগের কপি-বংশের স্মৃতি মহাভারতীয় যুগে একেবারে বিলুপ্ত। সুতরাং তৎ সম্পর্কে আমাদের অভিমত নূতন করিয়া ব্যক্ত করিবার আবশ্যক নাই। পরবর্ত্তী কালে গৃহ-সংসার-বর্জ্জন-ভিত্তির উপর যে সন্ন্যাস ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, মহাভারতীয় যুগেও তাহার বিদ্যমানতা দেখা যায় না।

মহাভারত বহির্ভূত বিষয়ে অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের আলোচনায় প্রবেশ করিলে আমরা শ্রীকৃষ্ণের যে চরিত্রাংশ লাভ করি, তাহা ভক্ত প্রেমিকের নিকট মধুর হইতে মধুরতর, অকৈতব। শ্রীমতী রাধিকার যে মূর্ত্তিময়ী চিত্র ভক্তজনের মানসপটে চির অঙ্কিত, তিনি ছিলেন শব্দব্রহ্ম-স্বরূপিনী। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের ব্যক্ত নর মূর্ত্তিতে ধরাধামে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই রাধাতত্ত্বও ব্যক্ত নারী মূর্ত্তিতে প্রেমলীলাময়ী হইয়া ভৌম বৃন্দাবনলীলায় প্রকট হইয়াছিলেন। সন্তশাস্ত্র রাধাকে সোঽহংপুরুষের পত্নীরূপে অভিহিত করিয়াছেন এই রাধাতত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ **সোঽহং তত্ত্ব** বোধে তৎসৃষ্ট রচনার পালনপোষণ বিধান করিতেছেন। তাই, শ্রীমদ্ভাগবত মহাভারতীয় যুগের এই রক্তমাংসসঙ্কুল, জীবপ্রভু, কেন্দ্রপুরুষ সম্পর্কে কম্বুকণ্ঠে বলিয়াছেন, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।"

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে আর্য্যনীতি সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছি, তৎসম্পর্কে এই প্রবন্ধে ইহা লিখিতেছি যে, মহাভারতীয় যুগের কোন কোন ব্যষ্টিতে ঐ আর্য্যনীতি বলবৎ থাকিয়া অধিকতর উৎকর্ষপরায়ণ হইলেও সমষ্টির ক্ষেত্রে তাহা অবনতিপ্রাপ্ত।

বঙ্কিম সাহিত্যে নারী চরিত্র

(১)

আবহমান কাল হইতে যে নারী পুরুষের পার্শ্বে থাকিয়া তাহার সর্ব্ব কর্ম্মে উন্নত প্রেরণা প্রদান করিয়া মৃদুমন্দ পদ সঞ্চারে জীবন চলনায় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার যুগের সেই নারী-সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,—তাঁহার অমর সাহিত্যে। বঙ্কিম সাহিত্যের নারী-চরিত্রের আলোচনার আলোক-সম্পাতে বর্ত্তমান কালের চলমান নারী সমাজের আলোচনা করা যাইতে পারে কি ?

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনুপমেয় ভাষায় লিখিয়াছেন,

"সুন্দর কর সার্থক কর
পুষ্পিত আয়োজন,
তুমি এসো, এসো নারী,
আনগো তীর্থবারি।
স্নিগ্ধ হসিত বদন ইন্দু
সিঁথায় আঁকিয়া সিন্দূর বিন্দু
মঙ্গল কর, সার্থক কর
শূন্য এ মোর গেহ,
এসো কল্যাণী নারী,
বহিয়া তীর্থ বারি।"

ইহা পতিব্রতা নারীর বন্দনা গীতি।

পতিসেবার ভিতরে যে নারীর নারীত্ব ষোলকলায় পূর্ণ বিকশিত, ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বঙ্কিম সাহিত্যের দেবীর চরিত্র। স্বামীই যে নারীর ইহকাল, পরকাল, দেবতা, সব—যুগযুগপরম্পরানুগত এই মহান্ তত্ত্বের একটি জীবন্ত প্রতীক—বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-প্রতিমা দেবী চৌধুরাণী।

যাহার যাহার সমবায় লইয়া নারীর নারীত্ব, তাহার ভিতরে যদি অসমঞ্জস ব্যবস্থার উদয় হয়, তবে নারীত্ব হইতে তাহার শোচনীয় পাতিত্য ঘটে। পতিহীনা হইলে স্ত্রী আপনাকে একান্ত ভাগ্যহীনা মনে করেন। আর এই ভাগ্যহীনার উদ্ভব কোন সমাজ-বিশেষেই হয় না, সকল সমাজেই হয়। নারী-মাত্রই পতিহীনা হওয়ার চাইতে অধিকতম বিধিতাড়না এবং দুর্ভাগ্যের কল্পনা করিতে পারেন না। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, নারীর অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যই হইতেছে, পোষণপ্রদ কর্ম্মপ্রবণতায় স্বামীকে সমুন্নত করিয়া তোলা। নারী শব্দই আসিয়াছে, নারি ধাতু হইতে যাহার অর্থ বৃদ্ধি পাওয়ান। পতিহীনা হইলে নারীর এই বৈশিষ্ট্যের ঘোর অবমাননা হয়। তাই, পুনরায় বিবাহ না হইলে অবশিষ্ট জীবন ব্যাপিয়া নারী আপনাকে মৃতবৎ মনে করেন। ইহাই যদি নারীত্বের মৃত্যু, তবে তাহার জীবন নিশ্চয়ই পতির জীবনে ও বন্ধনে, পতির সেবায় ও পরিচর্য্যায়। আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের মত পাশ্চাত্যের নারীর ধর্ম্মচর্য্যারূপে পতিভক্তির সহিত পরিচয় না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারা যদি পতির পোষণকারিণী, পতির যশ ও বৃদ্ধির উন্নত প্রেরণাপ্রদায়িনী না হইবেন, তবে তাহাদের স্বামিগণ এত বড় হইয়া উঠিতেন না। পতি সেবা বলিতে কেহ কেহ বুঝেন, শুধু পতির চরণামৃত পান করা। পতি সেবা তাহা নহে। পতি সেবা অর্থ—সকল প্রকার সম্বর্দ্ধনার ভিতর দিয়া পতির সর্ব্বাঙ্গীন কুশলতা বিধান করা, পতিকে উচ্চ আদর্শে তুলিয়া ধরিয়া প্রতিষ্ঠা দান করা।

প্রফুল্লের মাতা সম্বন্ধে অমূলক কুৎসা শ্রবণ করিয়া হরবল্লভ প্রফুল্লকে গৃহে আনিলেন না। আধুনিক কালেও এমনি কত শ্বশুর অঙ্গীকৃত বরপণ কড়ায়-গণ্ডায় প্রদান করা হয় নাই বলিয়া, বিবাহের যৌতুকাদি পছন্দমত হয় নাই বলিয়া, বরযাত্রীর আদর-আপ্যায়ন তাহার রুচি অনুযায়ী হয় নাই বলিয়া কত বধূকে গৃহে আনয়ন করেন না; দেবতাকে সাক্ষী করিয়া যাহাকে পুত্রের সহানুচারিণী, অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী বলিয়া স্বীকার করিলেন, তাহাকে ঘরে তুলেন না। কিন্তু বধূ কেমন করিয়া আপনাকে ভরণপোষণ করিবে, ইহা

ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য নহে কি? আমি কি করিয়া খাইব—ইহা যখন প্রফুল্ল শ্বশুর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল, তখন হরবল্লভ পুত্রবধূকে উপদেশ দিলেন, চুরি ডাকাইতি করিয়া খাইও। শ্বশুর মহাশয়ের এই উপদেশকে শিরোধার্য্য করতঃ তদনুযায়ী চলিবার জন্য না হউক, দৈবনির্ব্বন্ধে প্রফুল্ল ভবানী পাঠকের হস্তে পড়িয়া দেবী চৌধুরাণীতে পরিণত হইল। ভবানী পাঠক প্রকৃতই দস্যুবৃত্তি পালন করিত কি না, সে বিচার আমরা করিব না। আমাদের বিচার্য্য বিষয় এই যে, বালিকা প্রফুল্ল সংসার-ধর্ম্ম-নিরতা নারী-সমাজ-হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক অভাবনীয় আবেষ্টনে নিপতিত হইলেও সে নারীত্বের সহজ সংস্কার হইতে স্খলিত হইয়াছিল কি না? প্রফুল্ল ঐ সংস্কার হইতে স্খলিত হয় নাই, অধিকন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই সংস্কার প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভে নিশি ঠাকুরাণীকেও বিমুগ্ধ করিল, যে নিশি ঠাকুরাণী, কৃষ্ণই স্বামী দেবতা—প্রফুল্লকে এই তত্ত্বের শিক্ষা প্রদান করিতে ভবানী পাঠক কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

দেবী নিশি ঠাকুরাণীকে বলিতেছে, "কখনও স্বামী দেখ নাই, তাই কৃষ্ণে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছ। স্বামী দেখিলে কখনও শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।"

পতিপরায়ণা নারী স্বর্গের সুষমাময়ী, স্বতঃ কল্যাণময়ী। ভবানন্দ গৌরী ঠাকুরাণীর গৃহে মহেন্দ্র সিংহের পত্নী কল্যাণীর নিকট বাক্য-বিগর্হিত আচরণ প্রকাশ করিয়া যথোচিত আত্মশাস্তি ভোগ করিয়াছে সত্য, কিন্তু পাতিব্রত্যের রিপুদলনকারিণী শক্তির রশ্মিচ্ছটাময়ী যে কল্যাণী, সেই কল্যাণী চিরকাল কল্যাণেই প্রতিষ্ঠিত থাকে, স্বামীকে এবং তাঁহার জগৎকে চিরকাল কল্যাণেই প্রতিষ্ঠিত রাখে।

আধুনিক কালে পুরুষের সাথে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিবার জন্য নারী-স্বাধীনতার এক আন্দোলন দেখা দিয়াছে। পুরুষের যোগ্যা সহধর্ম্মিণী, সহানুচারিণী, স্বামীর সর্ব্ব কর্ম্মে উন্নত-প্রেরণাদায়িনী হইবার জন্য, জ্ঞানে বুদ্ধিতে কর্ম্মে পুরুষের পৌরুষত্বকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার অস্তিত্বকে পরিপোষণ

করিবার জন্য নারীকে পুরুষের সমান তালে চলিবার শক্তি অর্জ্জন করিতেই হইবে; নারী-সমাজ পঙ্গু হইয়া থাকিয়া পুরুষ সমাজের উন্নতির সহস্র-ধারাকে অবরোধ করিতে না চাহিলে নারীকে স্বামীর সমকক্ষতা অর্জ্জন করিতেই হইবে। কিন্তু তাহা করণীয় হইবে, তাহাদের আপন আপন বৈশিষ্ট্যের প্রস্ফুরণশীলতার ভিতর দিয়া। তাহাদের বৈশিষ্ট্য যখন প্রস্ফুরিত হইয়া সৃজনকল হইয়া উঠিবে, তখনই হইবে নারী স্বাধীন।

পুরুষের প্রকৃতি ঋজু, বলিষ্ঠ, বিস্তৃতিসম্পন্ন—নারীর প্রকৃতি কোমল, নমনীয়, গভীর। পুরুষ বীজসদৃশ—নারী মাটী সদৃশ। পুরুষ আত্মশক্তি বলে পৃথিবীকে উপভোগ করে, আর নারী পুরুষের ভিতর দিয়া আপনাকে উপভোগ করিয়া সুখ পায়। মাধ্যাকর্ষণ যদি সত্য হয়, তবে ইহাও সত্য যে, নারী নারীই, নারী পুরুষ নহে। অতএব যাহাকে অবলম্বন করিয়া, যাহাকে উদ্বর্দ্ধন প্রদান করিয়া নারীর প্রাণন, ব্যাপন ও বর্দ্ধন, তাহাকে সেবা ও পরিচর্য্যার ভিতর দিয়া পোষণ-উদ্দীপনায় প্রগতিশীল করাই কি নারীর সর্ব্ব-প্রধান ধর্ম্ম নয় ?

"পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?"—নবকুমার যখন গহন অরণ্যে পথ হারাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া বিশুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন স্নেহ-মর্ম্মরিত, হর্ষ-বিকম্পিত ধ্বনি শুনিলেন—"পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?" কাপালিকের নরমাংসলোলুপতা কপালকুণ্ডলা তখন ভুলিয়া গিয়াছে; ভুলিয়া গিয়াছে যে, সে আজন্ম কাপালিকের দ্বারা প্রতিপালিতা, সে কখনও তাহার ইচ্ছা ও কর্ম্মের বিরুদ্ধে গমন করিতে পারে না। ঐ নিস্তব্ধ অরণ্যানীতে প্রিয়দর্শন, পথভ্রষ্ট যুবককে কাপালিকের হিংস্র নয়নের অন্তরাল করতঃ তাহার পথ দেখাইয়া দিবার জন্য তাহার যে নারীশক্তি শঙ্কাকম্পিত অথচ তেজোগর্ভ বাক্যের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল, আমরা তাহাকে তাহার নারীধর্ম্মের প্রসুপ্ত সংস্কারের ক্ষীণ প্রকাশ বলিয়া অভিহিত করিব. আপনাকে রিক্ত করিয়া পতিকে সমুন্নত প্রতিষ্ঠায় উন্নীত করিবার যে দুরন্ত স্পৃহা দুর্নির্দ্দিষ্ট কাল হইতে নারীপরম্পরানুগত ভাবে কপালকুণ্ডলার প্রবহমান

রক্তে নীড় বাঁধিয়াছে, আমরা তাহাকে তাহারই ক্রিয়মানতার একটুখানি প্রাক্ অভিব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করিব।

কপালকুণ্ডলা জনসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বনদেবীর মত আজন্ম বনে প্রতিপালিতা হইয়াছে। বনের শান্ত বিশালতার একটা মাদকতা আছে, যাহা মনের বিচরণক্ষেত্রের পরিধি বর্দ্ধিত করিয়া প্রাণে ভাবুকতার সৃষ্টি করে। এমনি রকমের মানসিক বিস্তৃতি ও ভাবপ্রবণতা লইয়া কপালকুণ্ডলা নবকুমারের গৃহে আসিয়াছিল। তাহারই জন্য কপালকুণ্ডলা পতিপরায়ণতায় সুনিবিষ্ট থাকিয়াও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিতে পারে নাই।

কাপালিকের কুচক্রান্তে এবং নিস্তব্ধ নিশীথের অনভিপ্রেত ঘটনা পারম্পর্য্যে নবকুমার সতীসাধ্বী কপালকুণ্ডলাকে অবিশ্বাসিনী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। কপালকুণ্ডলার কল্পিত-পতন-জনিত দুঃখে ও ক্ষোভে নবকুমার অপরিসীম দুঃখ বোধ করিলেন। অবশেষে কাপালিকের প্রদত্ত ভবানীর প্রসাদ পানে কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্য লাভ করিয়া কাপালিকের অভিপ্রায় অনুসারে কপালকুণ্ডলাকে মায়ের নিকট উৎসর্গ করাই উত্তম বলিয়া বোধ করিলেন। এতদুদ্দেশ্যে কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইবার জন্য নবকুমার কলকলপ্রবাহিনী গঙ্গার তটভূমিতে তাহাকে লইয়া আসিলেন, কিন্তু স্নান করাইতে পারিলেন না। কপালকুণ্ডলার পদতলে আছাড়িয়া পড়িয়া বলিলেন—"মৃণ্ময়ি, কপালকুণ্ডলে, আমায় রক্ষা কর, আমি তোমার পায়ে লুটাইতেছি। একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও। একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।" কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া কহিলেন—"তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই ?"

কথা অসঙ্গত নহে। ঘটনাস্রোত যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়া পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে, নবকুমার তাহার বহু পূর্ব্বে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া তিনি ইহাই বুঝাইলেন যে, তিনি কপালকুণ্ডলাকে অবিশ্বাসিনী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কপালকুণ্ডলাও তৎপূর্ব্বেই স্বামীর নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারিতেন। নবকুমার যখন যে প্রশ্ন তাহাকে

জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেই প্রশ্ন কখন তাহার হৃদয়ে প্রথম জাগিয়াছে কপালকুণ্ডলা তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এরূপ হইতে পারে যে নবকুমার প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। কিন্তু কপালকুণ্ডলাও তাহার স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখিতে পারেন নাই। প্রাণময়ী সেবাপটু উদ্দীপনায়, তাপিত জনের ব্যথা ভুলান সহানুভূতিতে কপালকুণ্ডলা পরিপূর্ণা। কপালকুণ্ডলার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাহার হৃদয়ের এই সম্প্রসারণশীলতা, তাহার নারীত্বের যে সহজাত সংস্কারকে দেদীপ্যমান করিয়া তুলিয়াছে, যে সংস্কারের অনুপ্রেরণায় তিনি এক দিন বলিয়াছিলেন—"পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?"—সেই সংস্কার সেই পথিককে তাহার জীবনীয় পথ হারাইতে দিল! কপালকুণ্ডলা অনন্ত প্রবাহ পরিপূর্ণা গঙ্গায় আত্মবিসর্জ্জন করিলেন; নবকুমারও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। পরিণাম শোকাবহ বটে!

(২)

নারী জনয়িত্রী। তাহার স্বভাবই ধারণ করা ও বৃদ্ধি পাওয়ান। যে সন্তান তাহার গর্ভে বীজরূপে প্রবেশ করে, আপন রসরক্তের পরিচর্য্যায় সে তাহাকে মূর্ত্ত করিয়া প্রাণ দেয়। আর নারী তাহার অন্তর নিঙড়ান সেবা ও সাহচর্য্য দ্বারা পুরুষকে যে প্রকারে উদ্দীপিত করে, পুরুষের নিকট হইতে সেই প্রকার উদ্দীপিত বীজই সে গ্রহণ করে। যে নারী পুরুষের মনোরঞ্জন-করতঃ তাহার চিত্তে প্রমোদ সঞ্চার করিতে পারে না সেই পুরুষের বীজ-সঞ্চরণ-ক্ষমতা বিনষ্টপ্রায় হইতে দেখা যায়। সুতরাং নরনারীর বিবাহ এই নীতি দ্বারাই নিয়মিত হওয়া আবশ্যক যে যে নরের যে বৃত্তি যে নারীতে যাইয়া পরিপোষিত হইবে, সেই নরকেই সেই নারী পতিরূপে গ্রহণ করিবে। তাহা হইলে পতি-পত্নী নির্ব্বাচনে নারীর প্রাধান্যই স্বাভাবিক হয়; অর্থাৎ নারীকেই ভাবী পতি মনোনয়ন করিতে হয়। ভাবী পতির গুণে মুগ্ধ হইয়া নারী যাঁ

তাহাকে বরণ করে এবং সেই নর যদি তাহাকে হৃষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন, তবে নর-কর্ত্তৃক ভাবী পত্নী মনোনয়নও প্রকারান্তরে সম্পাদিত হয় বটে, কিন্তু নির্ব্বাচন-ব্যাপারে নারী মুখ্য এবং নর গৌণ হওয়াই প্রকৃতিসঙ্গত। বিবাহের এই অন্তর্নিহিত মূল নীতি আংশিকরূপে পাশ্চাত্য দেশে প্রতিপালিত হইতেছে। নীতি-হিসাবে তাহা প্রতিপালিত নাও হইতে পারে, কিন্তু ভাবী পতিপত্নীর সম্মতিবিরহিতভাবে বিবাহ-কার্য্য সাধন করিবার যে অবৈজ্ঞানিক পন্থা, তাহা তৎ-দেশের প্রচলিত পন্থা নহে। নারীর ভাবী-পতি-নির্ব্বাচনে যদি ভ্রমও হয়, তথাপি সে স্বয়ং নির্ব্বাচনকারিণী বলিয়া পতিকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ-করতঃ তাহার চিত্ত প্রমোদকারিণী, মনোবৃত্ত্যনুসারিণী রূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবতী হইবেই।

রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারী রাজসিংহকে পত্র লিখিয়াছেন,— "মহারাজ! আমি এই পণ করিয়াছি, যে বীর আমাকে মোগল হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন, আর যদি তিনি আমাকে যথাশাস্ত্র গ্রহণ করেন, তবে আমি তাঁহার দাসী হইব। হে বীরশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধে স্ত্রী-লাভ বীরের ধর্ম্ম। সমগ্র ক্ষত্রকুলের সহিত যুদ্ধ করিয়া পাণ্ডব দ্রৌপদী লাভ করিয়াছিলেন। কাশীরাজ্যে সমবেত রাজমণ্ডলী সমক্ষে আপন বীর্য্য প্রকাশ করিয়া ভীষ্মদেব রাজকন্যাগণকে লইয়া আসিয়াছিলেন। হে রাজন্! রুক্মিণীর বিবাহ কি মনে পড়ে না? আপনি আজিও এই পৃথিবীতে অদ্বিতীয় বীর। আপনি কি বীরধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইবেন?"

চঞ্চলকুমারী ঔরঙ্গজেবের লুব্ধতা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য, পিতৃ-রাজ্যের আসন্ন বিপদ প্রতিহত করিয়া তাহার কুশল বিধানের জন্য রাজসিংহকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, এরূপ কেহ কেহ বলিতে পারেন। কিন্তু গুণমুগ্ধ অন্তঃকরণে শ্রেষ্ঠকে বরণ করিবার যে মনোবৃত্তি আশৈশব তাহার অন্তরে প্রসুপ্ত ছিল, ইহা কি তাহার চলন, বাক্ ও ব্যবহারে প্রকাশিত হয় নাই? এই মনোবৃত্তি বঙ্কিমচন্দ্র শুধু চঞ্চলকুমারীর হৃদয়ে প্রস্ফুটিত

করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। মৃণালিনী, হিরণ্ময়ী, তিলোত্তমা, আয়েষা, রাধারাণী, এবং দৃষ্টিহীনা রজনীকেও এই প্রাণতোষিণী মনোবৃত্তিতে বিভূষিত করিয়া নারী-গৌরব-মুখরিত আর্য্য ভারতের এক গরিমাময় পৃষ্ঠা আমাদের নয়নে মেলিয়া ধরিয়াছেন।

আধুনিক কালের সাহিত্যে নারীর পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া পুরুষের নারীকে প্রেম নিবেদন করিবার যে রীতি দেখা দিয়াছে, তাহা প্রচলিত সমাজ-জীবনের এক রুগ্ন প্রতিচ্ছবি। সমাজ ও সাহিত্য হইতে তাহার তিরোধান হইবে কবে ?

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সৃষ্ট নারী-চরিত্রের ভিতর কয়েক স্থানে সপত্নীর সমাবেশ করিয়াছেন। প্রফুল্ল, নয়ান বৌ, সাগর বৌ—ব্রজেশ্বরের সপত্নী। শ্রী, দেবী, নন্দা—সীতারামের সপত্নী। সূর্য্যমুখী, কুন্দনন্দিনী—নগেন্দ্রের সপত্নী। ভুবনেশ্বরী, ললিতলবঙ্গলতা—রামসদয় বাবুর সপত্নী।

দেবী চৌধুরাণী প্রফুল্লরূপে হরবল্লভ বাবুর সংসারে প্রত্যাগমন করিয়া নয়ান বৌ ও সাগর বৌকে লইয়া তাঁহার সংসার সম্পদে ও মাধুর্য্যে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। এখানে সপত্নী বিদ্বেষ নাই; বরঞ্চ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিলে স্ত্রীবর্গের প্রতি স্বামীর আচরণ কি প্রকার হওয়া উচিত, তৎসম্পর্কে প্রফুল্লের সুপরিস্ফুট ইঙ্গিত আছে। শ্রী প্রথমে স্বামী পরিত্যক্তা, পরিশেষে স্বামীত্যাগিনী। দেবী ও নন্দার ভিতরে সপত্নীবিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায় না। সূর্য্যমুখী স্বামীগতপ্রাণতায় স্বতঃ হইয়া কুন্দনন্দিনীকে আপন স্বামীর সহিত বিবাহ দিয়াছিল, কিন্তু সে-ই পরিশেষে কুন্দ ও স্বামীকে ছাড়িয়া দেশত্যাগিনী হইয়া গেল! তাহার এই দেশত্যাগের মূলে সপত্নীবিদ্বেষ ছিল কি? যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, কুন্দনন্দিনীর প্রতি সূর্য্যমুখীর কোন প্রকার সপত্নীবিদ্বেষ ছিল না, তবে তাহার দেশত্যাগিনী হইবার অন্তর্নিহিত কারণ কি ছিল, যাহার ফলে সে আপন নারীত্বকে ধিকৃত করিয়া অসহনীয় ক্লেশে জর্জ্জরিত করিয়াছিল, নগেন্দ্রকে স্বাভাবিক মানুষের ব্যতিক্রমতায়

উৎক্ষেপ করিয়াছিল, যাহার ফলে নারীত্বের সুষমায় সদ্য প্রস্ফুটিত কুন্দনন্দিনী অকালে জীবনবৃন্তচ্যুত হইয়া শুকাইয়া গিয়াছিল? যে সকল নরনারীর মিলন-ক্ষুধা তৃপ্তির অবগাহনে প্রশান্ত হয় নাই, তাহাদের পুনর্মিলন একান্তরূপে আবশ্যক; তাহাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যও বটে, সমাজ-জীবনের পবিত্রতা ও পরিপুষ্টির জন্যও বটে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল না বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে পুনরায় বিবাহ দেওয়াইয়াছেন সূর্য্যমুখীর দ্বারাই। তবে সূর্য্যমুখীর দেশত্যাগিনী হওয়ার কারণ কি? স্বামীসোহাগের বঞ্চনা?

ভুবনেশ্বরীর জীবনের বিস্তৃত কাহিনী আমরা পাই নাই। ভুবনেশ্বরী ও ললিতলবঙ্গলতার মধ্যে যে সপত্নীবিদ্বেষ ছিল না, ভুবনেশ্বরীর জীবনের অনতি-পরিসর কাহিনীও তাহার একটি প্রমাণ বটে। আর একটি প্রবল প্রমাণ এই যে, ভুবনেশ্বরীর গর্ভজাত সন্তান শচীন্দ্রকে ললিতলবঙ্গলতা প্রাণাধিক ভালবাসিত। ইহাকে তৎস্থানীয় প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া না লইলেও ইহা সপত্নীযুক্ত সংসারের একটি সুমহান্ দৃষ্টান্ত বটে।

বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুত্থান গৌরবোদ্ভাসিত প্রাচীন ভারতের এক অন্ধকারময় পটের আলোকোজ্জ্বল প্রকাশ। আমাদের সমাজ-দেহের যে যে স্থানে সংস্কার ও নবীকরণের প্রয়োজন হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র অপরিসীম সাহসিকতার সহিত সেই স্থানকে সংস্কৃত ও নবীকৃত করিয়া আমাদের হৃত গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এক পুরুষের একাধিক পত্নীর সমাবেশ দ্বারা বহু বিবাহ বা 'পলিগেমি'র সমর্থন করিয়াছেন কি না, তাহা পণ্ডিতগণের বিচার্য্য। কিন্তু আর্য্য ভারতে যে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল, রামায়ণ-মহাভারত এবং আমাদের অপরাপর প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। কোন ব্যক্তি বা কোন জাতির অর্জ্জিত, সু-উন্নত সহজাত সংস্কার পিতৃপরম্পরাক্রমে চেতন থাকিয়া মাতৃপরম্পরা দ্বারা পরিপোষিত হইয়া থাকে। পুরুষের বহুগমনপরায়ণতা এবং নারীর একগমনপরায়ণতা তাহাদের আপন আপন প্রকৃতি উৎসারিত সহজ বৈশিষ্ট্য। সুতরাং শক্তিধর পুরুষকে

যদি একাধিক নারী পতিত্বে বরণ করে এবং পুরুষ যদি তাহাদিগকে গ্রহণ করেন, তবে এক দিকে যেমন স্ত্রীবর্গ সুসন্তানপ্রসবিনী হইবে, অপর দিকে নিকৃষ্ট পুরুষের বিবাহ নিবারিত হইবে বলিয়া সমাজ গড়্পড়্তায় অধিকতর সুস্থ ও সমুন্নত সন্তান লাভ করিবে। সমাজের এবম্প্রকার কল্যাণের জন্যই আর্য্যঋষিগণ বহু বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁহাদের অনেকেই একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিয়া তৎদৃষ্টান্ত রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশেও সুপ্রজননে অক্ষম পুরুষদিগকে নারীর মনোনয়ন হইতে অপসারিত রাখিয়া যোগ্য পুরুষদিগকে একাধিক নারীর বরণ গ্রহণ করিবার জন্য উৎসাহিত করা হইতেছে। তাহাতে সুস্থতর সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি ত পাইবেই, জাতির অবলুপ্ত সভ্যতা-সংস্কৃতিও নবরূপ ধারণ করিয়া জাগিবে।

বঙ্কিমচন্দ্র আয়েষার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা ভুলিবার নহে। আয়েষা তাহার মনপ্রাণ নিঙ্ড়াইয়া জগৎসিংহকে ভালবাসা ঢালিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোন অনিবার্য্য কারণে তাহা জগৎসিংহ-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াও ফেনায়িত হয় নাই। কিন্তু ব্যর্থ হইয়াছে—এই মহিমময়ী নারীর নারীত্ব। তিলোত্তমার পতির মনোবৃত্তানুসারিণী স্ত্রীত্বের যে সুখচিত্র, তাহা দেখিয়া আয়েষার দুঃখ ভুলিতে পারা যায় কি ? মৃণালিনী বৌদ্ধ, হেমচন্দ্র আর্য্য হিন্দু। হেমচন্দ্রের সহিত মৃণালিনীর প্রাণবান্ মিলনাবেগ সুন্দর। মিলন ততোঽধিক সুন্দর। আয়েষা মোসলমান, জগৎসিংহ হিন্দু। কিন্তু জীবন বর্দ্ধনের অন্তঃশায়িত পটভূমিকায় উভয়েই ভারতীয়, আর্য্য। জগৎসিংহের সহিত আয়েষার শোক-প্রশান্ত বিচ্ছেদও কি সুন্দর ?

(৩)

শৈবলিনী দরিদ্রের কন্যা। কেহ ছিল না, কেবল মাতা। আর ছিল তাহার অনিন্দ্যসুন্দর, ভুবনভোলান রূপ। শৈবলিনী জানিত, প্রতাপের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। প্রতাপ জানিত, তাহাদের বিবাহ হইবে না। কারণ,

তাহারা সগোত্রে ভ্রাতা-ভগ্নী। গোত্র অর্থ সাধনার ধারা—যাহার প্রভাব মানুষের সহজাত সংস্কারের ভিতর দিয়া বংশানুক্রমিক ভাবে প্রবাহিত হইয়া চলে, সহস্র-লক্ষ বৎসর নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিলেও যাহা বিনষ্ট হয় না। ভারতীয় আর্য্যের শাখা-প্রশাখা যেখানে যেখানে গিয়াছে, ভারতের ঋষিদের গোত্র বা সাধনার ধারাও সেখানে সেখানে গিয়াছে। অনুসন্ধান করিলে ভারতীয় মোসলমানদেরও গোত্র পাওয়া যাইবে। রক্ত-নৈকট্যের ভিতর বিবাহ হইলে সন্তানসন্ততি দুর্ব্বল ও অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট হয় অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিধানে যে প্রকার পরিপুষ্ট হওয়া উচিত, সে প্রকার হয় না। আধুনিক কালের প্রজনন-বিজ্ঞান তাহা দৃঢ়রূপে সমর্থন করিতেছে। সগোত্র হইলেই রক্ত-নৈকট্য হয় না অর্থাৎ সুপ্রজনন-বৃত্তি-প্রতিকূল হয় না। আর্য্যশাস্ত্রে মাতার দিক্ দিয়া পঞ্চম এবং পিতার দিক্ দিয়া সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত যে নৈকট্য বিদ্যমান, তাহাকেই রক্ত-নৈকট্যের সীমা বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

নারীর নারীত্বের চরম সার্থকতা লাভ করে, তাহার মাতৃত্বে। নারী সন্তানধারণবিমুখা হইলে তাহার নারীত্বের হয় অপমৃত্যু। স্ত্রীর অপর নাম জায়া। স্বামী ভাবী সন্তানের বীজরূপে স্ত্রীর গর্ভে প্রবিষ্ট হন। স্ত্রীতে পুনরায় তাহার এইরূপে জন্ম হয় বলিয়া তাহাকে বলে জায়া। নারী যদি মাতৃত্বকে অস্বীকার করে, জায়াত্বকে নির্ম্মম অবহেলায় দলিত করে, তবে সে হয় সমাজের অপঘাতিনী, মানবকুলের সংহারকারিণী।

চন্দ্রশেখরের সহিত শৈবলিনীর যথাশাস্ত্র বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু শৈবলিনী তাহাকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই। প্রতিহত কামবৃত্তির পূতিগন্ধময়, বিষাক্ত বাতাসে শৈবলিনী তাহার চতুর্দ্দিকের আবহাওয়াকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল।

ফষ্টরের নৌকায় শৈবলিনী বন্দিনী হইয়া মুঙ্গের চলিয়াছে। বায়ু প্রবল হইল। প্রতিকূল বায়ুতে নৌকা আর চলিল না। ভদ্রহাটির ঘাটে রক্ষকেরা নৌকা আটক করিল। এই সুযোগে সুন্দরী নাপিতানী বেশে শৈবলিনী সমীপে

গেল। উদ্দেশ্য, শৈবলিনীকে কৌশলে মুক্ত করিয়া বেদগ্রামে চন্দ্রশেখরের গৃহে লইয়া আসা। সুন্দরী এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতেই শৈবলিনী বলিল—"কি সুখে ? কোন্ সুখের আশায় এত কষ্ট সহ্য করিবার জন্য ঘরে ফিরিয়া যাইব ? ন পিতা, ন মাতা, ন বন্ধু—"

"কেন স্বামী ? এ নারী জন্ম কাহার জন্য ?"

"সব ত জান—"

"জানি। জানি যে পৃথিবীতে যত পাপিষ্ঠা আছে, তোমার মত পাপিষ্ঠা আর কেহ নাই। যে স্বামীর মত স্বামী জগতে দুর্লভ, তাহার স্নেহে তোমার মন উঠে না—" ইত্যাদি আরও অনেক বাক্য ব্যয় করিয়াও সুন্দরী শৈবলিনীর মন ফিরাইতে পারিল না। শৈবলিনী বলিল—"মনে করিও, আমি মরিয়াছি। আমি মরিব, তাহা নিশ্চয় জানিও।"

সুন্দরী বলিল—"ভরসা করি, তুমি শীঘ্র মরিবে। দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন মরিতে তোমার সাহস হয়। ঝড়ে হউক, তুফানে হউক, নৌকা ডুবিয়া হউক—মুঙ্গেরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই যেন তোমার মৃত্যু হয়।"

তুফানও হইল না, নৌকাও ডুবিল না, শৈবলিনীও মরিল না। প্রতাপ ফষ্টরের নৌকা হইতে শৈবলিনীকে উদ্ধার করিয়া তাহার মুঙ্গেরের বাড়ীতে আনয়ন করিলেন। সেই বাড়ী হইতে দলনী-বেগম-ভ্রমে যখন শৈবলিনী নবাব মিরকাশিমের সমীপে নীত হইল, তখন নানা প্রশ্নের পর নবাব শৈবলিনীকে প্রশ্ন করিলেন—"প্রতাপ তোমার কে ?"

"আমার স্বামী।"

"তোমার নাম কি ?"

"রূপসী।"

শৈবলিনীর জন্য দুঃখ হয়। এমনি কত শৈবলিনী রহিয়াছে, আমাদের সমাজের পরতে পরতে। যে সংসারে স্ত্রী পতির মতানুবর্ত্তিনী না হইয়া

বিপরীতবর্ত্তিনী, যে সংসারে স্ত্রী পতির রূপ, গুণ, বাক্, ব্যবহার, কর্ম্ম, বিদ্যা, বুদ্ধির দ্বারা নন্দিত ও হৃষ্ট না হইয়া খিট্‌খিটে মেজাজসম্পন্না ও পতির দোষদর্শিনী হয়, বুঝিতে হইবে, সেই সংসারে একটি শৈবলিনীর গুপ্ত অবস্থিতি রহিয়াছে। এতৎসম্পর্কে বিচার্য্য বিষয় ইহাই যে, শৈবলিনীর স্বামীবিমুখতা এবং অপর পুরুষপরায়ণতার ঊর্দ্ধে তাহার যে সর্ব্বশক্তিশালিনী, মহিমময়ী মাতৃমূর্ত্তি ছিল, জ্ঞানৈশ্বর্য্যবীর্য্যসিদ্ধি-সমভিব্যাহারিণী, দুর্গতিনাশিনী দুর্গার যে অনন্ত সৌন্দর্য্যশালিনী রূপ ছিল, তাহার অভিজ্ঞান লাভ করিবার মত শিক্ষা-দীক্ষা শৈবলিনী পাইয়াছিল কি? শৈবলিনী নারী, এক পুরুষকে আত্মনিবেদন করিয়া তাহারই উন্নয়ন ও উদ্বর্দ্ধনে যত্নবতী হওয়াই তাহার নারী-স্বভাবের বৈশিষ্ট্য; সহোদর-সহোদরার পরস্পরের প্রতি যেরূপ প্রণয়ানুরাগের সঞ্চার হইতে পারে না, সেইরূপ সমরক্তসম্পন্ন প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর অনুরক্তির সঞ্চার হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু নারীত্বের বৈশিষ্ট্যের সংরক্ষণমূলক শিক্ষা ও দীক্ষা শৈবলিনী কোথাও পাইয়াছিল কি?

উদ্যানের নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধতায় শ্রী ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ-ব্যাখ্যাচ্ছলে পতি-দেবতার নিকট নিষ্কাম প্রেমের বর্ণনা করিতেছে। আর পতি-দেবতা সীতারাম তৎশ্রবণে একেবারে বধির হইয়া পলকে পলকে শ্রীর সৌন্দর্য্যসুধা আকণ্ঠ পূরিয়া পান করিতেছেন। সীতারামের অপরাধ অপরাধ বটে, কিন্তু যৌন-বৃত্তির প্রশান্তি বিধান না করিয়া কৃত্রিম বৈষ্ণবতাকে অবলম্বন করিলে নরনারীর যে অপরাধে সংলিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক, সীতারাম সেই অপরাধে অপরাধী। সাধারণতঃ দেখা যায়, নর অথবা নারী যখনই চিদৈশ্বর্য্য বিমণ্ডিত হন, নিষ্কাম প্রেম যখন ঘনীভূত হইয়া তাহাদের ভিতর আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহাদের আত্মপ্রদীপ্তিতে চারিদিক্ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, আলোকের রাজ্য হইতে অন্ধকারের পলায়নের মত কামকলুষ বাসনা তাহাদের সান্নিধ্য হইতে পলায়ন করে, পারিপার্শ্বিক নতজানু হইয়া তাহাদিগকে অভিবাদন করে। কিন্তু নিষ্কাম প্রেমের বর্ণনাকারিণী শ্রীর

পরিপার্শ্বে আমরা তাহার বিপরীত চিত্র দেখিতেছি। এই প্রসঙ্গে স্বতঃই দেবী চৌধুরাণীর কথা মনে পড়ে—"কখনও স্বামী দেখ নাই। স্বামী দেখিলে শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।" শ্রী কি ধার্ম্মিকা? যে যে নিয়ম আমাদের অস্তিত্ব ও সংবৃদ্ধিকে ধারণ করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার অভিজ্ঞান লাভ করিয়া তৎপ্রতিপালনের ভিতর দিয়া জীবনকে পরিচালিত করার নাম ধর্ম্ম। শিব ছাড়া শিবানী হইয়া, নারায়ণ ছাড়া লক্ষ্মী হইয়া এবং ধর্ম্মের খোলস পরিধান করিয়া যেরূপ ধার্ম্মিকা হওয়া সম্ভবপর, শ্রী সেই প্রকার ধার্ম্মিকা হইয়াছিল। উপদেষ্টা ছিল, তাহার সখী জয়ন্তী।

নারী সহজেই অপরের প্রভাবে প্রভাবান্বিতা হইয়া পড়ে—বিধি এমনি প্রকার উপাদান দ্বারা তাহাকে গঠন করিয়াছেন; এই জন্যই নারী যে কোন অবস্থাতেই পুরুষের আশ্রয়হীনা হইয়া চলিতে পারে না। নারী যদি সহজ-রূপান্তরপ্রবণা না হইত, তবে নারীকে আমরা দুহিতারূপে, সহোদরারূপে, জায়ারূপে—পরিশেষে জননীরূপে লাভ করিতে পারিতাম না। ঐ প্রতিটি রূপান্তর-পরম্পরায় তাহার নারীত্বের অবদান নব নব রূপে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে না কি? পুরুষ যখনই আপন সুমহান্ বৈশিষ্ট্য হারাইয়া নারীকে লইয়া হীনতার পঙ্কে নৃত্য করিতে বসে, তখন খুব কম নারীই তাহার অপঘাতকুশল প্রলোভন এড়াইয়া চলিতে পারে। তাহার পর পুরুষ একান্তরূপে নারী-সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই নারী তাহার সর্ব্বনাশী উদ্দীপনা লইয়া প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করে।

রোহিণী বিধবা—বিধবার মতই সে জীবন যাপন করিতেছিল। তাহার পুনর্ব্বিবাহ হইল না কেন, সে প্রশ্ন আলাদা। তাহার বৈধব্যের নিস্তরঙ্গ-জীবনে ধূমকেতুরূপে আবির্ভূত হয়—কৃষ্ণকান্তের ত্যাজ্যপুত্র হরলাল। এই উপলক্ষের সুসমাবেশ যদি না ঘটিত, তবে রোহিণী অবৈধভাবে গোবিন্দলালের প্রণয়াসক্ত হইত কি না সন্দেহ। গোবিন্দলালের পাতিত্যে উদ্দীপিত হইয়া রোহিণীর নারীত্বের ব্যভিচার চরমে উঠিল, ক্রমে সে প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিল।

পরিশেষে সে নিজেও মরিল, ভ্রমরকেও মারিল, কৃষ্ণকান্তের সোনার সংসারকেও পোড়াইয়া ছারখার করিল।

(৪)

আদিপ্রাণের একত্ব হইতে বহুত্বে পর্য্যবসিত হওয়ার ইচ্ছার উন্মেষের সহিত তাহা হইতে দুইটি ধারা বিনির্গত হইল—একটি পুরুষ, অপরটি প্রকৃতি। পুরুষ আদিপ্রাণে অনুরাগী থাকিয়া প্রকৃতির ভিতর দিয়া বিস্তারে অঢেল হইয়া আপনাকে পরিপ্লাবিত করিতে থাকিল; আর প্রকৃতি পুরুষকে আলিঙ্গন করিয়া তাহারই সাহচর্য্যে তাহাকে পোষণপ্রাণতায় উদ্দীপিত করিয়া পুরুষের বিস্তার-কার্য্যের সহায়কারিণী হইয়া চলিতে লাগিল। ফলে এই দাঁড়াইল যে, পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই উভয়ের অস্তিত্ব ও সংবৃদ্ধির পরিপূরক, উভয়েই উভয়ের চলার পথের নিরবচ্ছিন্ন সাথীয়া, আলোছায়াবৎ মরমী বান্ধব-বান্ধবী হইয়া উঠিল। এই পুরুষ ও প্রকৃতিই নর-সত্তা ও নারী-সত্তার আদিম উৎস। তাই, জগৎ প্রপঞ্চে নরনারীর যে নাট্যাভিনয় চলিতেছে, তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা ইহা দেখিতে পাই যে, নর তাহার আদিম নর-সত্তার বৈশিষ্ট্য লইয়া ও বিস্তারে প্রতিষ্ঠাপরায়ণ হইয়া এবং নারী তাহার আদিম নারী-সত্তার বৈশিষ্ট্য লইয়া সেই পুরুষকে সেবায় ও পুষ্টিতে মহিমান্বিত করার ভিতর দিয়া চলিয়াছে। ব্যাপক দৃষ্টি লইয়া নর-নারীকে সমষ্টিগতভাবে বিচার করিলে নর-নারীর এই শাশ্বত চলন-ভঙ্গীকে কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র নারীর বৈশিষ্ট্যসমূহের বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আমাদিগকে যে আদর্শ নারী-চরিত্র উপহার দিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। সেবা, সাহচর্য্য, স্নেহ, ভালবাসা, সর্ব্বকুশলময়ী উদ্দীপনা তাহাদের চরিত্রে যে ভাবে শ্বেতশতদলের দীপ্তি লইয়া প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যথার্থতঃ নারী-জাতির সত্য প্রতিচ্ছবি। দেবী, কল্যাণী, শান্তি প্রকৃতপক্ষেই শস্যশ্যামলা, ফুল্লকুসুমদ্রুমদলশোভিতা। তাহাদিগকে লইয়া সংসার করিতে না

পারার দুঃখ জালাময় হইয়া উঠে তাহাদেরই চিত্তে যাহারা নারীত্বের বিকৃত পরিচর্য্যায় ক্ষীণপ্রাণ ও ক্ষীণকলেবর হইয়া সংসার-সংগ্রামে ক্রমে পিছু হটিয়া চলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ নারী পুরুষকে নারীমুখী করিয়া তরল কামাগ্নিতে তাতাইয়া তুলে না। সে পুরুষের সর্ব্বকর্ম্মে পার্শ্বচারিণী, আনন্দময়ী, অভয়দায়িনী, সংগ্রামময়ী। মাধ্যাকর্ষণের টানের মত সে পুরুষকে সংসারমুখী, দেশমুখী করিয়া টানিয়া রাখে।

বঙ্কিমচন্দ্র চলমান সংসারপটের ননদিনীদিগকে অবহেলার দৃষ্টিতে অবলোকন করেন নাই। তাঁহার মহৎ প্রাণ সংসারের ও সমাজের সর্ব্বতোমুখী প্রসারণশীলতায় একান্ত ছিল বলিয়াই তাহাদের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন চরিত্রের সত্য প্রকাশেও তাঁহার লেখনী শক্তিশালী হইয়া প্রকাশ পইয়াছে। ভ্রাতৃগৃহবাসিনী ননদিনীর কোন্দলপরায়ণতার যে খ্যাতি প্রচলিত, তাহা যে তাহার আত্মরূপেরই লাঞ্ছিত বিকৃতি, ইহা প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণীকৃত করা হইয়াছে, শ্যামাসুন্দরীর অনবদ্য সেবা-নম্রতার সুচিত্র অঙ্কনে। কপালকুণ্ডলার প্রতি শ্যামাসুন্দরীর যে অপূর্ব্ব স্নেহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা চন্দ্রমা-উৎসারিত-জ্যোৎস্নাধারার মত সুন্দর; জীবানন্দের অপ্রত্যাশিত আগমনে শান্তিকে ভ্রাতৃসম্মিলনে আনয়ন করিবার যে মহা ব্যস্ততা প্রকাশ পাইয়াছে নিমাইয়ের চরিত্রে, তাহা এরূপ মধুর, এরূপ প্রাণস্পর্শী যে, রক্তমাংসের দেহের ভিতর দিয়া তাহাকে পাওয়ার একটা কামনা প্রতি ভ্রাতা, প্রতি ভ্রাতৃবধূর প্রাণে জাগিয়া উঠাই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। সূর্য্যমুখীর দুঃখে চিঠি লিখিয়া আশ্বাস দেওয়ার মধ্যে, পিতৃগৃহে আসিয়া সূর্য্যমুখীর সংসারে আগুন না জ্বালাইবার প্রয়াসের মধ্যে কমলমণির চরিত্রের যে দীপ্তিশীলতা বিকাশ লাভ করিয়াছে, কোন্ ভ্রাতা কোন্ ভ্রাতৃবধূ তাহার অমৃতবর্ষণে অভিষিক্ত হইতে ইচ্ছুক না হইয়া পারেন? বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ নারীর মত গৃহপরায়ণা, কল্যাণী, উদ্দীপনাময়ী নারী আমরা প্রতি গৃহে সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

পদাবলী সাহিত্য

(১)

বৈষ্ণব পদাবলী পৃথিবীর সাহিত্য-ভাণ্ডারের স্নিগ্ধঘন সুরভি-বিশেষ। জন্ বিম্স পারস্য দেশের সুফী কাব্যের সহিত বৈষ্ণব কাব্যের তুলনা করিয়াছেন। পণ্ডিত সিল্ভা লেভী চণ্ডীদাসের পদ-মাধুর্য্যের ও আবেগময়ী প্রেম-বর্ণনার ভূয়সী প্রশংসা করতঃ আনন্দবিহ্বলতা প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলী যে অন্তরলোকের মধুরিমাকে বাহ্যজগতে রূপবান্ করিয়া তুলিয়াছে, অস্মদ্দেশে সেই লোকের শ্রেষ্ঠ সন্ধানকুশলী হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার দীনতম পদানুসরণকারী পর্য্যন্ত সকলেই আপন আপন পারগতার অনুপাতে পদাবলী সায়র হইতে অমৃত আহরণ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়াই পদাবলী সাহিত্যের রচনা। যিনি আদর্শ সমাজপতি, আদর্শ রাষ্ট্রবিৎ, আদর্শ যোদ্ধারূপে পরিকীর্ত্তিত, এই নশ্বর বস্তুতান্ত্রিক জগতে একান্ত বস্তুতন্ত্রপরায়ণ ব্যক্তিগণের সহিতও যাঁহাকে সংলিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল, জগৎ-প্রবাহের একান্ত স্থূলপর্ব্ব হইতেও যিনি আপনাকে দূরে সরাইয়া রাখেন নাই, সেই শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া যে পদাবলী সাহিত্যের আত্মপ্রকাশ, তাহার সৃজন-উৎস এক রহস্যঘনলোকে অবলুক্কায়িত।

আমরা যখন আমাদের আপন আপন জ্ঞানবোধের পরিমাপনে পারিপার্শ্বিক জগতের মূল্য বিচারে প্রবৃত্ত হই, তখনই প্রতারণার অভিনন্দন আমাদের সহজলভ্য হয়। নরদেহধারী শ্রীকৃষ্ণের যে প্রকাশ স্থূল ঘটনার আবরণে উদ্গত হইয়াছিল, তদতিরিক্ত তাঁহার যে আর একটি প্রকাশ আছে, যাহা পরম চেতনের অংশবাহী প্রতি মানবের স্নায়ুজালেও উদ্দীপন-সাপেক্ষভাবে অবলুক্কায়িত— সেই প্রকাশ মাধুর্য্য-স্বরূপে প্রকটিত হইয়াছিল, তাঁহার বৃন্দাবন লীলায়। যুক্তিবিহীনতায় আমরা আনুগত্য প্রকাশ করিতেছি না। আমরা বলিতে চাই ইহাই যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব প্রথম যাহাকে যাহাকে কেন্দ্র-চৈতন্য উদ্বোধন করিবার

সঙ্কেত শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহারা বহুলাংশে বৃন্দাবনবাসিনী গোপিনী ছিলেন এবং বৃন্দাবনে এইরূপ বহু গোপিনী একত্রে বাস করিতেন বলিয়া তথায় প্রচুর আনন্দেরও সুসমাবেশ হইয়াছিল এবং যেহেতু তাহাদের সকল চিদানন্দের মূলে শ্রীকৃষ্ণ পরিবিরাজমান ছিলেন, সেই হেতু শাস্ত্রকার বলিয়াছেন এবং আমরাও বলিতেছি যে, তিনি বৃন্দাবনে লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। লীলা অর্থ আলিঙ্গনে গ্রহণ (লী = আলিঙ্গনে + লা = গ্রহণে)। শ্রীকৃষ্ণ রক্তমাংসসঙ্কুল জীবদ্দশাতেই আপন সূক্ষ্ম সত্তায় বৃন্দাবনের এক অংশ গ্রথিত সমাজকে আলিঙ্গন করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাই বৃন্দাবন লীলা, আর বৃন্দাবনের এই রহস্যঘন মাধুর্য্যময়তার বোধ-বিকাশ হইতেই পদাবলী সাহিত্যের উৎপত্তি।

বৃন্দাবনবাসিনী ঐ গোপিনীরাই পদাবলী সাহিত্যে সখীরূপে পরিগৃহীতা। কিন্তু রাধিকা কে, তাহা আমাদের জানা আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভাগবতে, মহাভারতে, হরিবংশে রাধিকার কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু যিনি আমাদের আলোচনার স্থলবর্ত্তিনী, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের কালেই প্রকটিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ পোষণ করা চলে না। পরবর্ত্তীকালে রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত হইয়াছে, রাধিকা বৃকভানুদুহিতা ছিলেন এবং গন্ধর্ব মতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। আবার রাধিকা আয়ান ঘোষের পত্নী বলিয়াও বৈষ্ণব জগতে পরিচিতা। এই দ্বৈত মত সংঘাতে বিক্ষিপ্ত না হইয়া আমরা শ্রীচৈতন্যের উক্তির আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিতেছি। শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন—

"হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
পরম প্রেমের সার মহা ভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা-ঠাকুরাণী॥"

এই রাধাঠাকুরাণীর ভাবে ভাবিত হইয়াই শ্রীচৈতন্যের সাধনা। রূপের পরিচয় না পাইলে ভাবের সহিত পরিচয় সংস্থাপিত হইতে পারে না। সুতরাং

রাধিকা যে রক্তমাংসময়ীরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন, এই তত্ত্ব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এক্ষণে রাধিকার অবতরণ এবং তাঁহার তত্ত্বের দিক আলোচনা করা যাউক। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া,
অসীম যে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।"

অরূপ-লোক আর রূপ-লোক পরম্পরায় ভাবের প্রবাহ এই প্রকারেই চলে। আমরা যে ভাবলোক হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া এই জগৎ প্রপঞ্চে জীব-শরীরীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, রাধাঠাকুরাণী সেই ভাবলোকের ঊর্দ্ধস্থ এক বিশেষ ভাবস্তর হইতে অবতরণ-করতঃ নারীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা যদি আমরা স্বীকার করি, তবে তাঁহার অবতরণ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ-উৎসের সমীপবর্ত্তী পটভূমিকা হইতে সম্ভব হইয়াছিল, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। যিনি "মহাভাবরূপা"—যে ভাব অবলম্বন করতঃ শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের উৎসের সন্নিকটবর্ত্তিনী বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। রাসগীতা লিখিয়াছেন—রাধা শব্দব্রহ্মময়ী। সুতরাং তিনি যে স্বরূপতঃ ধ্বনিবিগ্রহবতী ছিলেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই শব্দ-রূপিণী রাধাই মানবী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপী পুরুষোত্তমের কানে বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীতে, শ্রীচৈতন্যের ধ্যানে-যে রাধা রাধা নাদ ধ্বনিত হইত, সেই রাধার এই ধ্বনিগত তত্ত্বের দিকটা সাধক-সমষ্টির বোধে পূর্ব্বেও প্রতিফলিত হয় নাই, এক্ষণেও হইতেছে না; সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য এবং তাঁহার পূর্ব্ব-পর যুগের ব্যষ্টি সাধক কর্ত্তৃক রাধাতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে।

যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য বিরচিত, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা সহানুচারিণী রাধিকার পরিচয়ও আমরা লাভ করিলাম। বঙ্গভূমে

শ্রীচৈতন্যের রসবিলাসের ক্ষেত্র-প্রস্তুতির পক্ষে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের অবদানের তুলনা নাই। মহামানবের আগমনের পূর্ব্বে এমনি প্রকারে তাঁহার প্রকাশোপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াই থাকে।

এক্ষণে আমরা পদাবলী রচয়িতাগণের সৌরভময় কাব্যোদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইব।

(২)

সমতাই সৌন্দর্য্য। যাহার ভিতরে ভাব-সমতা যত অধিক প্রতিষ্ঠিত, সৌন্দর্য্যের ঐশ্বর্য্য তাহার সর্ব্বাঙ্গে তত অধিক সুপরিস্ফুট। যিনি এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবেন, তাহাকেও ভাবলোকের উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিতে হয়। তাহা না হইলে যে চিন্ময় সৌন্দর্য্য দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়, তাহা স্থূল রুচির আকর্ষণের বিষয়বস্তু হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা জন্মে। অখিল রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ ভাব-সাম্যের ঘন বিগ্রহ, রাধিকাও ভাব-সাম্যের ঘন বিগ্রহবতী। বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ বর্ণনায় রাধিকার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মুখে উক্তি অর্পণ করিয়াছেন—

"গেলি কামিনী গজহু গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক
কুহকী ভেলি বর নারী॥
জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ চন্দ॥"

রাধিকা মৃদুমন্দ পদসঞ্চারে গমন করিতেছেন। তাঁহার অঙ্গে চলন-ছন্দে এমনি এক সৌন্দর্য্যের প্লাবন ছুটিয়াছে, যাহাতে মনে হইতেছে, তিনি যেন পরমা আকর্ষণী বিদ্যার সঘন মূর্ত্তিরূপে পারিপার্শ্বিককে আপনার প্রতি

টানিয়া খিঁচিয়া লইয়াই গমন করিতেছেন। তাঁহার গমন-ছন্দের মাধুর্য্যে মুখকমল অধিকতর সুন্দর হইয়াছে; যেন কামদেব চম্পকদামে শরচ্চন্দ্রের পূজা করিতেছেন। বিদ্যাপতি পরে লিখিয়াছেন, সৌন্দর্য্য-উপভোগক্ষুব্ধ শ্রীকৃষ্ণ সখীকে বলিতেছেন, হে সখি, এই যে সুন্দরী আমার পরম সুন্দরের স্মৃতি উজ্জীবিত করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল, আমি কি আবার তাহার দর্শন পাইব না?

রাধিকার পূর্ব্বরাগ বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণের রূপবৈভবের প্রতিচ্ছবি বিদ্যাপতির নিকট আমরা এইরূপ লাভ করিয়াছি। রাধিকা বলিতেছেন—

"কি কহব রে সখি কানুক রূপ।
কো পতিয়ায়ব স্বপন স্বরূপ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীত বসন পরা সৌদামিনী সেহ॥
ঝামর ঝামর কুটিলহি কেশ।
কিয়ে শশিমণ্ডল শিখণ্ড সন্বেশ॥
জাতকী কেতকী কুসুম সুবাসে।
ফুলশর মনমথ তেজল তরাসে॥"

হে সখি, কানুর নির্গলিত রূপ-প্রবাহের কথা বলিলেও কে বিশ্বাস করিবে? তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য এত অধিক প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়াছে যে, মনে হয়—যেন চন্দ্রমণ্ডলে ময়ূর-পুচ্ছের সন্নিবেশ হইয়াছে, জাতী ও কেতকী কুসুমের সৌরভে মন্মথ ভীত হইয়া ফুলশর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে। রাধিকা অন্যত্র বলিতেছেন—

"এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ।
শুনইতে মানবি স্বপনে স্বরূপ॥
কমল-যুগল পর চান্দকি মাল।
তাপর উপজল তরুণ তমাল॥

তাপর বেঢ়ল বিজুরী লতা।
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা॥
শাখাশিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহে নব পল্লব অরুণক ভাতি॥
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ।
তাপর কীর থির করু বাস॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন যোড়॥
তাপর সাপিনী বেঢ়ল মোড়॥"

কমলযুগলের উপর চাঁদের মালা উদ্ভাসিত, তদুপরি তরুণ তমা৷ দণ্ডায়মান। তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে বিদ্যুল্লতা। এই বর্ণনা শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল কমল, নখরাজি চাঁদের মালা, দেহ তরুণ তমাল ও পীতধরা বিদ্যুল্লতারূপে উপমিত হইয়াছে। শাখার অগ্রভাগ বেড়িয়া সুধা করশ্রেণী বিরাজমান, তাহাতে নব সূর্যের আভাবিশিষ্ট নব পল্ল রহিয়াছে। এ স্থলে শাখা হস্ত, সুধাকর নখ, নব পল্লব অঙ্গুলি রূপে উপমিত বিমল বিম্বফল যুগলের উপরে কীর স্থিরাসন প্রাপ্ত। তাহার উপরিভাগে চঞ্চল খঞ্জনদ্বয় শোভমান। তদুপরি সাপিনী মস্তকে ফণা-বিস্তার-প্রয়াসে অবস্থিত বিম্বফল যুগল = ওষ্ঠাধর। কীর = নাসা। খঞ্জনজোড় = নেত্রদ্বয়। সাপিনী = চূড়া

ধ্বনি-বিগ্রহবর্তী রাধিকার আকর্ষণে স্পন্দিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে বিগলিত হইয়াছেন। নর-স্বারূপ্যের একাদশ ইন্দ্রিয়ে যে একাদশ দেবত অধিষ্ঠিত, তাঁহারা যখন তাহার পরম চৈতন্যাংশকে কেন্দ্রাভিমুখে চলিবার জন্য আপন আপন পথ ছাড়িয়া দেন, তখন আত্মস্থিতি লাভের প্রয়াসের ভিতরে তাহার দেহে ও মনে বিগলিত না হইয়া উপায় নাই নররূপে আকারিত শ্রীকৃষ্ণের পরম স্থিতি লাভের সাধনা-বিজ্ঞানেও ইহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইতে পারে না। তাই, আমরা দেখিতেছি সখী রাধিকাকে বলিতেছেন—

"এ ধনি কর অবধান।
তো বিনে উনমত কান॥
কারণ বিনু ক্ষণে হাস।
কি কহয়ে গদ গদ ভাষ॥
আকুল অতি উতরোল।
হা ধিক হা ধিক বোল॥
কাঁপয়ে দুরবল দেহ।
ধরই না পারই কেহ॥"

সখী অন্যত্র বলিতেছেন—

"শুনলো রাজার ঝি।
তোরে কহিতে আসিয়াছি॥
কানু হেন ধন, পরাণে বধিলি।
এ কাজ করিলি কি?॥
বেলি অবসান কালে।
গিয়াছিলি না কি জলে॥
তাহারে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়া,
ধরিলি সখির গলে॥
দেখায়্যা বদন চান্দে।
তারে ফেলিলা বিষম ফান্দে॥
তুহু ত্বরিতে আওলি, লখিতে নারিল
ওই ওই করি কান্দে॥"

বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধিকার মিলনের চিত্র এইরূপে আঁকিয়াছেন—

"পহিল চললি ধনী পিয়াক পাশে।
হৃদয় আকুল ভেল লাজ তরাসে॥

ঠাড়ি রহল রাই নাহি আগুসারে।
হেম মূরতি জনি নাচল পিছারে ॥
কর ডুহু ধরি পঁহু নিয়রে বৈসায়।
কোপ সরমে ধনী বদন লুকায় ॥"

ঠাড়ি রহল রাই = রাধিকা সুবর্ণ মূর্ত্তির মত দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন পঁহু = প্রভু।

তারপর রাধিকার মান বর্ণনা। মান বিরহের পূর্ব্বরাগ। বিরহে প্রিয়ের সঙ্গ লাভের আশায় যে উৎকট ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়, তাহারই প্রাক্ অভিব্যক্তির স্বরূপ-প্রকাশক মান। অভিমানিনী রাধিকা সখীকে বলিতেছেন—

"সখি হে না বোল বচন আন।
ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নিনু
বৈছন কুটিল কান ॥
কাঠ কঠিন কয়ল মোদক
উপরে মাখিয়া গুড়। (১)
কনয়া কলস বিখে পুরাইয়া
উপরে ডুধক পূর ॥ (২)
কানু সে সুজন হাম ডুরজন (৩)
তাহার বচনে যাই।
হৃদয় মুখেতে এক সমতুল
কোটিকে গুটিক পাই ॥ (৪)

(১) শ্রীকৃষ্ণ কেমন ?—যেমন শুষ্ক কাষ্ঠের উপর গুড় মাখিয়া মোদক প্রস্তুত করা হইয়াছে ; (২)—যেমন সোনার কলসীতে বিষ ঢালিয়া উপরে ডুধের পূর দেওয়া হইয়াছে। (৩) শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া আমি ডুর্জ্জন হইয়াছি। (৪) হৃদয়মুখেতে তুল্য—এইরূপ এক কোটীতে একজন পাওয়া যায়।

(৩)

যাঁহার মননে ও ধ্যানে যে আত্মচৈতন্য ঊর্দ্ধগমনশীল হইয়া পরম স্থিতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার প্রয়াস করে, তাঁহার স্থূল রূপই যে তৎ-আত্মচৈতন্যের গোড়ায় অবস্থান করিয়া ক্রিয়াশীল হয়, তাহা মনোবিজ্ঞানের এক রূঢ় সত্য। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা—উভয়েই উভয়ের ধ্যাতা ও ধ্যেয়। কিন্তু এতৎ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবেশ না করিয়া আমরা এক্ষণে রাধিকার বিরহ-কাহিনীর সহিত পরিচিত হইবার অভিলাষ করিয়াছি। আমরা দেখিতেছি, যখনই শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার চক্ষুর আড়ালে গমন করিয়াছেন, অথবা কার্য্যোপলক্ষে দেশান্তরে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখনই রাধিকার বিরহসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে। তিনি কান্দিয়াছেন, সখিগণকেও কান্দাইয়াছেন। বিদ্যাপতি রাধিকার বিরহ বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

"সজল নয়ান করি, পিয়া পথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগ চারি।
বিধি বড় দারুণ, তাহে পুন ঐছন
দূরহি কয়ল মুরারি॥
আনি দেই মোর পিউ, রাখই আমার জীউ
কো ইহ করুণাবান। (১)
বিদ্যাপতি কহ ধৈরজ ধর চিতে
তুরিতহি মীলব কান॥"

(১) আমার প্রিয়তমকে আনিয়া দিয়া আমার জীবন রক্ষা করিতে পারে, এইরূপ দয়ালু এই পৃথিবীতে কে আছে?

"কত দিন মাধব, রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি, নখর খোয়ায়লু
বিছুরল গোকুল নাম॥

হরি হরি কাহে কহব এ সম্বাদ।
সোঙরি সোঙরি লেহ, ক্ষীণ ভেল মঝু দেহ
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ॥
আশ নিগড় করি, জীউ কত রাখব,
অবহি যে করত পরাণ।
বিদ্যাপতি কহ, আশাহীন নহ,
আওব সো বরকান॥”

মাধব আর কত কাল মথুরাপুরে অবস্থান করিবেন? বিধাতার এই নিষ্ঠুর বিধান আর কত কাল বর্ত্তমান থাকিবে? তাঁহার আসিবার দিন গণনা করিবার জন্য অঙ্কপাত করিয়া আমার নখ ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছি। মাধব বুঝি গোকুলের নামও ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রীতি ও প্রেম স্মরণ করিয়া তাহার ক্ষুধায় আমার দেহ ক্ষীণ হইয়া গেল। এক্ষণে দেহ-মনের অবস্থা এইরূপ হইয়াছে যে, আর কত কাল উহা ধারণ করিয়া রাখিতে পারিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

“এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর (সীমা)।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী
থির বিজুরি পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥”

সর্ব্বদা ঝড়-মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, বৃষ্টিপাত হইতেছে, ভেক ডাকিতেছে। রাত্রি ব্যাপিয়া বিদ্যুতের পঙ্‌ক্তি এত ঘন পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, মনে হয়— উহা যেন স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে। এ হেন বর্ষণমুখর প্রকৃতিতেও শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যোৎপন্ন অমিয়ধারা রাধিকার উপর বর্ষিত হইতেছে না—ইহাই এই বর্ণনার তাৎপর্য্য।

অন্যত্র রাধিকা করুণ-কণ্ঠে সখীকে বলিতেছেন—

"হিম-কর-কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করবি মাধবী-মাসে।
অঙ্কুর, তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ-মেহে॥
হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে, কণ্ঠ যদি সুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥
চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বারিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজ গুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥"

চন্দ্রকিরণ-প্লাবনে নলিনী শুকাইয়া গেলে বসন্ত ঋতুর সমাগমের আর কি সার্থকতা থাকিবে? সূর্য্যরশ্মিতে অঙ্কুর দগ্ধ হইয়া গেলে বরষার আর প্রয়োজন কি? সিন্ধুতীরেও যদি কণ্ঠ শুকাইয়া যায়, পিপাসার প্রশান্তি বিধান করিবে কে? আমার কর্ম্মবৈগুণ্য না থাকিলে চন্দনবৃক্ষ সৌরভ হারাইয়া ফেলিবে কেন? চন্দ্রকিরণ স্নিগ্ধতা না ঢালিয়া অগ্নি বর্ষণ করিবে কেন? চিন্তামণি আপন স্বভাবের বৈপরীত্য প্রকাশ করিবেন কেন?

বিদ্যাপতি চিত্রিত নিম্নোক্ত পদে আমরা দেখিতেছি, রাধিকা অন্তরের স্থৈর্য্য একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের নিমিত্ত

ইন্দ্রের চরণে নেত্র ভিক্ষা করিতেছেন, গরুড়ের নিকট পাখা প্রার্থনা করিতেছেন। যথা—

"সুরপতি পাএ লোচন মাগঞো
গরুড় মাগঞো পাখী।
নন্দেরি নন্দন মঞে দেখি আবঞো
মন মনোরথ রাখি॥"

বিদ্যাপতি এক্ষণে মিলনোৎসব কীর্ত্তন করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে আসিয়াছেন। রাধিকার আত্মসত্তার প্রতি কণায় কণায় মিলনের আনন্দ-রাগিণী গীত হইতেছে। রাধিকা সখীকে বলিতেছেন—

" আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মাননু
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোহ কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥"

আজ আমার গৃহকে প্রকৃত গৃহ বলিয়া মনে করিলাম। সেই কোকিল এক্ষণে লক্ষবার ডাকুক, লক্ষ চন্দ্র আকাশে সমুদিত হউক, পঞ্চ স্মৃতিবাণ লক্ষ বাণে পরিণত হউক, মলয়ানিল মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হউক, তাহাতে

আজ আমার ভাবনা করিবার কিছুই নাই। মাধব আমার সন্নিকটেই অবস্থান করিতেছেন। ইহাই ভাবার্থ।

(৪)

এক্ষণে আমরা চণ্ডীদাসের পদাবলী-কাব্যকাননে উপনীত হইলাম। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ ব্যাখ্যায় চণ্ডীদাস রাধিকার রূপ-বৈভব নিম্নোক্ত প্রকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"তড়িৎ বরণী হরিণী নয়নী
দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে।
কিবা সে দিয়া অমিয়া ছানিয়া
গড়িল কোন বা রাজে॥
সই, কিবা সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে পশি গেল চিতে
বড়ই রসের কূপ॥
কে এমন কারিগর বনাইলে ঘর
দেখিতে না পানু তারে।
দেখিতে পাইথু শিরোপা যে দিথু
এমতি মন যে করে॥
হিয়ার মালা যৌবন ডালা
পশারী পশারল যেন।
চাঁদ যে কাটিয়া চাকা যে গড়িয়া
তাহাতে বৈসাল হেন॥
অধর-সুধা পড়িছে জুদা
দশন-মুকুতা শশী।
মোর মনে হয় এমতি করয়
তাহাতে যাইয়া পশি॥"

যে তত্ত্ব যতখানি ভাবসাম্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যতখানি সুষমতায় বিমণ্ডিত, সেই তত্ত্বের প্রতীক ততখানি সৌন্দর্য্যে বিহসিত। তাই, চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের মুখে উক্তি আরোপ করিয়াছেন—যে রাধিকার সর্ব্বাঙ্গ হইতে রূপ ঝরিয়া পড়িয়া চলন্ত রূপের হাট সৃজন করিয়াছে, সেই রাধিকাকে মূর্ত্তিময়ীরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছে কে ?

যাহা প্রাপ্তির অনুকূলে সুদূরে অবস্থিত, তাহাকে সন্নিকটবর্ত্তীরূপে লাভ করিয়া তাহার আত্মসত্তায় অনুপ্রবেশ করিতে সমর্থ হইলে পরিপূর্ণ প্রাপ্তি ঘটে। "মোর মনে হয়, এমতি করয়, তাহাতে যাইয়া পশি"—এস্থলে প্রবেশ করা অর্থে ধ্বনি-বিগ্রহবতী রাধিকার ধ্বনিগত তত্ত্বে অনুপ্রবেশ বলিয়াই আমরা বুঝি।

রাধিকার পূর্ব্বরাগ বর্ণনায় চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

রাধিকা সখীকে বলিতেছেন—

"সই, কি আজু দেখিল রঙ্গ।
আজু গিয়াছিনু যমুনার কূলে
দুই চারি জন সঙ্গ॥
এক কালা দেহ বসন ভূষণ
চূড়াটি টলিয়া বামে।
হেরম্ব অনুজ তাহে আরোপিত
বেড়িয়া কুসুমদামে॥
তার মাঝ দিয়া ময়ূরের পাখা
হেলিছে দুলিছে বায়।
যেমন রবির সুতার তরঙ্গ (কিরণ)
লহরী তেমনি প্রায়॥

তাহে শশধর মলয় চন্দন
তার মাঝে গোরচনা।
তাহার সৌরভ পেয়ে অলিকুল
করে আসি আনাগোনা॥
কটাক্ষ মিশালে হাসির হিল্লোলে
অমিয়া বরিষে রাশি।
দেখিয়া সে রূপ হেন মনে করি
সদা থাকি নিশি দিশি॥"

"সদা থাকি নিশি দিশি"—নিশা-দিবার বিভেদবিহীনতায় সদাই কৃষ্ণরূপে মজিয়া থাকি।

অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্য সম্পর্কে রাধিকা বলিতেছেন—

"সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমনি শ্যামের চিকণ দেহা
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে
চাঁদ নিঙ্গারি কৈল থেহা॥
থেহা নিঙ্গাড়িয়া কেবা মু'খানি বনা'ল রে
জবা নিঙ্গাড়িয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে
ভুজ, জিনিয়া করি শুণ্ড॥
কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র (১) মাখিয়া কেবা সারদ্রা (২) বনাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর॥

বিস্তারি পাষাণে কেবা রত্ন বসাইল রে
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
দাম কুসুমে কেবা সুষমা করেছে রে
এমতি তনুর দেখি আভা ॥”

১। আরদ্র—হরিদ্রা ২। সারদ্র—পীতবর্ণ

এই পদে চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার উপমারাজি রাধিকার উক্তিরূপে সন্নিবিষ্ট করিতে যাইয়া আপনাকে একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছেন যিনি অনুভববেদ্য সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের পরম উৎস, তাঁহার স্থূল প্রতীকের রূপকে ভাষায় প্রতিভাসিত করিয়া তোলা রূপকারের পক্ষে আত্মবিস্মৃতিমূলক হওয়াই উচিত বটে। আত্মচেতনার উপরে যদি পরম চেতনা আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম না হয়, তবে তৎ-প্রতীকের রূপৈশ্বর্য্যকে যথাবিহিতভাবে ভাষায় চিত্রিত করিয়া তোলা সম্ভবপর হইবে কেমন করিয়া ?

প্রেমঘন বিগ্রহবতী রাধিকা এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণরূপে বিগলিত। তিনি সখীকে বলিতেছেন—

“শুনগো সজনি সই।
কেমনে রহিব কানু না দেখিয়া
নিশি দিন হেদে রোই (কাঁদি)॥
হেন মনে করি আঁচল ঝাপিয়া
আঁচলে ভরিয়া রাখি।
পাছে কোন জনে ডাকা [illegible] দিয়া
লয়ে যায় সখি ॥”

শ্রীকৃষ্ণতদ্গতচিত্তা রাধিকা সখীকে অন্যত্র বলিতেছেন—

“কালা হইল ঘর আন কৈল পর
কালা সে করিল সারা ॥

কালার ধেয়ান আর নাহি মন
কালিয়া আঁখির তারা ॥
পরাণ অধিক হিয়ার মানস
কালিয়া স্বপনে দেখি।
গমনে কালিয়া রূপেতে কালিয়া
নয়নে কালিয়া দেখি ॥
গগনে চাহিতে সেখানে কালিয়া
ভোজনে কালিয়া কানু।
নয়ন মুদিলে সেখানে কালিয়া
কালিয়া হইল তনু ॥"

চিৎস্পন্দনময় ঊর্দ্ধলোকের সন্দিপনীময়ী রসধারা স্নায়ুজালে স্পন্দন জাগরিত করিলে যাঁহারই সমাশ্রয়ে সেই জাগরণ সম্ভব হয়, তাঁহারই প্রতি অনুপমেয় প্রেমের সঞ্চার হয়। তখনই সদা মনে এই বোধ উদিত হয় যে, যদি বা তাঁহাকে হারাইয়া ফেলি; তখনই যে দিকে আঁখি ফিরান যায়, সেইদিকে তাঁহারই রূপ প্রতিভাসিত হয়; তখনই সূক্ষ্মস্তরের অনাহত শব্দের মাধুর্য্য উপভোগ করা সম্ভবপর হয়। এই অনাহত শব্দ সম্পর্কে চণ্ডীদাস রাধিকার মুখে উক্তি সমর্পণ করিয়াছেন—

"সই কে বা শুনাইল শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল প্রাণ ॥"

শ্যামনাম = কৃষ্ণমন্ত্র কৃষ্ণমন্ত্র = অনাহত ধ্বনি

(৫)

সাধক যখন ব্যষ্টি মনকে ডিঙ্গাইয়া অখণ্ড মনে অধিরোহণ করেন, তখন তিনি এই অখণ্ড মনের সমান্তরালে স্থিত অখণ্ড দর্শন এবং অখণ্ড শ্রবণের

রাজ্যেও আধিপত্য লাভ করেন। আপাতদৃষ্টিতে অথণ্ড মন-বিলাসিনী রাধিকার কৃষ্ণবিচ্ছেদ একটা স্থূল পর্য্যায়ের বিচ্ছেদ বলিয়াই প্রতিভাত হয়। কিন্তু, যেহেতু স্থূল জগৎ সূক্ষ্ম জগতেরই ক্রমাভিব্যক্তি, সেই হেতু স্থূল দেহধারীর পক্ষে স্থূলের বিচ্ছেদ হইতে উপজাত ক্লেশ পরিহার করিয়া চলিবার উপায় নাই। এই জন্যই আমরা দেখিতেছি, তত্ত্ববিগ্রহবতী রাধিকা তত্ত্ববিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে এতই শোকাতুরা হইয়া বিলাপ করিতেছেন। যথা—

"সখি রে, মথুরা মণ্ডলে পিয়া।
আসি আসি বলি পুন না আসিল
কুলিশ পাষাণ হিয়া॥
আসিবার আশে লিখিনু দিবসে
খোয়ানু নখেরই ছন্দ।
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে
দু আঁখি হইল অন্ধ॥"

"পিয়া গেল দূর দেশে হাম অভাগিনী।
শুনিতে না বাহিরায় এ পাপ পরাণী॥
পরশি সোঙরি মোর সদা মন ঝুরে।
এমন গুণের নিধি লয়ে গেল পরে॥
কাহারে কহিব সই আনি দিবে মোরে।
রতন ছাড়িয়া গেল ফেলিয়া পাথারে।
গরল আনিয়া দেহ জিহ্বার উপরে
ছাড়িব পরাণ মোর কি কাজ শরীরে॥"

যিনি জীবন ও বর্দ্ধনের পরম উৎস, যুগযুগান্তে রূপ-পরিগ্রহশীল, তাঁহাকে যখন বস্তু জগতের পরিবেষ্টনীতেই লাভ করা গিয়াছে, তখন বস্তু জগতের বাহ্য ব্যবহার দ্বারা তাঁহাকে কি পরিশোভিত করিতে হইবে না? তাই, আমরা দেখিতেছি, রাধিকা শোকের ভিতরেও প্রিয়তমকে সজ্জিত করিবার কথা বলিতেছেন, যথা—

"অগুরু চন্দন চুয়া দিব কার গায়।
পিয়া বিনু মোর হিয়া ফাটিয়া যে যায়॥"

চণ্ডীদাসের রাধিকা সবিশেষ অভিমানিনী নহেন। প্রিয়তমের বিচ্ছেদ-শোকে তিনি যে অল্প সময়ের জন্য মানের অভিনয়কে রূপ দিয়াছিলেন, তাহারই অন্তে তিনি সখেদে বলিয়াছেন—

"আপন শির হাম আপন হাতে কাটিনু
কাহে করিনু হেন মান।
শ্যাম সুনাগর নটবর-শেখর
কাঁহা সখি করল পয়ান॥
তপ বরত কত করি দিন-যামিনী
যো কানুকো নাহি পায়॥
হেন অমূল্য ধন মঝু পদে গড়ায়ল
কোপে মুঁই ঠেলিনু পায়॥"

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজমণ্ডলে আনয়ন করিতে না পারিলে কৃষ্ণোন্মাদিনী রাধিকা আর স্থৈর্য লাভ করিতে পারিতেছেন না। তিনি তাঁহার এক সখীকে মথুরায় প্রেরণচ্ছলে বলিতেছেন—

"সখি, কহিবি কানুর পায়।
সে সুখ-সায়র দৈবে শুকায়ল
তিয়াষে পরাণ যায়॥
সখি, ধরিবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না তেজবি
মাগিয়া লইবি বর॥
সখি, বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে আইসে সে জন
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভন॥"

এই পদে শ্রীকৃষ্ণকে কোন প্রকার কটু কথা বা রাধিকার মান-অভি
নিবেদন করার কোন কথা নাই। শ্রীকৃষ্ণ মুখনিঃসৃত 'বর' অর্থাৎ f
ব্রজমণ্ডলে আসিতেছেন—এইরূপ সংবাদ লাভ করিবার জন্য বাক্যে ও আচ
তাঁহাকে দ্রবীভূত করিয়া তুলিবার উপদেশ আছে।

ব্রজধামকে সঞ্জীবনীমন্ত্রে আপূরিত করিয়া তুলিতে রাধিকার নয়ন-
শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমন করিতেছেন। এই সুখ-চিন্তায় চণ্ডীদাস আনন্দ-বি
হইয়া রাধিকার মুখে উক্তি অর্পণ করিয়াছেন—

"সই, জানি সুদিন কুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল॥
চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে
পুলক যৌবন-ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার॥
প্রভাত সময়ে কাক কোলাকুলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার নাম সুধাইতে
উড়িয়া বসিল তায়॥"

চির-বাঞ্ছিত প্রেমময়কে, দয়িতকে আপন সান্নিধ্যে লাভ করার পর রাধি
তাঁহাকে স্নিগ্ধ-কোমল বাক্যে যাহা বলিতেছেন, তাহাতে—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

—এই তত্ত্বই সুপরিস্ফুট হইয়াছে। রাধিকা বলিতেছেন—

"বহু দিন পর বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥

এতেক সহিল অবলা বলে।
কাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥
এ সব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥''

প্রিয়তমের সহিত মিলনে রাধিকা তাঁহারই মধুর-সবল আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন—

''বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হইও তুমি॥
বহু পুণ্যফলে গৌরী আরাধিয়ে
পেয়েছি কামনা করি।
না জানি কি ক্ষণে দেখা তব সনে
তেঁই সে পরাণে মরি॥
বড় শুভ ক্ষণে তোমা হেন নিধি
বিধি মিলায়ল আনি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
অধিক করিয়া মানি॥
আনের আছয়ে আন যত জন
আমার পরাণ তুমি।
তোমার চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইয়াছি আমি॥''

রাধিকা পুনরায় বলিতেছেন—

"বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন ॥
পীরিতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মন নাহি আন ভায় ॥"

(৬)

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের কাব্যোদ্যান হইতে এক্ষণে আমরা পরবর্ত্তী যুগের কাব্য-কানন পরিক্রমায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাঁহারা পরবর্ত্তী কালে পদাবলী রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা শতাধিক হইলেও আমরা বিখ্যাত পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস ও জ্ঞান দাসের কাব্য-বৃক্ষ উৎসারিত কতিপয় পুষ্প আহরণ করিয়াই বর্ত্তমান আলোচনা সমাপন করিব।

গোবিন্দ দাসের পদ; রাধিকা বলিতেছেন—

"যাঁহা পঁহু অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইও মঝু গাত ॥
যো দরপণে পঁহু নিজমুখ চাহ।
হাম অঙ্গজ্যোতি হইও তছু মাহ ॥

যো সরোবরে পঁহু নিতি নিতি নাহ।
হাম অঙ্গ সলিল হইও তছু মাহ॥
যোই বীজনে পঁহু বীজইত গাত।
মঝু অঙ্গ তাহে হইও মৃদু বাত॥
যাঁহা পঁহু ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হইও তছু ঠাম॥"

আমার প্রাণের প্রিয়তম যে ভূমিতে অরুণ রেখা অঙ্কিত করিয়া পদসঞ্চার করেন, তাহা আমার এই রক্তমাংসের দেহ রচনা করুক। আমার প্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ যে দর্পণে নিজ মুখ দর্শন করেন, তাহা আমার দেহ-উৎসারিত ভক্তিস্নিগ্ধ অঙ্গজ্যোতি নির্ম্মাণ করুক। আমার জীবন-বর্দ্ধনের প্রদীপ্ত প্রতীক প্রত্যহ যে সরোবরে স্নান করেন, আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেই সরোবরের শীতল সলিল হউক। আমার কান্ত, দয়িত যে পাখায় ব্যজন করেন, তাহার পরিপার্শ্বে আমার সর্ব্বাঙ্গ মৃদু বায়ু পরিবেশন করুক। আমার সর্ব্বাধিপতি যে শ্যামায়মান মেঘমালায় আপন স্থিতি-অংশ প্রক্ষেপ করিয়াছেন, আমার অঙ্গ প্রসারিত হইয়া গগনরূপে তাহা ধারণ করুক।

"রূপে ভরল দিঠি, সোঙরি পরশ মিঠি,
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী রবে, শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ
সজনি, অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর. তনু মন মাতল,
না শুনে ধরম অব লেশ॥"

শ্রীকৃষ্ণরূপে চারিদিক বিভাসিত দেখিতেছি, তাঁহার স্মৃতির স্পর্শ একান্তই অমৃতস্পর্শী বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহার মননে, ধ্যানে যে অপরিমিত

আনন্দ দেহে জাগরিত হইয়াছে, তাহা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পক্ষে উত্তেজনাপ্রদ নহে, তাহা শুভ্র চিদানন্দ বিলাসেরই উপকরণ যোগাইতেছে। অনাহত ধ্বনিতে মানস-শ্রুতি পরিপূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে অপর কিছুর শ্রবণ-বিষয়ের একান্ত স্থানাভাব ঘটিয়াছে। সখি, এক্ষণে আমাকে কি উপদেশ প্রদান করিবে? কৃষ্ণাকর্ষণে আমি উন্মত্তপ্রায়, কৃষ্ণাতীত ধর্ম্মের কথা আমি শুনিতে পারিব না।

"একলি যাইতে যমুনার ঘাটে।
পদ চিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে॥
প্রতি পদ চিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ॥
লোক দেখিলে কি বলিবে মোরে।
নাসা পরশিয়ে রহিনু দূরে॥
হাসি হাসি পিয়া মিলিল পাশ।
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দ দাস॥"

শ্রীকৃষ্ণ যমুনার ঘাটে যাইবার কালে আমার পদচিহ্ন দেখিয়া তাহা চুম্বন করিলেন। ইহা দেখিয়া এবং লোকে কি বলিবে—ইহা ভাবিয়া আমি আতঙ্কিত হইলাম। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সহসা আমাকে দেখিতে পাইয়া সহাস্যে আমার নিকট আগমন করতঃ আমার আতঙ্ক দূরীভূত করিয়া দিলেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, রাধিকাতত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ওতপ্রোত-জড়িমায় ঘনীভূত হইয়া ভূমণ্ডলে আবির্ভূত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"রাধার দর্শনে আমার জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অচেতন॥"

গোবিন্দ দাস এই উক্তিটিকেই উপরিউক্ত পদে রূপ দিয়াছেন।

জ্ঞানদাসের পদ ; রাধিকা বলিতেছেন—

"শিশুকাল হইতে, বন্ধুর সহিতে,
পরাণে পরাণে লেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি দেহা॥
সই, কি বা সে পীরিতি তার।
আলস করিয়া নারে পাশরিতে
কি দিয়া সুধিব ধার॥
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম॥
আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখন যেদিকে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া
তখন সে দিকে ধায়॥"

যে অস্তিত্বের স্তর হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা যুগলমূর্ত্তিরূপে জগৎ প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহা শুদ্ধতম চৈতন্যের একাঙ্গীনতায় সংগ্রথিত থাকিলেও জগৎনাট্যে তাঁহাদের যে দ্বৈত আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহারই মর্ম্মদাহে রাধিকা বলিতেছেন, কে আমাদের দেহ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া নির্ম্মাণ করিল? শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা একে অপরের বিপরীত সত্তায় সেই শুদ্ধতম চৈতন্যের প্রতীক ছিলেন বলিয়াই সাধনা-বোধ-বাহিত-পথে বিচরণশীল জ্ঞানদাসের পক্ষে রাধিকার মুখে এইরূপ উক্তি আরোপ করা সম্ভব হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই ধ্যানে, তাঁহারই নাম (রাধা নাম) গ্রহণে তন্ময় ছিলেন।

পদাবলী সাহিত্য অবিরল ধারায় অমৃত বর্ষণ করিয়া আমাদের সমষ্টিবদ্ধ চলন্ত গতিকে প্রগতিশীলতায় সমাকৃষ্ট রাখুক—ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

আমরা কোন্ পথে ?

আয়ুর্ব্বেদ—আর্য্যসংস্কৃতির পরম অবদান

(১)

অন্তর বাহিরের সমবায়ে আমাদের যে সমুজ্জল সত্তা তাহার প্রকাশ হইয়াছে, অন্তরতম বিন্দু হইতে এবং বিস্তার হইতেছে বাহিরের দিকে। প্রকাশ-বিন্দু হইতে ক্রম-বিস্তারকে ধারণ করিয়া যে পথ পূর্ব্বতনের চেতনতায় পরিপুষ্ট হইয়া বাহিরের দিকে প্রকটান্বিত হইতে হইতে চলিয়াছে, সেই পথের একটি সুগভীর পাকে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, আমাদের মন—এই বিশ্বের যাহা কিছু লইয়া আমাদের কারবার, তাহারই এক মাত্র নিয়ামক। আকাশে মহাশূন্যের নীল আস্তরণে ঢাকা যে অদৃশ্য রহস্যময় পুরী, তাহারই কোলের একটি ঘুমন্ত নীহারিকা যেমন জাগিয়া উঠে, তাহার শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ লইয়া একটি টেলিস্কোপের ভিতর দিয়া তেমনি আমাদের মন যখন মহা অতীতের গর্ভে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তখন তাহার দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠে, বিরাট আদর্শ—আর্য্যকৃষ্টির তপস্যাভিলিপ্ত সমুন্নত মহিমার প্রতিচ্ছবি। স্ব স্ব বোধ ও বিবেচনার কষ্টিপাথরে যাহা শ্রেষ্ঠ ও অস্তিত্ব-রক্ষার অনুকূল বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাকে যখনই আমরা আকড়াইয়া ধরি,

তখনই আমরা নতজানু হই আমাদের অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের চরণে, যাঁহারা সঞ্জীবনীমন্ত্রময় হইয়া আর্য্যসংস্কৃতির স্যমন্তক কিরীট মস্তকে ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এই আর্য্যাবর্ত্তের বুকে—যাঁহাদের শ্রেষ্ঠ ও পরম অস্তিত্ব বোধ সংস্করণান্তরিত হইয়া আমাদের রক্তকণিকায় বাসা বাঁধিয়াছে। সে বাসা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপায় নাই ; বহু শত বৎসরের সংস্কারহীনতায় যে আপাতস্নিগ্ধতা তাহার গাত্র ঢাকিয়া প্রেতসৌন্দর্য্যে নগ্ন হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা যাইতে পারে বটে।

অধুনা চরক নামে যে গ্রন্থ প্রচলিত, তাহা অত্রি-নন্দন পুনর্ব্বসুর উপদেশানুসারে অগ্নিবেশ-কৃত, চরক-কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত। সেই চরকের প্রারম্ভেই যে সমস্ত মহামানবের নামাবলী প্রাপ্ত হই, জানিতে ইচ্ছা হয়—তাঁহারা কোন্ যুগের ? মানব জাতির হিতচেতনায় উদ্বোধিত হইয়া যাঁহারা হিমগিরির শুভ্র পাদদেশে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, স্বাস্থ্য ও জীবনের নির্ম্মম অপহর্ত্তা ব্যাধির প্রশমনোপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য, জানিতে ইচ্ছা হয়—তাঁহারা কোন্ যুগের ? যে ক্ষীণ আর্য্যসংস্কার এখনও ধমনীতে ধমনীতে ঢেউ বহাইয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, তাহা বোধসঞ্চরণশীলতায় ঘোষণা করিতেছে, তাঁহারা ছিলেন সেই যুগের, যে যুগ ছিল আর্য্যগৌরবপ্রদীপ্ত, অমৃতসন্ধানী, অস্তিবৃদ্ধিজ্ঞানমুখর। নীল সাগরের বক্ষ চিড়িয়া প্রবাল-দ্বীপের ভাসিয়া উঠার মত বিবর্ত্তন-নীতি অনুসৃত হইয়া সেই যুগ জাগিবে না কি আবার আমাদের রক্তনিহিত সংস্কার ভেদিয়া সহস্রদলকমলের রশ্মিচ্ছটা লইয়া ? আসিবে না কি আবার সেই দিন, যে দিন আয়ুর্ব্বেদে অভিজ্ঞান লাভ করিবার জন্য সমগ্র জগৎ আয়ুর্ব্বেদাভিজ্ঞের নিকট ভক্তিবিনম্র কণ্ঠে বলিবে—"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ?"

মহর্ষি ও আচার্য্য পুনর্ব্বসু—অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি, এই ছয়জন শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। অগ্নিবেশাদি শিষ্যগণ ছিলেন একান্ত আচার্য্যনিষ্ঠ। তাহারা জানিতেন, তাহাদের

নিকট হইতে আচার্য্যের পূজা ও প্রাপ্য যেমনি রকমে উৎসারিত হইবে, পারিপার্শ্বিক জনগণ হইতেও তাহারা তেমনি রকমে সম্বর্দ্ধনা ও প্রাপ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবেন।

আচার্য্য পুনর্ব্বসু বলিতেছেন,—বৎসগণ, হিতায়ু, অহিতায়ু, সুখায়ু, দুঃখায়ু—এই চারি প্রকার আয়ু এবং আয়ুর হিতকর ও অহিতকর বিষয়-সমূহ, আয়ুর পরিমাণ, আয়ুর স্বরূপলক্ষণ এবং আয়ুবৃদ্ধির উপায় যে শাস্ত্রে গ্রথিত হইয়া আয়ুর্ম্ময়তার পরিচয় প্রকাশ করিতেছে, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলিয়া জানিবে। আয়ু কি? শরীর, ইন্দ্রিয়, মন এবং আত্মার সংযোজনা প্রবাহের নাম আয়ু। আয়ু শব্দের অন্য নাম ধারি, জীবিত, নিত্যগ ও অনুবন্ধ। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা—ইহাদের পরস্পরকে ধারণ করানই স্বভাব বলিয়া আয়ুর নাম ধারি। চির চেতন বলিয়া ইহা জীবিত। প্রতিক্ষণ গমনশীল বলিয়া ইহা নিত্যগ এবং পূর্ব্বাবস্থানকে ত্যাগ করিয়া পরাবস্থানকে সংযোগ রূপে অনুবন্ধন করে বলিয়া আয়ুকে অনুবন্ধ কহে।

যেমন তিন খানা দণ্ডের উপরিভাগ পরস্পর সংযুক্ত করা হইলে তাহা দণ্ডায়মানযোগ্য হইয়া ভারবহনশীল হইতে পারে, সেইরূপ মন, আত্মা ও শরীর, এই তিনটি পদার্থের সংযোগের উপরই পুরুষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুরুষ চিরচেতন, কিন্তু এই পুরুষকেই সকল সুখদুঃখাদির আধার বলিয়া জানিবে।

বলিতে পার, এই পুরুষ ব্যাধিগ্রস্ত হয়, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? পুরুষের আত্মবৈশিষ্ট্য যখনই অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখনই তাহা সম্ভব হয়। পুরুষ চলার পথে জ্ঞানরূপ সঙ্গী লইয়া চলিবার অপেক্ষা রাখে। সেই জ্ঞান-সঙ্গীর অভাবে তাহার দোষত্রয়ে যখনই অসমতার সঞ্চার হয়, তখনই তাহা সম্ভব হয়; আর এই অসমতার সমীকরণের যে ব্যবস্থা, তাহাকেই চিকিৎসা বলিয়া জানিবে।

যে বিষয় বার বার উপভোগ করিলেও পুরুষ ক্লিষ্ট হয় না, বরঞ্চ স্বাচ্ছন্দ্য, হিত, পুষ্টি ও বৃদ্ধি লাভ করে, তাহা পুরুষের সাত্ম্য এবং তদ্বিপরীত

যাহা, তাহা পুরুষের অসাত্ম্য। অর্থাৎ যাহা-কিছু দেহ, মন ও আত্মার হিতকর, তৃপ্তিকর ও জীবনবর্দ্ধনমুখর, তাহা সাত্ম্য এবং তদ্ব্যতীত আর সকলই অসাত্ম্য। ইন্দ্রিয়ার্থ, কর্ম্ম ও কালের সহায়তায় পুরুষ এই সাত্ম্য ও অসাত্ম্য ভোগ করে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ, এই পাঁচটি বিষয় আছে। উহাদেরই নাম ইন্দ্রিয়ার্থ। বাক্য, মন ও শরীরের প্রবৃত্তির নাম কর্ম্ম। ঋতুর সহিত ঋতু-লক্ষণের সমযোগ পুরুষের সুখকর, কিন্তু অতিযোগ, অযোগ এবং মিথ্যাযোগ দুঃখকর। এই ষড়্ঋতু সমন্বিত সময়কে কাল বলিয়া জানিবে। অতএব সমস্ত রোগের মূল কারণ, অসাত্ম্য বা অস্বস্থতা ভোগ—ইন্দ্রিয়ার্থ বা মানসিক অস্বস্থতা, কর্ম্ম বা আচরণের অস্বস্থতা, কাল বা সময়ের অস্বস্থতা।

বৎসগণ, আত্মা নির্ব্বিকার, পরম পদার্থ, নিত্য ও সমস্ত ক্রিয়ার দ্রষ্টা। আত্মা শব্দস্পর্শাদি ভূতগণের, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের ও মনের সাহায্যেই চৈতন্যে প্রকাশিত হন। আমাদের আত্মা সেই পরমাত্মারই আকারিত সত্ত্বা যাহা এই নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিরাজমান। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদকে জানিতে হইলে ও বুঝিতে হইলে আমাদের সত্তার সুগভীর অংশে প্রবেশ লাভ করা প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে যাহা জানিবার, তাহা অপর সময়ে ব্যক্ত করিব, কিন্তু জানিয়া রাখিবে যে, "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং আরোগ্যং মূলমুত্তমম্"—ইহাই আয়ুর্ব্বেদের গোড়ার কথা।

(২)

অগ্নিবেশ পরম শ্রদ্ধা সহকারে ও বিনীত ভাবে প্রশ্ন করিলেন—আচার্য্যদেব, ধাতুভেদে পুরুষ কয় প্রকার? পুরুষ কি জন্য কারণ? পুরুষ অজ্ঞ কি জ্ঞ? পুরুষ নিত্য কি অনিত্য? আত্মজ্ঞেরা পুরুষকে নিষ্ক্রিয়, সাক্ষী বলিয়া থাকেন, তবে নিষ্ক্রিয় কেমন করিয়া ক্রিয়াশীল হন? পুরুষকে বিভু বলিয়া জানি, তবে শৈলপ্রাচীর ব্যবস্থিত বস্তু তিনি দেখিতে পান না

কেন? পুরুষ কেমন করিয়া দেহ হইতে দেহান্তরে জন্ম পরিগ্রহ করেন? কেমন করিয়াই বা তাহার দেহে ব্যাধির উৎপত্তি হয়? এই সকল বিষয় সবিস্তারে জানিবার জন্য আমাদের বিশেষ ইচ্ছা হইয়াছে। কৃপা করিয়া আপনার অধম সন্তানগণকে ঐ বিষয়ের জ্ঞান প্রদান করুন।

আচার্য্য পুনর্ব্বসু অমৃতনিষ্যন্দী কণ্ঠে কহিলেন,—বৎসগণ, আমাদের এই স্থূল দেহ একান্ত নশ্বর। এই নশ্বর দেহের অন্তরালে আমাদের যে অবিনশ্বর দেহ মহা-সমুজ্জ্বল হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে, তন্নিহিত বিষয়সমূহ জানিবার জন্য তোমাদের যে পরম ঔৎসুক্য জাগিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমি অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। যাহা জানি না, অথচ যাহা জানা যায়, তাহাকে জানিবার ক্ষুধা যদি ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধার মত সুতীব্র হইয়া না উঠে, তবে তাহাকে জানা যায় না। আমি প্রফুল্ল চিত্তে তোমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। তোমরা অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর।

ধাতুভেদে পুরুষ তিন প্রকার—একধাতুক, ষড়্ধাতুক এবং চতুর্ব্বিংশতি ধাতুক। যে শক্তি নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজমান, মহাপ্রলয় কালে যে শক্তি নিজেই নিজের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ভাবাতীত ও দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা লাভ করেন, সেই শক্তি এক ধাতুক পুরুষ। পঞ্চ মহাভূতের সহিত চেতনা ধাতুর সংযোগে যাহার উৎপত্তি, তাহা ষড়্ধাতুক পুরুষ। আর মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ এবং অষ্ট প্রকৃতির সমবায়ে যাহার উৎপত্তি, তাহা চতুর্ব্বিংশতিধাতুক পুরুষ।

একধাতুক পুরুষই পরমাত্মা বা পরম পুরুষ। পরম পুরুষ স্বয়ম্ভু। তাঁহার উৎপত্তির কোন কারণ নাই। তাঁহার ইচ্ছাতেই জগৎ সৃষ্টি, তাঁহার ইচ্ছাতেই জগৎ ধ্বংস। আমরা সঙ্গ-বিহীন হইয়া এই জগতে একা একা বসতি করিতে পারি না। আমাদের এই অন্তর্নিহিত স্বভাব পরম পুরুষের স্বভাবের অনুকৃতিবিশেষ। কেননা, পরম পুরুষও নির্ব্বিকার অবস্থায় এককরূপে বহু কাল অবস্থান করিতে পারেন না। তাই, তিনি নিজেকেই বহু রূপে সৃষ্টি করিয়া বহুকে লইয়া উপভোগ

করেন। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এক একটা সৃষ্টি পরম পুরুষের এক একটা ভাবের স্ফুর্তি-বিশেষ। তাঁহার কোন ভাববিশেষের স্ফুর্তির লয় অর্থই এক একটা সৃষ্টির লয় হওয়া; আর তাঁহাতে যখন সর্ব্ব ভাবের স্ফুর্তির লয় ঘটে, তখনই মহাপ্রলয় সমুপস্থিত হয়।

সূক্ষ্মের প্রকাশ স্থূলাভিমুখী। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যখন দৃশ্যতঃ রূপসমন্বিত হইয়া উঠিয়াছিল না, তখন উহা তদুপকরণের সারভূত এক সূক্ষ্ম সত্তার ভিতর প্রকাশমানতা লইয়া বিদ্যমান ছিল। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সেই সূক্ষ্ম সত্তাকে পঞ্চতত্ত্ব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি—ইহারাই ঐ পঞ্চতত্ত্বের সমবায়। উহাদিগকে পঞ্চ মহাভূতও বলে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—ইহারা পঞ্চ মহাভূতের গুণ। আকাশ কেবল মাত্র শব্দগুণবিশিষ্ট এবং তাহার পর পরটী যথাক্রমে এক একটি অধিক গুণবিশিষ্ট। অবশ্য প্রত্যেকটি মহাভূতের এক একটি নিজস্ব প্রধান গুণও আছে। আকাশের প্রধান গুণ শব্দ, বায়ুর প্রধান গুন স্পর্শ, অগ্নির প্রধান গুণ রূপ, জলের প্রধান গুণ রস এবং ক্ষিতির প্রধান গুণ গন্ধ। চেতনা ধাতু বা জীবাত্মা কারণ হইতে বিনির্গত হইয়া সূক্ষ্ম অতিক্রম করিবার কালে ঐ পঞ্চতত্ত্বের সহিত সম্মিলিত হন এবং ঐ পঞ্চতত্ত্বের জ্ঞান লইয়া ষড়্‌ধাতুক পুরুষ রূপে খ্যাত হইয়া স্থূল জগতে রূপ পরিগ্রহ করিবার জন্য ক্রমে আরও আরও বস্তুর সহিত সম্মিলিত হইতে থাকেন।

চতুর্ব্বিংশতি ধাতুক পুরুষের ব্যাপক উপাদান সমূহের কথা ভিন্ন ভিন্ন করিয়া বলিতেছি—

মন—চিন্তার পর্য্যায়ক্রমিক যে চলন, তাহা মন। পারিপার্শ্বিকের সংঘাতে যে চিন্তা তরঙ্গায়িত হয় না, সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান জন্মে না। যে চিন্তা তরঙ্গায়িত হয়, সেই সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। অতএব যুগপৎ জ্ঞানের অভাব ও ভাব—ইহা একটি মনের লক্ষণ। অণুত্ব ও একত্ব এই দুইটি মনের গুণ। এই প্রকার গুণ বিদ্যমান থাকাতেই এক সময়ে মনের অনেক ইন্দ্রিয়ে প্রবৃত্তি

হয় না এবং ঐ প্রকার গুণের জন্যই—কারণ হইতে বহু দূরে অবস্থিত মন পুনরায় কারণে প্রত্যাগমন করিয়া উহাতে বিলীন হইয়া যাইতে পারে। চিন্ত্য, বিচার্য্য, তর্ক্য, ধ্যেয় ও সঙ্কল্প্য এবং অপর যে কোন বিষয় মনের জ্ঞেয়, তৎসমুদয় মনের বিষয়। ইন্দ্রিয়ার্থ বা ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণে প্রবৃত্তি এবং গ্রহণের পর যে নিবৃত্তি, তাহা মনের কর্ম্ম।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণন, রসন ও স্পর্শন—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের বিষয়াদি গ্রহণ করিয়া ত্যাজ্য, উপেক্ষ্য, কি গ্রাহ্য—এই বিষয়ে মনে যে নিশ্চয় নির্দ্দেশক বুদ্ধির উদয় হয়, তাহাই মনের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ঐ ইন্দ্রিয়গণ হইতেই সমুদ্ভূত হয় বলিয়া উহাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়ের, কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের, নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের, জিহ্বা রসনেন্দ্রিয়ের এবং ত্বক স্পর্শনেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান। এই জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল অপ্রত্যক্ষ। উহাদের স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা উহারা অনুমিত হয়।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—কথন, গ্রহণ, চলন, বর্জ্জন ও প্রীণন, এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। উহাদের অধিষ্ঠান যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। বাক্ কথনে, পাণি গ্রহণে, পাদ গমনে, পায়ু বর্জ্জনে, উপস্থ হরষে প্রবৃত্ত হয়।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ার্থ বা ইন্দ্রিয়ের বিষয়। কর্ণ দ্বারা শব্দের, ত্বক দ্বারা স্পর্শের, চক্ষু দ্বারা রূপের, জিহ্বা দ্বারা রসের ও নাসিকা দ্বারা গন্ধের অনুভূতি জন্মে।

অষ্ট প্রকৃতি—পঞ্চ তন্মাত্র, যথা—শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র, গন্ধ তন্মাত্র এবং জীবাত্মা বা চেতনাধাতু, বুদ্ধিতত্ত্ব ও অহঙ্কার—এই আটটি ভূত প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। অব্যক্ত হইতে বুদ্ধিতত্ত্বের উদ্ভব। বুদ্ধিতত্ত্বেই আমি সর্ব্বময়কর্ত্তা, এই অদ্বৈত ভাবের স্ফুরণ হয়। এই বুদ্ধিতত্ত্ব হইতেই অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এই সকলগুলি মিলিয়া চতুর্ব্বিংশতি-ধাতুক পুরুষ। ষড়্-ধাতুক পুরুষ ইহারই কুক্ষীকৃত রূপান্তরিত অবস্থা। কতকগুলির সমবায়ে আসলে উভয়েই

এক। প্রলয় কালে পুরুষ আপন প্রকৃতিগুণ হইতে বিযুক্ত হন। উক্ত প্রকারে পুরুষ সৃষ্টি সময়ে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত ভাব এবং প্রলয় কালে ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত ভাব লাভ করেন। এই প্রকারে রজ ও তমোগুণযুক্ত হইয়া জন্ম-মৃত্যুচক্রে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। সত্ত্বগুণান্বিত হইয়া কারণের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে পুরুষের জন্মমৃত্যুর বন্ধন দূর হয় না।

যাহা-কিছু বলিলাম, তাহা অনুভূতি দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে স্বচ্ছ রকমে বুঝিতে পারিবে না। অনুভূতি অর্থ—পশ্চাৎ হওয়ার ভাব। তাহা হইলে অগ্র আছেই। অগ্র না থাকিলে পশ্চাৎ থাকিতে পারে না। অতএব অগ্রে তোমাদিগকে ইষ্টনিষ্ঠাপরায়ণ হইয়া ধারণা, বোধ ও মননকে কারণাভিমুখী করিয়া তুলিতে হইবে। গৃধ উড়িয়া আকাশের যত উপরে আরোহণ করে, তত অধিক স্থান তাহার দৃষ্টি মধ্যে পতিত হয়। সেইরূপ তোমরাও যতখানি সূক্ষ্মতর ভূমিতে অনুপ্রবেশ করিতে পারিবে, সৃষ্টিরহস্য ততই বেশী করিয়া তোমাদের নিকট প্রতিভাত হইবে। আমরা ত জানি সকলই। কেননা, সর্ব্ব কারণের কারণ যিনি, আমরা তাঁহা হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছি। তিনিই আপন ইচ্ছায় লীলা বিস্তার করিয়া আমরা হইয়া আমাদিগকে লইয়া অভিনয় করিতেছেন। আমাদের ভিতরে তিনি-রূপ যে পরম-আমি বহু কাল যাবৎ সুপ্তিতে মগ্ন থাকিয়া আপনাকে ভুলিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে ইষ্টপরায়ণতার ভিতর দিয়া জাগরিত করিয়া লইতে পারিলে আমাদের সকল প্রকার জানা বাস্তব হইয়া উঠিতে পারে।

তারপর তোমাদের প্রশ্ন পুরুষ কি জন্য কারণ? তিনি জ্ঞ কি অজ্ঞ, নিত্য কি অনিত্য?

পুরুষের সংযোগ যে কত প্রকারের, তাহার কি কোন অন্ত আছে? কিন্তু রজ ও তমোগুণ নিরাকৃত হইলে সত্ত্বগুণ দ্বারা পুরুষ হইতে ঐ সংযোগের নিবৃত্তি সাধন হইয়া থাকে এবং এক মাত্র ঐ অবস্থাতেই পুরুষের মুক্তি-লাভ হয়। এই পুরুষে কর্ম্ম, এই পুরুষেই ফল, এই পুরুষেই জ্ঞান,

এই পুরুষেই মোহ অর্থাৎ সদসৎ যাহা-কিছু লইয়া পুরুষের পুরুষত্ব, তাহার সবই পুরুষে প্রতিষ্ঠিত। যিনি ইহা তত্ত্বতঃ বুঝেন, তিনি সকলই বুঝিতে সমর্থ। পুরুষ না থাকিলে পুরুষের পারম্পর্য্য-ভাব থাকিত না। পুরুষ আমাদের প্রতি ঘটে অবস্থিত আছেন বলিয়াই আমরা পুরুষের তত্ত্ব জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হই। এইজন্যই কারণজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুরুষকে কারণ বলেন।

পুরুষ জ্ঞ, কিন্তু চিৎশক্তির সহিত সংযোগ না হইলে পুরুষের জ্ঞান জন্মে না।

যিনি পরম পুরুষ, তিনি নিত্য; আর তাঁহা হইতে জাত পুরুষ অনিত্য। কেননা ঐ পুরুষ পরমপুরুষেই যাইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকেন।

(৩)

তোমাদের অবশিষ্ট প্রশ্নগুলি এই—আত্মজ্ঞেরা পুরুষকে নিষ্ক্রিয়, সাক্ষী বলিয়া থাকেন, তবে নিষ্ক্রিয় কেমন করিয়া ক্রিয়াশীল হন? পুরুষকে বিভু বলিয়া জান, তবে শৈলপ্রাচীর ব্যবহিত বস্তু তিনি দেখিতে পান না কেন? পুরুষ কেমন করিয়া দেহ হইতে দেহান্তরে জন্ম পরিগ্রহ করেন? কেমন করিয়াই বা তাহার দেহে ব্যাধির উৎপত্তি হয়?

বৎসগণ, পুরুষ ও প্রকৃতি সৃষ্টির আদি কারণ। আদিতে পরম পুরুষ যখন সৃষ্ট হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখনই শব্দ ও চৈতন্য রূপে দুইটি ধারা তাঁহা হইতে বিনির্গত হয়। শব্দই পুরুষ এবং চৈতন্য প্রকৃতি। অতএব প্রকৃতিকে বাদ দিয়া পুরুষ নিষ্ক্রিয়, সাক্ষী নহেন কি? আর প্রকৃতি সহযোগে পুরুষ ক্রিয়াশীল নহেন কি?

বিভু অর্থ সর্ব্বগত ও মহান্। আত্মা যখন দেহ প্রপঞ্চে আবদ্ধ এবং যোগরাহিত্য হন, তখন তিনি শৈলপ্রাচীর ব্যবহিত বস্তু দেখিতে পারেন না। কিন্তু যোগস্থ হইয়া সমাধি অবলম্বন করিলে তিনি সকলই দেখিতে পান। যোগ অর্থ ইষ্টে যুক্ত হওয়া এবং সমাধি তাহারই একটা মহামহিমময়

সমুন্নত অবস্থা। সমাধি দুই প্রকার—সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। পরিপার্শ্বের সংঘাত যখন যুক্ত হওয়ার ভাব ভাঙ্গিয়া দিতে পারে না, তখন তাহাকে সবিকল্প সমাধি বলে; আর নির্ব্বিকল্প সমাধি তাহাকেই বলে, যাহাতে যুক্ত হওয়ার ভাব এত প্রগাঢ় হয় যে, ধ্যেয় ইষ্টমূর্ত্তির অস্তিত্বের রেখাও হারাইয়া যায়। ধ্যান ও ধারণা তোমরা নিত্যই অভ্যাস করিতেছ। ইহা তোমরা উপলব্ধি করিয়াছ যে, ধ্যান ও ধারণাতে তোমাদের প্রগাঢ় ভাব যতই বৃদ্ধি পায়, ততই নূতন নূতন দর্শন ও শ্রবণ তোমাদের উপলব্ধিতে প্রতিভাত হয়। পরম পুরুষ পর্য্যন্ত এই দর্শন ও শ্রবণের ক্রমাগতি আছে। এই ক্রমাগতিকে অবলম্বন করিয়া যত অধিক সূক্ষ্ম সত্তায় অনুপ্রবেশ করা যায়, তত অধিক জানার অধিকার জন্মে। এই জানার ক্রম অনুযায়ী শৈলপ্রাচীর ব্যবহিত বস্তুর দর্শন ত আসেই, অধিকন্তু লোক-লোকান্তরের দর্শনও সমুপস্থিত হয়।

পুরুষ সংস্কার-বশে মনোবেগে এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করেন। সংস্কার অর্থ কর্ম্মের ছাপ। যে যে সংস্কার লইয়া পুরুষ এই লোক হইতে সূক্ষ্ম লোকে প্রয়াণ করেন, সেই সংস্কার সমুজ্জ্বল হইয়া তখনও তাহাতে বর্ত্তমান থাকে। সংস্কার তিন প্রকার—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মান। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের জমায়েৎ যাহা, তাহা সঞ্চিত। যাহা খণ্ডিত হইতেছে, তাহা প্রারব্ধ এবং কৃত কর্ম্মের দ্বারা যাহা আহরিত হইতে থাকে, তাহাকে ক্রিয়মান কর্ম্ম বলে। কর্ম্ম যদি এই প্রকারে করা যাইতে পারে, যাহাতে নূতন সংস্কারের উৎপত্তি হয় না এবং প্রারব্ধের ভিতর দিয়া সঞ্চিত সংস্কারকেও যদি খণ্ডন করিয়া ফেলা যায় অর্থাৎ পুরুষ যদি সংস্কারাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন, তবেই তাহার দেহ হইতে দেহান্তরে পরিভ্রমণ করিতে হয় না। কিন্তু সংস্কার বশেই তিনি দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করিতে বাধ্য হন। তাহা কেমন? যেমন তোমরা কাহাকেও আহ্বান করিলে সে উত্তর দেয়। সেইরূপ পুরুষ যে সংস্কারে প্রধান হইয়া ভাবলোকে অবস্থান করেন, স্ত্রী-পুরুষের মিলন কালে সেই সংস্কার অনুযায়ী ভাব দ্বারা যদি তাহারা অনুপ্রাণিত

হন, তবে স্ত্রীগর্ভে সেই পুরুষের আবির্ভূত হওয়ার আহ্বান হয়। সেই আহ্বানে তাহার উত্তর না দিবার উপায় নাই। তিনি আসেন সেই গর্ভে। তারপর মাতৃগর্ভে প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া পুরুষ ক্রমে ক্রমে দেহ পরিগ্রহ করেন।

এই গর্ভ মাতৃজ, পিতৃজ, আত্মজ, সাত্ম্যজ এবং রসজ বলিয়া জানিবে। গর্ভের যাহা যাহা মাতৃজ, তাহা এই—ত্বক, শোণিত, মাংস, মেদ, নাভি, হৃদয়, ক্লোম, যকৃৎ, প্লীহা, বৃক্ক, বস্তি, মলাশয়, আমাশয়, উত্তরগুদ, অধরগুদ, ক্ষুদ্রান্ত্র, স্থূলান্ত্র, হৃদয়স্থ মেদ ও মেদোবহ স্রোত। গর্ভের যাহা যাহা পিতৃজ তাহা এই—কেশ, শ্মশ্রু, নখ, লোম, দন্ত, অস্থি, শিরা, স্নায়ু, ধমনী ও শুক্র। গর্ভের যাহা যাহা আত্মজ অর্থাৎ জন্মকালে এবং জন্মের পরে আত্মা হইতে যাহা জন্মে, তাহা এই—[illegible] কর্মফল অনুসারে তত্তৎ যোনি-প্রাপ্ত, আয়ু, আত্মজ্ঞান, মন, ইন্দ্রিয়-সমূহ, প্রাণ ও অপান বায়ু, ধারণা, আকৃতি, স্বর, বর্ণ, সুখদুঃখ, ইচ্ছাদ্বেষ, চেতনা, ধৃতি, বুদ্ধি, স্মৃতি, অহঙ্কার, প্রযত্ন এবং মোক্ষ। অসাত্ম্যসেবী স্ত্রী-পুরুষের শুক্রশোণিতের মিলনের ফলেও গর্ভ হইতে পারে এবং সাত্ম্যসেবী স্ত্রী-পুরুষের শুক্রশোণিত ও গর্ভাশয় যদি বিশুদ্ধ হয় এবং ঋতুকালে গর্ভাশয়ে উহাদের মিলন হয়, আর পুরুষের তাহাতে অনুপ্রবেশ করিবার কারণ যদি না হয়, তাহা হইলেও গর্ভ হয় না। কিন্তু গর্ভের যাহা সাত্ম্যজ, তাহা বলিতেছি। আরোগ্য, অনালস্য, অলোলুপতা, ইন্দ্রিয়বৈমল্য, স্বরোৎকর্ষ, বর্ণোৎকর্ষ শুক্রশোণিতের দোষাভাব এবং প্রহর্ষাধিক্য অর্থাৎ মৈথুনে সুখোৎপত্তি ইত্যাদি সাত্ম্যজ। গর্ভের যাহা রসজ তাহা এই—শরীরের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি, প্রাণানুবন্ধ, তুষ্টি, পুষ্টি ও উৎসাহ। এতদ্ব্যতীত গর্ভ উৎপাদন ও বৃদ্ধির পক্ষে মন উপপাদক অর্থাৎ প্রধানতম অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। মন জীবস্পৃক্,—জীবাত্মাকে নিত্য স্পর্শ করে এবং মনই পুরুষকে দেহের সহিত সম্বন্ধান্বিত করিয়া থাকে। মন সত্ত্ব, রজ ও তম ভেদে তিন প্রকার। এই গুণত্রয়ের যে গুণে পুরুষ

ভূয়িষ্ঠ হন, তদ্‌গুণ-ভূয়িষ্ঠ মন সেই পুরুষের দ্বিতীয় জন্ম পর্য্যন্ত অনুবর্ত্তন করে। সত্ত্বগুণভূয়িষ্ঠ মনের অনুবর্ত্তন হইলে পুরুষ পূর্ব্ব জন্মের বিষয় স্মরণ করিতে পারেন অর্থাৎ পুরুষ জাতিস্মরত্ব লাভ করেন।

তারপর কেমন করিয়া দেহে ব্যাধির উৎপত্তি হয়? তোমাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, চলার পথে পুরুষের জ্ঞান-রূপ সঙ্গী লইয়া চলা একান্ত প্রয়োজন। এই জ্ঞানসঙ্গীর অভাবেই পুরুষের আত্ম-বৈশিষ্ট্য মোহাচ্ছন্ন হয়, তাহার দোষত্রয়ে অসমতার সঞ্চার হয় এবং তাহাতেই তাহার দেহে ব্যাধি জন্মে। জ্ঞান অর্থ জানা। স্থূল বুদ্ধি লইয়া যাহা-কিছু জানা যায়, তাহাই জানার শেষ নয়। বৃহতে যত অধিক প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে, ততই জানার পরিধি বৃদ্ধি পাইবে। এই ক্রম-জানাকে আহরণ করিয়া আত্মসম্বিৎ লাভ করাই জ্ঞান-রূপ সঙ্গী লইয়া চলা। পুরুষ যখন এই সঙ্গীকে সঙ্গে লইয়া চলে না, তখনই পুরুষের ধী-ধৃতি-স্মৃতি বিনষ্ট হয়, পুরুষ অশুভ কর্ম্ম করে। তাহার ঐ প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানের নাম প্রজ্ঞাপরাধ। ক্রম-জানাকে আয়ত্ত করিয়া প্রজ্ঞাপরাধকে প্রশমিত না করিলে উহা সর্ব্ব দোষকে প্রকোপিত করিয়া তোলে। অনুপস্থিতিতে মলমূত্রাদির বেগ-প্রদান, উপস্থিতিতে বেগ-ধারণ, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবন, কর্ম্মসমূহের অযথা-বিধি আরম্ভ, বিনয় ও আচার পরিহার, পূজ্য ব্যক্তির অবমাননা, ইষ্টনিষ্ঠা হইতে বিচ্যুতি, নীচকর্ম্মাদিগের সহিত মিত্রতা-স্থাপন, সদ্‌বৃত্তি-বর্জ্জন, ঈর্ষা-মান-ভয়-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ ও ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া নিন্দিত কর্ম্মকরণ এবং পরিপার্শ্বের প্রতি উপেক্ষা ও তাহার উন্নয়নে শৈথিল্য প্রদর্শন ইত্যাদিকে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ প্রজ্ঞাপরাধ বলিয়া থাকেন। বুদ্ধিভ্রংশ দ্বারা যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই প্রজ্ঞাপরাধ বলিয়া জানিবে। ইন্দ্রিয়ার্থ কর্ম্ম ও কালের সহায়তায় অসাত্ম্য সম্ভোগ করাও পুরুষের বুদ্ধিভ্রংশের ফল বলিয়া জানিবে।

এই প্রসঙ্গে পুরুষের সকল প্রকার ব্যাধির নিঃশেষে নিবৃত্তি হয় কোথায়, তাহাও বলিতেছি। তাহাদের নিঃশেষে নিবৃত্তি হয়, যোগে ও মোক্ষে। যোগ

মোক্ষের প্রবর্ত্তক, পথপ্রদর্শক এবং তাহার প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। মোক্ষ অর্থ মুক্তি, সর্ব্ব সংস্কারের অতীত অবস্থা লাভ করা। যতই কারণের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই সংস্কার হ্রাস পাইতে থাকে। যোগ অর্থাৎ ইষ্টের সহিত বিশেষরূপে যুক্ত হইলেই মোক্ষের স্মৃতির উদয় হয়। স্মৃতির উদয় হইলেই সৎ-এ আসক্ত ব্যক্তিগণের উপাসনা, ধর্ম্মশাস্ত্রাভ্যাস, নির্জ্জন স্থানে অবস্থানপ্রিয়তা, বিষয়ে অনাসক্তি, সাধনে অধ্যবসায়, ধৈর্য্য, অনহঙ্কার, বস্তুর তত্ত্বগ্রহণ ইত্যাদিতে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু ইহা জানিবে যে, পৌর্ব্বদেহিক কর্ম্ম দ্বারা যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয়, কর্ম্মের ক্ষয় না হইলে তাহা প্রশমিত হয় না।

বৎসগণ, বিষয়ের পার নাই, সকলই জানা প্রয়োজন। অথচ মানব জীবন সীমাবদ্ধ। একমাত্র ইষ্টকৃপা ব্যতিরেকে দুর্লভ মানব জন্মের যাহা সর্ব্ব-জ্ঞাতব্য, তাহাকে জানা যায় না। আমাদের স্মৃতির সর্ব্বাংশ ব্যাপিয়া আমাদের ইষ্ট বিরাজমান। অতএব যাহা-কিছু আমাদের জানার বিষয়, যাহাকে স্মৃতির মণিকোঠা হইতে আহরণ করিতে হইবে, তাহা এক মাত্র ইষ্টস্মৃতির উদ্দীপনেই সার্থক হইতে পারে। অতএব তোমরা একান্তরূপে ইষ্টনিষ্ঠ হও, ধ্যান ও ধারণায় ইষ্টকে জাগরিত করিয়া তোল। তনু-মন-ধন দ্বারা ইষ্টসেবায় আপ্রাণ হও, ইষ্টকৃপা লাভে তৎপর হও। অনুভব কর যে, ইষ্ট বিনা তোমাদের অস্তিত্ব নাই। তোমরাই ইষ্ট, ইষ্টই তোমরা। বল—ইষ্টকৃপাহি কেবলম্। অগ্নিবেশাদি সকলে সমস্বরে ও উদাত্তকণ্ঠে বলিলেন—ইষ্ট কৃপাহি কেবলম্।

(৪)

অগ্নিবেশ ভক্তিবিনত হইয়া প্রশ্ন করিলেন,—আচার্য্যদেব, গর্ভের মাতৃজাদি অবয়ব সকল কি আকাশাদি মহাভূতের বিকার?

আচার্য্য পুনর্ব্বসু কহিলেন,—বিকার। শব্দ, শ্রোত্রেন্দ্রিয়, লঘুতা, সূক্ষ্মতা—এইগুলি ব্যোমাত্মক। স্পর্শ, স্পর্শেন্দ্রিয়, রৌক্ষ্য, ধাতু রচনা ও শারীরী চেষ্টা—এইগুলি মরুতাত্মক। রূপ, দর্শনেন্দ্রিয়, প্রকাশ, পরিপাক ও উষ্ণতা—

এইগুলি অগ্ন্যাত্মক। রস, রসনেন্দ্রিয়, শৈত্য, মৃদুতা, স্নেহ ও ক্লেদ—এই সকল জলাত্মক। গন্ধ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গুরুত্ব, স্থৈর্য্য ও মূর্ত্তি—এই সকল পৃথিব্যাত্মক। বৎসগণ, পুরুষকে পঞ্চভূতাত্মক জগতেরই একটি নব সংস্করণ বলিয়া জানিবে। এই বিশ্ব-সৃষ্টিতে যে যে উপাদান বিদ্যমান আছে, পুরুষেও সেই সেই উপাদান বর্ত্তমান রহিয়াছে।

অগ্নিবেশ পুনরায় কহিলেন—আচার্য্যদেব, আপনার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে আমরা তত্ত্বটি সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। কৃপা করিয়া বিস্তৃততর করিয়া প্রকাশ করতঃ আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করুন।

আচার্য্য পুনর্ব্বসু বলিলেন,—সপ্তলোকান্বিত এই নিখিল বিশ্বের অবয়ব সকল অপরিসংখ্যেয়, পুরুষের অবয়ব সকলও অপরিসংখ্যেয়। অতএব প্রধান প্রধান অবয়ব সকলের সমতা-সম্পর্কে উদাহরণ দিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এবং অব্যক্ত—এই ছয় ধাতুর সমবায়ে সপ্তলোকান্বিত এই মহালোক। এই মহালোকের একটি ক্ষুদ্র প্রতীক—এই পুরুষ। পৃথিবী পুরুষের মূর্ত্তি, জল পুরুষের ক্লেদ, তেজ পুরুষের সন্তাপ, বায়ু পুরুষের প্রাণ, আকাশ পুরুষের ছিদ্র, অব্যক্ত বা ব্রহ্ম পুরুষের আত্মা। লোকে যেরূপ ব্রহ্মাদি প্রজাপতি ব্রহ্মের বিভূতি, পুরুষের তৎস্বরূপ সত্ত্ব অন্তরাত্মার বিভূতি। লোকে যেমন ইন্দ্র, পুরুষে তৎস্বরূপ অহঙ্কার। লোকে যেমন আদিত্য, পুরুষে তৎস্বরূপ আদান বা শোষণ। লোকে যেমন রুদ্র, পুরুষে তৎস্বরূপ রোষ। লোকে যেমন চন্দ্র, পুরুষে তৎস্বরূপ প্রসাদ গুণ। লোকে বসুগণ, পুরুষে সুখ। লোকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, পুরুষে কান্তি। লোকে মরুৎ, পুরুষে উৎসাহ। লোকে বিশ্বদেবগণ, পুরুষে ইন্দ্রিয়বিষয়-সমূহ। লোকে তম, পুরুষে মোহ। লোকে জ্যোতি, পুরুষে জ্ঞান। লোকে সৃষ্টি, পুরুষের গর্ভে গমন। লোকে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, পুরুষে বাল্য যৌবন প্রৌঢ় বার্দ্ধক্য। লোকে যুগান্ত, পুরুষে মৃত্যু। এই প্রকারে লোকের ও পুরুষের অপরাপর অবয়ব বিশেষের সমতুল্যতা বুঝিবে।

অগ্নিবেশ কহিলেন,—বুঝিলাম, এই নিখিল বিশ্বের আদি কারণ পরম ব্রহ্মই আমাদের প্রতি ঘটে তাঁহার সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য লইয়া ব্যক্তরূপসমন্বিত হইয়াছেন। তাঁহাকে জানিতে পারিলে আমাদের জানার আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না। আচার্য্যদেব, যিনি আমাদের প্রতি-প্রত্যেকের ভিতর আমরা হইয়া দেদীপ্যমান, সেই যে পরমব্রহ্ম, আমাদের পরমপ্রেমময় পিতা—পুত্রত্বের অলঙ্ঘ্য দাবী লইয়াও আমরা তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারিতেছি না কেন? আমাদের অন্তরের ঐকান্তিক ব্যাকুলতা সেই কারুণ্য স্বরূপকে কি স্পর্শ করিতে পারিতেছে না?

আচার্য্য পুনর্ব্বসু কহিলেন,—বৎসগণ, তোমাদের অন্তরে যে ব্যাকুলতা ও তৃষ্ণার অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহা জানি; পরম করুণাময় সেই কারুণ্যস্বরূপের চিদানন্দময় সিংহাসন যে টলিয়াছে, তাহাও জানি। সকল জানার পারে গমন করিয়া তোমরা তাঁহারই সিংহাসন-তলে অমৃত-স্থিতি লাভ করিবে, আমি বলিতেছি, তোমরা ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস কর। হৃদয়ে ইহা জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিয়া রাখ যে, তোমাদের ইষ্টপ্রাণতা তোমাদের সকল অভীষ্ট ফল প্রদান করিবে।

অগ্নিবেশ বলিলেন,—আমাদের প্রতি ঘটে যে মহা-আমি বিরাজিত, তাহার প্রগতিশীলতা একান্তরূপে নির্ভরশীল আমাদের এই স্থূল দেহ যন্ত্রে। আচার্য্যদেব, আমাদের আয়ু কি নির্দ্দিষ্টকাল পরিমিত?

আচার্য্য পুনর্ব্বসু কহিলেন,—আয়ুর হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা দৈব ও পুরুষকারের উপর নির্ভরশীল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত যে কর্ম্ম তাহা দৈব এবং ইহ জন্মে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহার নাম পুরুষকার। পুরুষকার অর্থ 'পুরুষের করা'। কিন্তু এই করার রকম আছে। ইষ্টোন্মাদনার ভিতর দিয়া যে করা সম্পাদিত হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠতম। এই শ্রেষ্ঠতম করাকে অবলম্বন করিয়া চলিলে দৈব সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া বহুলাংশে খণ্ডিত হয়। তাহা যদি না হইত, তবে মহর্ষিগণ তপস্যা দ্বারা যথেষ্ট আয়ু লাভ করিতে পারিতেন না। কিন্তু যুগবিশেষে কালের যে প্রভাব মানবমণ্ডলীর উপর নিপতিত হয়,

তাহাও অবিবেচনার বিষয় নহে। সত্য যুগে মানব অতি বিমল ও তেজস্বী হইয়া থাকেন। তাহাদের শরীর পর্ব্বতবৎ সংহত ও দৃঢ় হয়, তাহাদের প্রভাব অতি বিপুল হয়, তাহারা স্বভাবতঃই দীর্ঘায়ু লাভ করেন। ইহা কাল প্রভাব। ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির অনুবর্ত্তনে মানবে যে ক্রমহ্রস্বীকৃত শক্তি, সামর্থ্য ও আয়ু দেখা দিয়া থাকে, তাহাও কালপ্রভাব। এই কাল-প্রভাবকে অতিক্রম করিবার উপায় নাই; কিন্তু ইষ্টচেতনার ভিতর দিয়া উহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে।

অগ্নিবেশ কহিলেন,—কল্য আমরা জন্মভূমি সন্দর্শনে গমন করিব। আপনার মঙ্গল দৃষ্টি আমাদিগকে সর্ব্বদাই অনুসরণ করিবে, জানি। তথাপি আমাদের আচরণ কি প্রকার হওয়া উচিত, তৎসম্পর্কে আপনার উপদেশ প্রার্থনা করিতেছি।

আচার্য্য পুনর্ব্বসু কহিলেন,—বৎসগণ, সকল সময়ে পুত্রের ন্যায়, দাসের ন্যায় ও অর্থীর ন্যায় ইষ্টের অনুগত হইয়া থাকিবে। অনুৎসুক, অবহিত, অনন্যমনা, বিনীত ও অনসূয়ক হইয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করিবে। তোমরা যদি ইহ কালে জীবন, যশ ও বৃদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে সর্ব্বপ্রযত্নে আপ্রাণ হইয়া পারিপার্শ্বিকের সুখ-সম্পাদনে চেষ্টা করিবে। সর্ব্বপ্রকার রুগ্ন ও আতুরের আরোগ্য সম্পাদনে যত্নশীল হইবে। প্রতি স্ত্রীলোককে মাতৃবৎ জ্ঞান করিবে, কখনও পরধন অভিলাষ করিবে না। অপরের পাপাচরণের সহায় হইবে না। সত্য, পরিমিত ও পুষ্টিপ্রদ বাক্য কহিবে। দেশ ও কাল বিচার করিয়া চলিবে। আতুরালয়ে গমন কালে উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিবে এবং আতুর সম্পর্কিত গুহ্য বিষয় কখনও বাহিরে প্রকাশ করিবে না। যাহা বলিলে বিপত্তির কোন আশঙ্কা নাই, বরঞ্চ আতুরের ধৈর্য্য ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়, তাহা বলিবে। কখনও আত্মশ্লাঘা করিবে না। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের পার নাই। আপ্তব্যক্তিও চিকিৎসা-বিষয়ে আত্মশ্লাঘা করিতে পারেন না। উপদেশ গ্রহণ

করিবে। যাহারা বুদ্ধিমান্ তাহারা সকলকেই আচার্য্য ভাবিয়া তাহাদের নিকট সদ্বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করেন। চিকিৎসকের সহিত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের আলোচনা করিবে। সমশাস্ত্র-ব্যবসায়িদের পরস্পর শাস্ত্রবিষয়ক বাদ-প্রতিবাদ ও আলোচনা দ্বারা তাহাদের তৎশাস্ত্রে জ্ঞান হয়, পাণ্ডিত্য জন্মে, বচনশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সূক্ষ্ম বোধশক্তির উন্মেষ হয়। অধিকন্তু, অধ্যয়নকালে শ্রুত অর্থে যদি কোন সন্দেহ থাকে, তবে পুনঃশ্রবণে সে সন্দেহ নিরাকৃত হয়; আর যদি কোন সন্দেহ না থাকে, তাহা হইলে তৎবিষয়ে অধিকতর দৃঢ়তা জন্মে।

বৎসগণ, আয়ুর্ব্বেদ সকল বেদ বা জানার গোড়া। কেননা, আয়ুতত্ত্ব বা কালতত্ত্ব জানিতে পারিলে সকল তত্ত্ব স্বতঃ-অধিগম্য হয়। কিন্তু এই আয়ুর জ্ঞান বা কালের জ্ঞান ইষ্টকৃপা ব্যতীত সম্যক্‌রূপে অভিলব্ধ হয় না—ইহা তোমাদিগকে বহু বার বলিয়াছি। অতএব চিন্তায়, বাক্যে, চলনে, পাঠাভ্যাসে, চিকিৎসা-ব্যপদেশে অনুক্ষণ ব্যাপিয়া তোমরা ইষ্টপ্রাণময় হইয়া থাকিবে।*

---

* শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত চরক-সংহিতার বঙ্গানুবাদ অবলম্বনে।

আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব ও বৈশিষ্ট্য

(১)

ভারতে চারিটি চিকিৎসা-প্রণালী প্রচলিত—আয়ুর্ব্বেদ, এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী ও ইউনানী। ইউনানী ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু বাংলা দেশে তাহা বিশেষ প্রচলিত নহে। আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং সকল প্রকার চিকিৎসা-শাস্ত্রের জন্মদাতা। সুশ্রুত বলেন, আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ব বেদের উপাঙ্গ বা উপাধি। চরণব্যূহ বলেন, আয়ুর্ব্বেদ, ঋগ্বেদের উপবেদ। আবার অন্যত্র প্রজাপতি ব্রহ্মা, ঋক্-যজু-সাম ও অথর্ব্ব বেদের তত্ত্বে অধিগমন করিয়া আয়ুর্ব্বেদ রচনা করিয়াছিলেন, এইরূপ উক্তিও আছে। মোটামুটি রকমে আয়ুর্ব্বেদ সকল বেদেরই সার সঙ্কলন। সুতরাং ভারত-ভূমিতে আয়ুর্ব্বেদের বীজ কোন্ সময়ে উপ্ত হইয়াছিল, তাহা জানিতে হইলে বেদের বয়স নির্দ্ধারণ করিতে হয়। বেদ কত কালের? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কাহারও কাহারও মতে খৃষ্ট জন্মের ১৫০০ হইতে ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদ সঙ্কলিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ গ্রহ-নক্ষত্রের যোগাযোগ দর্শনে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, খৃষ্ট জন্মের ১৫০০ হইতে ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরেই ভারতীয় সভ্যতা ক্রমে পরিম্লান হইতে আরম্ভ করে। এদেশের পণ্ডিতগণের মতে খৃষ্ট জন্মের ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদ সঙ্কলিত হইয়াছিল এবং আয়ুর্ব্বেদ সেই সময়েরই বৈদিক সভ্যতার অক্ষয় কীর্ত্তি।

হিপক্রেটিস এলোপ্যাথী চিকিৎসার জনক বলিয়া খ্যাত। কিন্তু ইতিহাসের ঘোষণা এই যে, হিপক্রেটিস, পাইথাগোরাস, এরিষ্টটল প্রভৃতি গ্রীক পণ্ডিতগণ মিশরীয়দের নিকট চিকিৎসা ও বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং মিশরীয়গণ প্রাচ্যদেশবাসী কোন অত্যাশ্চর্য্য জাতির নিকট হইতে এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই অত্যাশ্চর্য্য জাতি যে ভারতের হিন্দু জাতি,

তাহা "Commentary on the Hindu system of medicine" নামক গ্রন্থে বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ ডাঃ ওয়াইজ স্বীকার করিয়াছেন। ইহা একটী ঐতিহাসিক সত্যও যে, সুপ্রাচীন হিন্দু জাতি তাহাদের কৃষ্টি ও বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া বহুদূরবর্ত্তী দেশেও গমনাগমন করিতেন। তাহাতে এরূপ অনুমান সুসঙ্গত ও সুশোভন হয় যে, হিন্দুগণ তাহাদের সভ্যতার বাণী লইয়া মিশরদেশেও গমন করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সকল সভ্যদেশেই চিকিৎসা-তত্ত্ব ও চিকিৎসা-পদ্ধতি আয়ুর্ব্বেদের অনুগামী ছিল। ইউরোপে যাহাকে মধ্যযুগ বলে, সেই মধ্যযুগের অবসানে বিজ্ঞান-সাহিত্য-শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালীর পরিবর্ত্তন ঘটে এবং পরে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে প্রাচীনত্বের স্পর্শকে একেবারে দূরীভূত করেন। জড়বিজ্ঞানের তৎকালীন ক্রম-বিকাশই যে বর্ত্তমান যুগের জড়বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির কারণ, তাহা স্বীকার্য্য; কিন্তু জড়বিজ্ঞানের পশ্চাতে যে সূক্ষ্ম-বিজ্ঞানের অস্তিত্ব রহিয়াছে, যাহা জড়বিজ্ঞানের পরিচালক, তাহা অস্বীকার করিবার বিষয় নহে। বিষয় বা বস্তু মাত্রেরই যে কারণ আছে, যে কারণ-তত্ত্বের অনুশীলনে বিষয় বা বস্তুর প্রকৃত ধর্ম্ম জানিতে পারা যায়, তাহা ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমাভ্যুদয়ের সহিত একেবারে বিলীন হইয়া যায়। "The best physician is also a philosopher"—ডাঃ গেলেনের এই অমর-বাক্যের সার্থকতাও অবলুপ্ত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ বলেন—দেহ, মন ও আত্মার পারস্পরিক সংযোগের ফলরূপেই আমাদের সচেতন ও সক্রিয় দেহ লাভ হয়। আয়ুর্ব্বেদের ভিত্তি জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার চিকিৎসার বিষয়ও জীবন বা আয়ু। বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, বস্তুজগতের পশ্চাতে একমাত্র শক্তিই বিরাজমান। আয়ুর্ব্বেদ বলেন, এই শক্তিই

প্রকৃতির কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ-যোগে দেহরূপে প্রপঞ্চিত, ইন্দ্রিয়ে পরিণত ও জীবকোষের বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া যান্ত্রিক ভাবাপন্ন হয় এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অবস্থাও তাহাতে সংস্থিত হইয়া আসে। জীবন-স্পন্দিত এই দেহ যখনই তাহার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে, তখনই পারিপার্শ্বিক অবস্থার দোষ তাহাকে আশ্রয় করে। এই জন্যই আয়ুর্ব্বেদ রোগজীবাণুকে রোগের গৌণ কারণ বলেন। জীবাণু মাত্রই রোগ উৎপাদনের পূর্ব্বে পারিপার্শ্বিকের ভিতর গুপ্ত ভাবে অবস্থান করিয়া সুযোগের অপেক্ষা করে। সুযোগ না পাইলে ঐ জীবাণু কোন রোগ জন্মাইতে পারে না। আধুনিক জীবাণু-তত্ত্ববিদ্‌গণেরও মত ঐরূপ। মোট কথা, আয়ুর্ব্বেদের মতে জীবাত্মাই দেহ-নিয়ন্ত্রণের একমাত্র অধিনায়ক এবং জীবনীশক্তির মূল উৎস। এই অন্ধ জড়বাদের যুগে আয়ুর্ব্বেদের এই আত্মতত্ত্বটিকে মহাত্মা হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথীর মূলতত্ত্বরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদের চেতনা ধাতুই হোমিওপ্যাথীর 'ভাইটাল ফোর্স' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে।

চরক বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানবুদ্ধি-প্রদীপেন যো নাবিশতিতত্ত্ববিৎ।
আতুরস্যান্তরাত্মানং ন স রোগাংশ্চিকিৎসতি॥"

—যে চিকিৎসক জ্ঞান-বুদ্ধির প্রদীপ দ্বারা রোগীর অন্তঃশরীরে প্রবেশ করিতে না পারেন, তিনি রোগের যথাযথ চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইবেন না।

(২)

প্রাচীনত্বের উপর আমাদের সকলেরই একটি আকর্ষণ আছে। তাহার কারণ এই যে, প্রাচীনত্বের গর্ভ হইতেই ক্রম-বিকাশের ধারাকে অবলম্বন করিয়া আমরা উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়াছি! এক্ষণে যাহা বর্ত্তমান বা নূতন, তাহাও প্রাচীন হইলে প্রাচীনত্বের সম্ভ্রম লাভ করিবে। বর্ত্তমানের ক্রমাভিব্যক্তি যখন ভবিষ্যৎ, তখন প্রাচীনত্বের প্রতি আমাদের একটা আসক্তি বা শ্রদ্ধা থাকাই

স্বাভাবিক। অবশ্য যাহা-কিছু প্রাচীন, তাহা শ্রেষ্ঠ নাও হইতে পারে, হয়ও না। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের কষ্টিপাথরে যদি প্রাচীনত্বকে যাচাই করিয়া লওয়া যায় এবং তাহার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে দেখা যায়, তাহা হইলে তাহার প্রতি আমাদের অনুরাগ ক্রমবর্দ্ধনশীল হইয়া উঠে এবং তাহার প্রতি আমাদের একটি কর্ত্তব্য-জ্ঞানেরও সঞ্চার হয়। আয়ুর্ব্বেদ এমনি জাতীয় একটি প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-বিজ্ঞান।

চরক বলেন, ব্যাধি প্রপীড়িত মানব যাহাতে ব্যাধি-মুক্ত হইতে পারে, তজ্জন্য ভারতের ঋষিগণ হিমালয়ের পাদদেশে এক সম্মিলনীতে মিলিত হইলেন এবং ভরদ্বাজ মুনিকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবার জন্য সুরলোকে ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন। সুশ্রুত বলেন, দেব-চিকিৎসক ধন্বন্তরী দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষাকরিয়া তাঁহার আদেশে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন এবং সুশ্রুতাদি আট জন ঋষিকে এই শাস্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া নরলোকে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করিয়া যান। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, নারায়ণ যখন মৎস্য অবতার হইয়া বেদের পুনরুদ্ধার করেন, অনন্তদেব তখন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রাপ্ত হন। পুরাণে আছে, দেবতা ও দৈত্য মিলিত হইয়া অমৃত লাভের জন্য যখন ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করেন, তখন ধন্বন্তরী সমুদ্র গর্ভ হইতে উদ্ভূত হন এবং তিনিই মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রচার করেন।

আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থের এই যে বিভিন্ন প্রকার উক্তি, তাহা আমাদিগকে ইহাই স্মরণ করাইয়া দেয় যে, অনাদি কাল হইতে যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহাকেই ঈশ্বরোদ্ভূত বলিয়া কল্পনা করার একটা ঝোঁক প্রাচীনকালে সকল দেশেই বর্ত্তমান ছিল। গ্রীক্‌দিগের চিকিৎসা-শাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা যেমন এপোলো (Apollo) এবং মিশরবাসীদিগের থিওঠ (Thyoth), প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তাও সেইরূপ দেবরাজ ইন্দ্র, নারায়ণ প্রভৃতি।

আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিলে বৈদিক ঋষিগণকেই আমরা আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের স্রষ্টা ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের রচয়িতা বলিয়া জানিতে পারি। ঋষি বা দ্রষ্টাপুরুষ তাঁহারাই, যাঁহারা ক্রমলব্ধ সূক্ষ্ম-বোধশক্তির বলে বস্তুজগতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার ভিতর কি দিয়া কিরূপে কি হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করেন। এলোপ্যাথী চিকিৎসায় কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া বাকী অংশ প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া দেন এবং বলেন যে, প্রকৃতিকে সাহায্য করাই চিকিৎসার উদ্দেশ্য। কিন্তু ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, প্রকৃতি দোষাকর, প্রকৃতিকে সর্ব্বদা জীবের আত্ম-অধিকারে রাখা প্রয়োজন; আত্মাধিকৃত প্রকৃতি হইতেই জীবের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। এই কারণে তাঁহারা ইহা অতি সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, চিকিৎসায় জীবই লক্ষ্য। আয়ুর্ব্বেদের মূলসূত্রে বা ত্রিসূত্রে যে জ্ঞান ঝলমল করিতেছে, তাহাকে বোধ করিবার মত এবং কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার মত সুচিকিৎসক বর্ত্তমানে দুর্লভ হইতে পারেন, কিন্তু দেশীয় চিকিৎসায় কোন্ মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে ঋষিগণ যে নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাকে আমাদের কার্য্যে প্রতিফলিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা উচিত।

একটি প্রতিমা গঠন করিতে হইলে যেমন ইচ্ছামাত্রই তাহা গঠন করা যায় না, সেইরূপ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ও ঋষিবিশেষের ইচ্ছামাত্রই রচিত হইয়া যায় নাই। আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুগে যুগে ঋষিগণকর্ত্তৃক মানবের ব্যাধির উপশম ও নিরাকরণের জন্য বিবিধ উপায় ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত এবং তাঁহাদের ক্রম-বহুদর্শিতার ফলে ঐগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপায়গুলি গৃহীত ও নিকৃষ্ট উপায়গুলি বর্জ্জিত হইয়া এবং গুরু-শিষ্যানুক্রমিকতায় আরও পরিপুষ্ট হইয়া যে শাস্ত্র অখণ্ড সত্যের উপর বিরচিত হইয়াছে, তাহাই আয়ুর্ব্বেদ। কোন একটি বিশেষ যুগ পর্য্যন্ত যে সকল আবিষ্কার বা উন্নতি হইয়াছে, তাহাই আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্গত, তাহার পর তাহার আর উন্নতি

হইতে পারে না, আমরা এই মত পোষণ করি না, আয়ুর্ব্বেদও পোষণ করিতে বলেন না। চরক-সুশ্রুতের যুগে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অনেক ঔষধ ও প্রণালী রসরত্নাকর, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতির যুগে প্রবর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে চরকে যে একটি মূল্যবান উপদেশ আছে, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, "আয়ুর্ব্বেদের শেষ নাই। অতএব অপ্রমত্ত হইয়া ইহাতে অভিনিবেশ করিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সকলকেই গুরু মনে করেন, কিন্তু অবুদ্ধিমান্ সকলকেই শত্রু ভাবেন। ইহা বুঝিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ধনকর, আয়ুস্কর ও লোকহিতকর উপদেশ বাক্য অপরের নিকটও শুনিবেন এবং তাহার অনুসরণ করিবেন।" বলাবাহুল্য যে, ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের মূলনীতি যাহা অভ্রান্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

আয়ুর্ব্বেদ নিম্নোক্ত আটটি বিভাগে বিভক্ত ছিল এবং করিলে এখনও হয়, যথা—(১) শল্যতন্ত্র—Surgery (২) শালক্যতন্ত্র—Works on diseases of eye, ear and throat. (৩) কায়চিকিৎসা—Practice of medicine (৪) ভূতবিদ্যা—Mental disease. (৫) কৌমারভৃত্য—Children's disease (৬) অগদতন্ত্র—Toxicology (৭) রসায়ন—Methods of gaining health and longevity (৮) বাজীকরণ—Sexual invigoration.

রসায়ন ও বাজীকরণ অপর কোন চিকিৎসা-শাস্ত্রে এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা আয়ুর্ব্বেদের গৌরবময় কীর্ত্তি। সম্প্রতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের চেষ্টায় কায়কল্প চিকিৎসার যে প্রয়োগ ও পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহা বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয় গ্রন্থ বর্ণিত ১০ অধ্যায়ের ২৮-৩২ শ্লোক অনুসারে করা হইয়াছে। পরীক্ষক তপস্বীবাবা তাহার জীবনে উহার অতি আশ্চর্য্য ফল দেখাইয়াছেন।

(৩)

যে মহান্ আদর্শকে গ্রহণ করিয়া এবং যাঁহার জ্ঞানগর্ভ অমৃতবাণীকে অখণ্ড ভারতে রূপায়িত করিয়া অশোক ধর্ম্মাশোক পদবী লাভ করিয়াছিলেন,

সেই বুদ্ধদেবের শুভ আবির্ভাব হয়, খৃষ্ট জন্মের ৫৬৭ বৎসর পূর্ব্বে। তাহারও পূর্ব্বে ভারতের শাসন ব্যাপারে কুরু ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণের পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা স্মরণ করাইয়া দেয়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, দুর্য্যোধনের অবিবেচনা ও হঠকারিতা, যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রাণতা এবং যে মহাশক্তি নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া সৃষ্টি পরিচালনা করিতেছে, তাহারই ঘনীভূত প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণের কথা। বৈদিক যুগ তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সেই যুগেই আরম্ভ হইয়াছিল, আয়ুস্তত্ত্বের অনুশীলন যাহার ফলে জন্মিয়াছিল, আয়ুর্ব্বেদ।

দৃঢ়বল, নাগার্জ্জুন, বাগ্‌ভট, মাধবকর, বৃন্দ, চক্রপাণি প্রভৃতি যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া আয়ুর্জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থে খনিজ-দ্রব্যের ব্যবহার নিতান্তই কম। বৈদিক যুগের পর তান্ত্রিক যুগে পারদ ও নানা প্রকার ধাতু, উপধাতু যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। সোমদেব, গোবিন্দ, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি পারদের বিশেষ রোগনাশক শক্তি দেখিয়া বিবিধ রসতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। নাগার্জ্জুনকে আধুনিক যুগের লেভয়সিয়ার (Lavoisier) বলিয়া অভিহিত করা যায়। ভাবমিশ্র প্রণীত ভাব-প্রকাশে ফিরঙ্গ-রোগের (Syphilis) এবং অনেক প্রকার আরবীয় নাম-সংযুক্ত দ্রব্যের উল্লেখ আছে। পর্ত্তুগীজগণ ঐ রোগ এদেশে লইয়া আসেন বলিয়া কথিত আছে। ভাবমিশ্র ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে কান্যকুব্জে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বৈদিক-যুগে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি হইলেও তৎকালপর্য্যন্তও মৌলিক গবেষণা-দ্বারা আয়ুর্ব্বেদকে পরিপুষ্ট করিতে দুই এক জন করিয়া আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য এদেশে জন্মাইতেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইলেও এলোপ্যাথীর প্রসার তাহার বহু পরে হইয়াছে এবং যাহা হইয়াছে, তাহাও আয়ুর্ব্বেদের তুলনায় খুব বেশী নহে। এলোপ্যাথীর এই প্রসারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদই (সামান্য অংশে ইউনানী) আমাদের একমাত্র চিকিৎসা-পদ্ধতি ছিল। এলোপ্যাথীর উপর কটাক্ষপাত করা

আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যে বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্র (Chemistry) এলোপ্যাথীকে জয়যাত্রার পথে পরিচালিত করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহার সহিত পরিচিত না হইলে আমরা আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পাইতাম কি না সন্দেহ।

পূর্ব্ববর্ত্তীকে অধিকার করিয়া পরবর্ত্তীর আবির্ভাব। চতুর্ব্বেদ অধিকার করিয়া চরক ও সুশ্রুত এবং চরক ও সুশ্রুতকে অধিকার করিয়া ক্রমপর্য্যায়ে অপরাপর গ্রন্থ। শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার জাতির জীবনীশক্তির বলিষ্ঠতার পরিচায়ক। ঔষধ-শিল্প এদেশে এখনও সুপ্রতিষ্ঠিতরূপে গড়িয়া উঠে নাই। যদি কোনও দিন গড়িয়া উঠে, তবে তাহা আমাদিগকে যে অর্থ ও মর্য্যাদা প্রদান করিবে, তাহা একমাত্র আমাদেরই প্রতিভা-লব্ধ হইবে না। আয়ুর্ব্বেদ ব্যতীত প্রাচীন আর্য্যসংস্কৃতির এরূপ কোন জীবন্ত-অবদান আমাদের আর কিছু আছে কি, যাহা লইয়া আমরা পৃথিবীর হাটে উপনীত হইতে পারি, অর্থ আহরণ করিতে পারি, দেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারি ?

আয়ুর্ব্বেদকার পঞ্চভূতকে পদার্থের মূল উপাদান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গ্রীক পণ্ডিত এরিষ্টটল পদার্থের মূল উপাদান ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ—এই চারিটি স্বীকার করিয়াছেন। ব্যোম বা ঈথরের (Æther) অস্তিত্ব তিনি বুঝিতে পারেন নাই। এরিষ্টটলের মতবাদের পর আর একটি মতবাদের উদ্ভব হয়। উক্ত মতে পারদ, গন্ধক এবং লবণ পদার্থের মূল উপাদান বলিয়া ব্যক্ত হয়। তারপর রবার্ট বয়ল (Robert Boyle) প্রচার করিলেন, ফ্লজিষ্টনবাদের কথা (Theory of phlogiston)। উহাকে পাল্টাইয়া কালক্রমে আরও নূতন মতের উদ্ভব হইল। সর্ব্বশেষে জন্ ডল্টন (John Dalton) পরমাণুর কথা ঘোষণা করিলেন। বর্ত্তমানে এই পরমাণুকেও বিভাজিত করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগৎ কি অমানুষিক অধ্যবসায়ের সহিত সত্যকে উদ্ঘাটন করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

আয়ুর্ব্বেদকার যে পঞ্চতত্ত্বের কথা ঘোষণা করিয়াছেন, তদ্বিষয় চিন্তা করিলে

আরও বেশী বিস্ময় বোধ হয়। আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিকগণ যন্ত্রশক্তি দ্বারা পরমাণুকে বিশ্লেষণ করিয়া যে শক্তির (energy) অস্তিত্ব পাইয়াছেন, সেই শক্তির অন্তরালে কি কি বস্তু নিহিত আছে, তাহারা তাহা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, গভীরতরতর আবিষ্কার করিতে হইলে সূক্ষ্মতর যন্ত্রের প্রয়োজন অথবা আমাদের বোধেন্দ্রিয়গুলিকে আরও সূক্ষ্মতররূপে গঠন করা প্রয়োজন। আমাদের বোধেন্দ্রিয়গুলির যে শক্তি আছে বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি, সেই শক্তির পশ্চাতে তদপেক্ষা অধিক শক্তি প্রসুপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদকার সেই শক্তিকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আর্য্য-ঋষিগণ এবং আধুনিক কালেও যে সমস্ত ঋষি জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা কখনও কোন এক স্থানবিশেষে শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, এরূপ বলেন নাই বা বলেন না। যিনি যাহার বোধেন্দ্রিয়কে যতখানি সূক্ষ্মতররূপে গঠন করিতে পারিয়াছেন, তিনি ততখানি অধিক শক্তির অস্তিত্ব বোধ করিয়াছেন এবং তাহার কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিকগণ যদি তাঁহাদের যন্ত্রশক্তিকে বা বোধেন্দ্রিয় শক্তিকে আরও সূক্ষ্মতররূপে গড়িয়া তুলিতে পারেন, তবে তাঁহারাও আয়ুর্ব্বেদকার বর্ণিত ও অমৃত সত্যে সমাহিত পঞ্চতত্ত্বের অবস্থায় যাইয়া উপনীত হইতে পারিবেন।

(৪)

ইহা সুযুক্তির সহিত প্রমাণিত হইয়াছে যে, আয়ুর্ব্বেদ সকল প্রকার চিকিৎসা-শাস্ত্রের মধ্যে প্রাচীনতম। কিন্তু তাহার প্রাচীনতার গাত্রে যুগে যুগে যে সমস্ত নির্দ্দয় পীড়ন সংঘটিত হইয়াছে, তাহা স্মৃতিপথে উদিত হইলে অপরিসীম দুঃখ হয়। মহামতি অশোকের রাজ্য-শাসন যে মঙ্গল বর্ষণ করিয়াছিল, তাহারই ফলে আয়ুর্ব্বেদের গৌরবের দ্বিতীয় অধ্যায় রচিত হইয়াছিল। তাহার পরবর্ত্তী কালের ধ্বংসলীলা ও জ্ঞানধর্ষকর প্রভাব ডিঙ্গাইয়া আয়ুর্ব্বেদ যে বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতেও প্রাণ-স্পন্দন লইয়া দণ্ডায়মান আছে এবং এক

মহাবিকাশের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে, আমরা বলিব, ইহা তাহার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য-শক্তিরই পরিচায়ক।

চিকিৎসা-শাস্ত্রের সহিত রসায়ন-শাস্ত্রের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিবার প্রয়াস এবং জরামরণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য অমৃত লাভের (elixir of life) অনুসন্ধান—এই উপলক্ষ্য ধরিয়াই ইউরোপের রসায়ন-শাস্ত্র ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। চরকে আত্মতত্ত্বকে অধিগত করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইলেও তাহার চিকিৎসা অধ্যায়ে তৎকালোপযোগী রসায়ন-জ্ঞানের (chemical knowledge) পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। অথর্ব্ব-বেদকে ভিত্তি করিয়া আমরা যতই অগ্রবর্ত্তী হই, ততই আমরা রসায়ন-জ্ঞানের পরিপুষ্টি দেখিতে পাই। অথর্ব্ব-বেদের ভৈষজ্যানি ও আয়ুষ্যানি অধ্যায়ে অশ্বত্থ, খদির, হরিদ্রা, অপমার্গ, মুঞ্জ, শমী প্রভৃতি ভেষজ এবং স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুর বাহ্য ধারণ উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তাহাদেরই আন্ত-প্রয়োগের উপযোগিতা সাধনের জন্য বহুবিধ প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং উহাদের সেবনের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। ইউরোপের রসায়ন জগতে লেভয়িসিয়ারের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে পারসেল্সাস্ (Parcelsus) ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী রসায়নবিদ্ (chemist)। পারদ প্রভৃতি ধাতুর আন্ত-প্রয়োগ-বিধির আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া পারসেল্সাসের প্রসিদ্ধি আছে। পারসেল্সাস্ পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। তাহার কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বেই ভারতে পারদ হইতে কজ্জলী (Black sulphide of mercury) প্রস্তুত করার রীতি, তির্য্যক্পাতন (distillation), অধঃপাতন, ঊর্দ্ধপাতন (sublimation) এবং ধাতুর শোধন ও জারণ-মারণাদির পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। রসকর্পূর (Mercurious chloride), স্বর্ণসিন্দূর, রসসিন্দূর, মকরধ্বজ, ষড়্গুণ ও সিদ্ধ মকরধ্বজ (Resublimed mercuric sulphide) ইত্যাদি আয়ুর্ব্বেদের অমূল্য ঔষধাবলী এবং বিবিধপ্রকার যৌগিক (compound) তৎকালেরই আবিষ্কার। সেই কাল বৌদ্ধ যুগের গৌরবে মুখরিত। তৎকালীন ভারতীয় রসায়ন

জগতে নাগার্জ্জুন ছিলেন সার্ব্বভৌম নরপতি। নাগার্জ্জুনের আবির্ভাব হয়, দ্বিতীয় শতাব্দীতে। নাগার্জ্জুন একাধারে ধর্ম্মবেত্তা ও অদ্বিতীয় রসায়নবিদ্ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। অত্রিনন্দন পুনর্ব্বসু যেরূপ আয়ুর্ব্বেদের আদি যুগে আয়ুর্জ্ঞানের সহস্র রশ্মিচ্ছটায় প্রকাশিত, মধ্যযুগে তেমনি নাগার্জ্জুন অদ্বিতীয় রসায়নজ্ঞানের সহস্রদলকমলরূপে প্রতিভাত।

আধুনিক কালে ইউরোপ রসায়ন-শাস্ত্রের অপূর্ব্ব উন্নতি সাধন করিয়া বর্ত্তমান জগতকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। ডল্টনের পরমাণুবাদ হইতেই তাহার জয়যাত্রার সুরু। একক্ষণে অতি-পরমাণু (electron), প্রোটন (protone), রঞ্জন-রশ্মি (X-ray), ক্যাথোড-রশ্মি (Cathode rays), বেকেরেল রশ্মি (becqueral rays), ইউরেনিয়াম (uranium), পলোনিয়াম (pollonium), রেডিয়াম (radium), হিলিয়াম (helium) প্রভৃতির আবিষ্কারে রসায়ন জগৎ সরগরম। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, রেডিয়াম পরমাণুর ভাঙ্গন হইতে এত শক্তি উদ্ভূত হয় যে, একটি সরিষা প্রমাণ রেডিয়ামের সাহায্যে একটি রেলগাড়ী এক হাজার বৎসর পর্য্যন্ত চালান যাইতে পারে।

ইন্দ্রিয়ের ধরা ও ছোঁয়ার বাহিরে যে সকল পরমাণু, অতিপরমাণু এবং রেডিয়াম প্রভৃতি ধাতু অবস্থিতি করিতেছে, মূলতঃ ঐগুলি সর্ব্বব্যাপী ঈথরের স্পন্দন-প্রবাহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৈজ্ঞানিকগণ এপর্য্যন্ত ঈথর-তরঙ্গের যে কল্পনা করিয়া আসিতেছিলেন, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাহা তড়িদ্বীক্ষণ যন্ত্র (galvanometer) দ্বারা প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন। ভাগীরথীর উৎসের অন্বেষণ করিতে গেলে যেরূপ হিমাচলের পাদনিঃস্রাবের সহস্র ধারার সাক্ষাৎ লাভ হয়, সেইরূপ আচার্য্য জগদীশচন্দ্র জীবনীশক্তির মূল উৎসের অনুসন্ধানে সর্ব্বব্যাপ্ত ঈথরের সন্ধান পাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, জীবনীশক্তি বলিয়া বস্তুর কোন পৃথক পদার্থ নাই, বিধাতার শক্তি-ভাণ্ডারের কিঞ্চিৎ শক্তি বাহিরের শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে দেহে আণবিক বিকৃতি জন্মাইয়া যে রাসায়নিক ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহাই দেহের জীবনীশক্তি।

বেদে আছে, প্রাণ বা শক্তির কম্পনেই সৃষ্টির আরম্ভ; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রাণময়, শক্তিময়।

আয়ুর্বেদ বলেন, ভূম্যাদি পঞ্চভূত ও চেতনার সমবায়ে পুরুষ। ভূম্যাদি, যথা—ভূমি, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ। ভৌম পরমাণু কঠিন ও কর্কশ। ভূমি ভৌম পরমাণু দ্বারা গঠিত। জলীয় পরমাণু শীতল, তরল ও অধোগমনশীল। তেজস পরমাণু রূপ ও তাপসংযুক্ত, উদ্ধগমনশীল এবং বায়ুকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। বায়বীয় পরমাণু গতিশীল ও চঞ্চল। আকাশীয় পরমাণু শূন্য বা অবকাশময়। যে ঈথরকে যন্ত্র-সহায়তায় ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত করা হইয়াছে, তাহার আরও আরও সহস্র গুণ সূক্ষ্মতর অবস্থায় আয়ুর্বেদের পঞ্চতত্ত্ব। কতখানি সুগভীর আত্মদর্শনের জ্ঞান লইয়া আর্যাঋষি সেই সমষ্টি সত্তার ব্যষ্টিস্বরূপের বিভেদ অনুসারে উহাকে পঞ্চ প্রকরণে বিভাজিত করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় স্বতঃই মস্তক অবনত হয়। এই দর্শনের ভিত্তির উপর যে শাস্ত্রের সৌধ বিনির্ম্মিত, মানবের আত্মবিশ্লেষণে যে শাস্ত্র অমৃত নিঃস্রাব দ্বারা তাহার সকল বিঘ্ন অপসারিত করিয়া দেয়, যে শাস্ত্র অতীন্দ্রিয় লোকের স্পর্শ লইয়া রক্তমাংসমেদমণ্ডিত দেহ-যন্ত্রের সংস্থান বিপর্য্যয়ে রূপময় ও রসময় হইয়া উঠে, সেই শাস্ত্র যদি কালের অত্যাচারকে পরিপাক করিয়া পুনরায় নবারুণের মত স্বতঃপ্রকাশশীল হইয়া উঠিবার লক্ষণ-জাল রচনা না করে, তবে বিবর্ত্তন-নীতি শূন্যগর্ভ বলিয়া প্রমাণিত হইবে। আমাদের আপন আপন সূক্ষ্ম সত্তার অপরূপ কারুকার্য্য যদি ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য মায়ামরীচিকারূপে অবস্থিতি করিয়া আমাদের জ্ঞান-পিপাসাকে শুধু উপহাস করিয়াই চলে, তবে আয়ুর্বেদের পঞ্চতত্ত্ব সোনার পাথর বাটীতেই পরিণত হইবে। কিন্তু সোনার বাটী কি কখনও পাথর বিনির্ম্মিত হয়?—হয় না। অবুত সত্যে যাহা সমাহিত, তাহা কোন-না-কোন দিন আমাদের ইন্দ্রিয়ের অর্গল খুলিয়া আমাদের ধরা-ছোঁয়ার সীমানায় আসিয়া দেখা দিবেই।

আয়ুর্ব্বেদে নবযুগ

(১)

মৃত জাগে না, ঘুমন্তই জাগে। রামায়ণে লিখিত আছে, কুম্ভকর্ণ ছয় মাস ঘুমাইত, ছয় মাস জাগিত। কুম্ভকর্ণের সুপ্তি ও জাগরণ ছিল, মানবীয় সুপ্তি ও জাগরণের চরম। আয়ুর্ব্বেদের অবস্থাও কি তাই? আয়ুর্ব্বেদ বহু কাল ঘুমন্ত ছিল, এবার জাগিবার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে। সুদীর্ঘ কালের সুপ্তিকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে কি তেমন করিয়া জাগিবে, যেমন করিয়া জাগে ভূমিকম্প, জাগে প্রলয়?

বৃটিশ শাসন এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে পৌণে দুই শত বৎসর যাবৎ। বাণিজ্য ও কৃষ্টিকে সম্বল করিয়া লইয়া বৃটনগণ আসিয়াছিলেন এদেশে। ঐ দুইটি বস্তু—বাণিজ্য ও কৃষ্টি স্বয়ংপ্রকাশ। কোরক যেমন করিয়া পুষ্পায়িত হইয়া সৌন্দর্য্য ও সৌরভ বিস্তার করে, ক্ষীণ সূর্য্য যেমন করিয়া গগন ভালে বৃহতে পর্য্যবসিত হয়, তেমন করিয়া আমাদের দেহের ও মনের প্রয়োজন পূরণ করে যে বাণিজ্য ও কৃষ্টি, তাহা ক্রম-বিস্তারে প্রকাশমান হইয়া উঠে। এমন করিয়াই-ত বৃটিশ বাণিজ্য ও বৃটিশ কৃষ্টি আসমুদ্র-হিমাচল ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বৃটিশ শাসনের পূর্ব্বে এদেশের লোকের চিকিৎসা করিতেন কাহারা এবং করা হইত কোন পদ্ধতিতে? তখন এলোপ্যাথীও ছিল না, হোমিওপ্যাথীও ছিল না; ছিল আয়ুর্ব্বেদ এবং ইউনানী। তখন নিশ্চয়ই কবিরাজ এবং হেকিমগণ আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানী পদ্ধতিতেই চিকিৎসা করিতেন। জিজ্ঞাসা করি, মুসলমানগণের আবির্ভাব যখন এদেশে হয় নাই, তখন এদেশের চিকিৎসক ছিলেন কাহারা? নিশ্চয়ই কবিরাজগণ। এক্ষণে আমরা যে এলোপ্যাথী ও হোমিওপ্যাথীকে ছাড়িয়া চলিতে পারি না, এদেশে বৃটিশ-শাসন সংস্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে, আমরা তাহার ব্যবহার পদ্ধতিও লাভ করিতে পারি নাই। প্রাক্-বৃটিশ-যুগে আমরা যে ইউনানীকে ছাড়িয়া চলিতে পারি নাই, প্রাক্-মুসলমান-যুগে আমরা

তাহারও ব্যবহার পদ্ধতি লাভ করিতে পারি নাই। রণক্ষেত্রে সেনাপতির রণকুশলতাই যুদ্ধ পরিচালনা ও জয়ের একমাত্র হেতু হয় না, চিকিৎসকের চিকিৎসা কুশলতারও প্রয়োজন হয়। আমরা বীর ছিলাম, আমরা আততায়ীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতাম, শত বৎসরের প্রাচীন ইতিহাসের পাতা উল্টাইলেও তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ মিলিবে। তাহার অর্থ কি এই নয় যে, আমরা তখন উত্তম চিকিৎসকও ছিলাম ?

বলা যাইতে পারে,—তত্ত্বাংশে অপরিবর্ত্তিত থাকিয়াও আয়ুর্ব্বেদ কালোপযোগিতার অনুকূলে পরিবর্ত্তিত হয় নাই। বলা যাইতে পারে, বিগত এক শত বৎসরে এলোপ্যাথী চিকিৎসায় যে সমস্ত অভিনব আবিষ্কার সাধিত হইয়াছে, তাহার তুলনায় এক হাজার বৎসরেও আয়ুর্ব্বেদে কিছুই হয় নাই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার জেনার (Jenner) বসন্ত রোগের আক্রমণ-নিবারণ-কল্পে গো-বসন্ত-বীজ লইয়া টীকা দিবার প্রথা প্রচার করেন। ডাক্তার পাস্তর (Pasteur) জলাতঙ্ক রোগাক্রান্ত কুকুরের মস্তিষ্ক হইতে উক্ত রোগের জীবাণু গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা-প্রণালী আবিষ্কার করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার লিষ্টার (Lister) শস্ত্রচিকিৎসায় সর্ব্বপ্রথম জীবাণু প্রতিষেধক (antiseptic) ঔষধের ব্যবহার প্রচলন করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে লোফ্লার (Loeffler) ডিপ্থিরিয়া রোগের জীবাণু প্রতিষেধক (diptheria antitoxin) আবিষ্কার করেন। ডাক্তার রঞ্জেন (Rontzen) রঞ্জন রশ্মি আবিষ্কার করিয়া চিকিৎসা জগতে যুগান্তর আনয়ন করেন। বলা যাইতে পারে যে, আয়ুর্ব্বেদের যে মূলসূত্র অখণ্ড সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও যুগের চাহিদা অনুসারে বৈদ্যগণ আয়ুর্ব্বেদকে তেমনই প্রকারে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিতেন, যাহাতে উহা জনসাধারণের অধিকতর কল্যাণজনক হইতে পারিত।

এইরূপ উক্তি অসঙ্গত নহে। কেননা, যখনই যাহা মানব-সমাজে প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে, যখনই যাহার স্তুতিগান স্বতঃ স্ফুরিত হইয়া ধ্বনিত ও

প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, তখনই বুঝিতে হইবে, তাহার সেবাকুশল হস্তের মঙ্গল পরিবেশও অম্লান গতিতে চলিয়াছে মানব সমাজে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যাহা-কিছু আবিষ্কার, তাহা যদি মঙ্গলের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে তাহা অমর হইয়াই থাকিবে।

'জ্ঞান' অর্থ জানা এবং এই জানার ছাপই সংস্কার; আর এই সংস্কার সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া স্ফুরিত না হইলেও ধ্বংস হয় না। যদি না হয়, এবং পূর্ব্ববর্ত্তীর অভিব্যক্তিতেই যদি পরবর্ত্তীর বিকাশ হয়, তবে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের যাহা-কিছু আবিষ্কার, তাহার মূলে আয়ুর্ব্বেদের মহা-অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় কি করিয়া? ষোড়শ শতাব্দীতে সার্ভিটাস (Servetus) ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার (anatomy) আবিষ্কার করিয়া ধন্য হইয়া গেলেন! হার্ভি (Hervey) রক্তের চক্র-ভ্রমণ বৃত্তান্তের আবিষ্কার করিয়া ইতিহাসে স্থান পাইলেন! ইঁহাদের আবিষ্কার এবং আরও যে কত কত আবিষ্কার হইয়াছে, সেই সমুদয় দ্বীপময় সামুদ্রিক জগতের নব রূপায়িত, নব ছন্দায়িত এক একটা দ্বীপের ভাসিয়া উঠার মত নহে কি?

যাহাই হোক, আয়ুর্ব্বেদ জ্ঞানের খনি, আয়ুর্ব্বেদ পৃথিবীর যাবতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের জন্মদাতা, ইহা গাহিয়া বেড়াইয়া লাভ নাই, যদি না আমরা উহাকে বাস্তবতায় তেমনি রকমে প্রতিমূর্ত্ত করিতে পারি। তবে ইহা ভাবিয়া আমরা সান্ত্বনা পাইতে পারি যে, যদি বাস্তবিক আয়ুর্ব্বেদ মানব-কল্যাণের স্বর্ণ রাজছত্রই হয়, তবে উহা সহস্রদলকমলের দ্যুতি লইয়া নবারুণের মত একদিন জাগিবেই।

এক্ষণে আমরা ভাবিতেছি ইহাই যে, আয়ুর্ব্বেদ কি সত্যই জাগিতেছে? তাহার জাগিবার লক্ষণ কি আমরা দেখিতেছি? কৃষ্ণসর্পের কুটিল গতির মত, মহামারীর বিস্তারের মত, ঝঞ্ঝার প্রলয়ঙ্কর গতির মত তাহা কি আবার জাগিবে না, তাহার বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হইয়া? পঞ্চাশ বা পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও সাধারণ্যে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের যে চাহিদা ছিল, তাহা কি এক্ষণে বহুগুণে পরিবর্দ্ধিত হয় নাই? সুতরাং আমাদের নিরাশ হইলে চলিবে না

আয়ুর্ব্বেদকে কালোচিত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া সকল বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া অম্লান সাহসে আমরা যদি অগ্রসর হই, আমাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির লক্ষ্যে, তবেই বুঝিব, আমাদের কর্ম্মযোগ আরম্ভ হইয়াছে। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধার সহিত আমাদের জ্ঞান ও প্রতিভার হোমানল জ্বালিয়া বিশ্বাস, আশা ও উদ্যমের সহিত আমরা যদি অগ্রসর হই, আর্য্যকৃষ্টির পরম অবদান আয়ুর্ব্বেদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে বিংশশতাব্দীর বক্ষ মাঝারে সকল বর্ত্তমানতায় তাহাকে সমালঙ্কৃত করিয়া, তবেই বুঝিব, জীবন-সংগ্রামে আমাদের জয়ের অভিযানই চলিয়াছে।

(২)

প্রতি-দ্বাদশ বৎসর অন্তে প্রকৃতির অঙ্গ হইতে বিশ্লিষ্ট অণু-পরমাণু বিচ্ছুরিত হয় এবং নূতনতর উপাদানে তাহার অঙ্গ নবীকৃত হয়—ইহা আধুনিককালের একটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। কাল অনন্ত। দ্বাদশ বৎসর ঐ অনন্ত কালের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। কিন্তু অনন্ত লইয়া ত আমরা গবেষণা করিতে পারি না। সান্তের প্রয়োজন। তাই, বৈজ্ঞানিকের নিকট ধরা পড়িল, দ্বাদশ বৎসরের আন্তিক পরিবর্ত্তন। ১২ × ১২ = ১৪৪ বৎসর পরেও কোন বিশেষ বিষয়ের নবরূপ আমাদের দৃষ্টিগম্য হইতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি দাঁড়াইয়াছে, দ্বাদশ বৎসরকে ভিত্তি করিয়াই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে আধুনিক কালোপযোগিতার অনুকূলে আয়ুর্ব্বেদের প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাংলাদেশে আয়ুর্ব্বেদ ফ্যাকাল্‌টি গঠিত হইয়াছে। ভারতের প্রধান প্রধান নগরে আয়ুর্ব্বেদ সভা সম্মিলনীর অধিবেশনও হইতেছে অর্থাৎ যোগ্য ব্যক্তি যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানও হইতেছে। কৃতবিদ্য অনেক ডাক্তারও আয়ুর্ব্বেদের চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

ভূমিষ্ঠ শিশুর হৃৎস্পন্দনই আর সকলের পূর্ব্বে লক্ষ্য করা হয়। শিশু বড়

হইয়া কোন্ ধারায় গঠিত হইয়া উঠিবে, তাহা তখনকার ভাবনার বিষয় হয় না। আয়ুর্ব্বেদের কল্যাণকামীদের মধ্যে যে নূতন জীবনের স্পন্দন পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা ভবিষ্যতে কি রূপ পরিগ্রহ করিবে, তাহাও এক্ষণে ভাবিবার বিষয় নহে। দানা যদি মিশ্রির হয়, তবে মিশ্রিই গঠিত হইবে।

আয়ুর্ব্বেদের যে অংশ গঠনতন্ত্রগত, তাহা উদার অথচ কঠোর হওয়া বাঞ্ছনীয়। বহুর আকাঙ্ক্ষা যেখানে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে একের প্রতিষ্ঠায়, সেই প্রতিষ্ঠাকে কোনওপ্রকারে ক্ষুণ্ণ না করিয়া বহুর সশ্রদ্ধ অভিমতকে পুষ্টি প্রদান করিয়াই গঠনতন্ত্র রচিত হওয়া উচিত। অনেকে আয়ুর্ব্বেদ-কন্‌ষ্টিটিউশন গঠন করিবার পক্ষপাতী নহেন। বিষয় বা বস্তুর উৎকর্ষে যাহারা আগ্রহান্বিত, তাহারা পূর্ব্বতনের ভাবধারার উপরে দাঁড়াইয়া ও পরিপার্শ্ব হইতে পুষ্টি আহরণ করিয়া যে চিন্তা বিকীরণ করেন, বিষয় বা বস্তুর কন্‌ষ্টিটিউশন তাহারই রূপক প্রতিচ্ছবি ব্যতীত আর কি ?

প্রয়োজন-পূরণকে ভিত্তি করিয়াই হয় নব নব আবিষ্কার। ইউরোপের বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক এবং চিকিৎসা-তত্ত্বের যাহা-কিছু আবিষ্কার, তাহা প্রয়োজন-পূরণকে অবলম্বন করিয়াই সাধিত হইয়াছে। রণবাদ্য বাজিবার যেমনি উপক্রম হইয়াছে, অমনি দেশে সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে; শুধু সৈন্য মহলে নয়, চিকিৎসক মহলেও। ধ্বংসলীলা সমর্থনযোগ্য নহে, কিন্তু ধ্বংসলীলায় শান্তির প্রলেপ দিতে সমর্থের পক্ষে বিমুখতা অপরাধ। ইংলণ্ডীয় গভর্ণমেণ্ট ও ইংলণ্ডীয় কাউণ্টি কাউন্সিল অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিলেন, কাতারে কাতারে রোগী রোগ-যাতনা নিঃশেষ করিবার জন্য সমাগত হইল। চিকিৎসক তাহাদের রোগ পরীক্ষার জন্য যাহা যাহা করিবার, তাহা করিলেন। কিন্তু আরও বিশেষ-কিছু করিবার মনন যখন উপস্থিত হইল, তখনই তাহারা আত্মনিয়োগ করিলেন, যন্ত্র আবিষ্কারে। আবিষ্কৃত হইল চিকিৎসার বিবিধ যন্ত্র। ইহাকেই বলে প্রয়োজন-পূরণের তাগিদের ফল। কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ হাঁসপাতালে কর্কট (cancer) রোগের

ওয়ার্ড খোলা হইয়াছে। প্রয়োজন-পূরণের তাগিদ এক্ষণে কর্কট বা ক্যান্সার রোগের গবেষণা বুদ্ধি খুলিবেই। তাই চাই কি?—চাই প্রয়োজন-পূরণে অবাধ হওয়া—এমনি রকমে, যেন আয়ুর্ব্বেদ ছাড়া কাহারও চিকিৎসায় প্রয়োজন পূরণ হইতে পারে না।

আমাদের প্রাচীন-শাস্ত্রে মানুষকে অমৃতের পুত্র বলা হইয়াছে। "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।" অমৃতের আস্বাদনে বঞ্চিতগণের জন্য প্রার্থনা ছিল—"মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়।" ইহা সেই প্রাক্ ঐতিহাসিক তপোবনীয় যুগের কথা, দৃষ্টি যেখানে পৌঁছায় না, বোধ যাহার সাড়া বহন করিয়া আনিতে পারে না, কিন্তু যাহার বিলাসমোহমুক্ত ছবি আমাদের কল্প-লোকের আঙ্গিনায় মাঝে মাঝে আসিয়া উদয় হয়। সেই যুগেই জন্ম লাভ করিয়াছিল—আয়ুর্ব্বেদ। আয়ুর্ব্বেদের ঋষি আপন বাণীতে সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন,

"খাদয়শ্চেতনা ষষ্ঠা ধাতবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
চেতনা ধাতুরপ্যেকঃ স্মৃতঃ পুরুষ-সংজ্ঞকঃ॥"

—আকাশাদি পঞ্চভূত ও চেতনা, এই ছয়টি বস্তু পুরুষের ধাতুর সমবায়। চেতনা ধাতুই পুরুষ। আরও লিখিয়াছেন—এই পুরুষই রোগ ও আরোগ্যের অধিষ্ঠান। সুতরাং এই পুরুষই চিকিৎস্য। তারপর আরও লিখিয়াছেন—রোগ পরীক্ষা করিবে, শুধু অনুমান ও প্রত্যক্ষ দ্বারা নয়, প্রজ্ঞাদৃষ্টি দ্বারা, আপ্তজ্ঞান দ্বারা। এমনি করিয়া আমাদের জীবন-প্রবাহ-নিহিত তত্ত্বকে উদ্‌ঘাটন করিয়া, তাহারই সহায়তা লইয়া মানবের রোগাপনোদন করিবার জন্য কত কি লিখিয়াছেন যাহা আমরা এক্ষণে অনুধাবন করিতে পারি না, আত্মীয়ের মত ঘনিষ্ঠতায় যাহার সহিত পরিচয় করিয়া লইতে পারি না। গোত্র-গরিমার ভিতর দিয়া যাঁহাদের সংস্কার আমরা এখনও বহন করিয়া চলিতেছি, বহু জন্মের অসংস্কারের ফলে আমাদের প্রজ্ঞানেত্র আচ্ছন্ন হইয়া থাকায় আমরা তাঁহাদিগকে পর করিয়া ভুলিয়াছি। গ্লানিতে চিত্ত ভরিয়া উঠে।

সিংহ যখন নিদ্রা পরিহার করিয়া জাগে, তখন শুধু তাহার নিদ্রা ও তন্দ্রাই অপসারিত হয় না, বিপুল বিক্রমে তাহার সিংহত্বও জাগে। জাগুক আয়ুর্ব্বেদ সমগ্র আয়ুস্তত্ত্ব লইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয়ের নিশান উড়াইয়া। প্রতীচ্যের যাহা-কিছু ভাল, প্রশ্নশূন্য উদ্দীপ্তি সহকারে আমরা তাহা আয়ত্ত করিব। আর আমরা পূর্ব্বপুরুষের পূজায় অভিদীপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাকৃতাঞ্জলিপূর্ণ আনতির সহিত তাঁহাদের অভিজ্ঞানরাশিকেও মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে প্রয়াস করিব। যে আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যরক্তমর্য্যাদার পূজারী হইয়া যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া আর্যাসংস্কৃতির স্বমস্তক কিরীট মস্তকে পরিধান করিয়াছিল, আমরা আবার তাহাকে তেমনি করিয়া উহা পরাইয়া দিব।

আয়ুর্ব্বেদ ও গভর্ণমেণ্ট

(১)

অতি প্রাচীন যুগে ভেষজ-শক্তির ক্রমোৎকর্ষতা সাধনের ভিতর দিয়া আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র ক্রমিকরূপে পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অপরাপর প্রণালীর চিকিৎসা-শাস্ত্রের উপরও আধিপত্য বিস্তার করিয়া উহাদিগকে সুসংস্কৃত করিয়াছে, এই সত্য—আধুনিক কালে আমরা আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে যে চর্চ্চা ও গবেষণা করিতেছি, শুধু তাহারই পোষকতায় সীমাবদ্ধ নহে। বিজ্ঞান অর্থ যদি যান্ত্রিক জগতের এবং আত্মিক জগতের বিশেষ জ্ঞান হয় এবং তাহা যদি ক্রম-বিকাশশীল হয়, তবে আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব আয়ুর্ব্বেদের ভবিষ্যতের বিপুল উন্নতি-সম্ভাব্যতারও পরিপোষক বটে। যে তত্ত্ব যত প্রাচীন, কাল-প্রবাহ যে তত্ত্বের ক্ষীণতা সাধন করিতে পারে না, বুঝিতে হইবে, সেই তত্ত্ব তত অধিক দৃঢ়-মূলসম্পন্ন। কোন প্রতিভাবান্ পুরুষকে যদি কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়, দেশ যদি তাঁহার প্রতিভার অবদান লাভে বঞ্চিত হয়, তবে সেই পুরুষের কারামোচনে দেশের কি কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, তাহারই সমস্থত্রে চিন্তাপরায়ন ব্যক্তি যেরূপ ইহা বুঝিতে পারেন, সেইরূপ আয়ুর্ব্বেদসেবী আমাদের কেহ কেহ কি আয়ুর্ব্বেদের ভবিষ্যৎ গর্ভে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার অধিকতর কল্যাণ-নিঃস্রাবের সম্ভাব্যতা উপলব্ধি করিতে পারি না?

দেশের জন-সমষ্টির শাসন ও সংরক্ষণের বোধ হইতেই গভর্ণমেণ্ট গঠনের চিন্তার সূত্রপাত হইয়াছিল। বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্টের মূলগত কার্য্যকরী নীতি বিভিন্ন বটে, কিন্তু দেশের শাসন ও সংরক্ষণ কেমন করিয়া ক্রমোন্নতভাবে পরিচালনা করা যাইতে পারে, ইহার উপরেই প্রতি-দেশের গভর্ণমেণ্টের মূল ভিত্তির প্রতিষ্ঠা। একান্ত আধুনিককালেও আমরা কোন কোন দেশের গভর্ণমেণ্টের সাময়িক পতন এবং পূর্ণ বিলোপ লক্ষ্য করিয়াছি।

তাহারও মূলে দেশের শাসন ও সংরক্ষণের প্রশ্নই জড়িত। যে গৃহকর্ত্তার সংসার-পরিচালনায় সংসারে উন্নতিমুখরতার পরিবর্ত্তে বিশৃঙ্খলা ও অধোগতি-পরায়ণতার আবির্ভাব ঘটে, সেই গৃহকর্ত্তার সহিত অপর গৃহকর্ত্তার বদল স্বভাব-সঙ্গতি সহকারেই সাধিত হইতে দেখা যায়। ঐরূপ সহস্র-লক্ষ-কোটী গৃহের সমষ্টির প্রতিচ্ছবিই দেশ নামে অভিহিত হয় না কি ?

বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যেরূপ প্রয়োজনানুপাতিক আহার্য্য গ্রহণের প্রয়োজন, সেইরূপ সুস্থতার ব্যতিক্রমে বিধানানুপাতিক চিকিৎসারও প্রয়োজন। যে দেশে যাহার জন্ম, সেই দেশের ভেষজাদিই তাহার অসুস্থতায় নিরাময়ের পক্ষে উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু বিশ্লেষণ-জ্ঞান সহযোগে যদি কেহ ব্যাধি-বিশেষের উৎকৃষ্ট ঔষধ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন, তবে তাহা দেশের গণ্ডীর অপেক্ষা রাখে না। এই প্রকার বিচারে বৈদেশিক ঔষধ-বিশেষের এদেশে আমদানীর যদি সার্থকতা থাকে, তবে এদেশের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাবলীরও বিদেশে রপ্তানী করার সার্থকতা ততোধিক থাকা উচিত।

আয়ুর্ব্বেদের সার্ব্বাঙ্গিক উন্নতি বিধান ও প্রসার দেশের জনসমষ্টি-গত শাসন-সংরক্ষণ ব্যবস্থারই অঙ্গীভূত বিষয় বটে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিতে ও প্রসারে বিশেষ আগ্রহান্বিত নহেন বলিয়াই বোধ হয়। যে দেশে সমুজ্জ্বল ঋতুবৈচিত্র্য বিদ্যমান, ভেষজ-সম্পদ সুপ্রচুর, ঔষধ-বিজ্ঞানে পারদর্শী লোকেরও অভাব নাই, সেই দেশের জাতীয়-ঔষধ-বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসার সহজেই সাধন করা যাইতে পারে। আপন আপন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাইবার বিপুল চেষ্টায় প্রতি-দেশই আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এই দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষের উপরই সংস্থিত। ভারতবর্ষে বৈদেশিক ঔষধের আমদানীর পরিমাণের যে হিসাব প্রতি-বৎসর প্রকাশিত হয়, তাহার সহিত অচিকিৎসিত অবস্থায় এদেশে যে সহস্র লক্ষ লোক প্রতিবৎসর মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তাহাদের প্রয়োজন-সম্ভব ঔষধের পরিমাণের হিসাব

সংযোগ করিলে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি ও প্রসার সাধন করিবার আবশ্যকতা স্পষ্টই অনুভূত হয়।

২

মাটী, জল ও খাদ্য প্রকৃতিজ। উহাদের অনায়াসলভ্যতার উপর প্রতি মানুষেরই জন্মগত দাবী আছে। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্ভব ও গঠন পারিপাট্যের সমান্তরালে উপরিউক্ত প্রকৃতিজ বস্তুগুলি মানুষের অর্থলভ্য বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য, তাহাতে সমাজে ও রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা সম্পাদিত হইয়াছে, ইহা বলিতে হইবে।

ঔষধের উপকরণসমূহও প্রকৃতিজ। মানুষ মাত্রেরই উহাদের উপর স্বতঃ-অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু ঔষধের উপকরণ বিশেষের উপকারিতায় মানুষ স্বতঃজ্ঞানী নহে বলিয়া এবং মাটী, জল ও খাদ্যের লভ্যতায় শৃঙ্খলা বিধানের ন্যায় ঔষধের লভ্যতায়ও শৃঙ্খলা বিধানের প্রয়োজনে ঔষধও এক্ষণে মানবের অর্থলভ্য বস্তুতে পরিণত হইয়াছে।

এ দেশের কত হাজার লোকের ব্যাধি সারাইবার পক্ষে কত জন চিকিৎসক নিযুক্ত, কত হাজার ভগ্নস্বাস্থ্য ও রুগ্ন লোকের মধ্যে কত জন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে ও রোগ দূরীকরণে যথোপযুক্ত ঔষধ-পথ্য সংগ্রহক্ষম, তাহা সংখ্যাতত্ত্ব আলোচনার বিষয়। কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহই নাই যে, আমরা ভারতবাসী সুস্থতা আহরণে ও ব্যাধি বিতাড়নে আমাদের গভর্ণমেণ্ট হইতে যে সাহায্য লাভ করিয়া থাকি, তাহা প্রয়োজনের তুলনায় একান্ত পক্ষেই অকিঞ্চিৎকর।

দর্শনীর বিনিময়ে চিকিৎসকের রোগী গ্রহণ করার প্রথা পুরাতন প্রথাই বটে। কিন্তু ইহা দ্বারা চিকিৎসা-ব্যাপারে রোগীর অর্থকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় না কি? চিকিৎসক-শ্রেণীর উপর কটাক্ষপাত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা ইহাই বলিতে চাই যে, চিকিৎসকের অন্নবস্ত্র ও

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভার যদি দেশের গভর্ণমেন্ট বা কোন প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেন এবং সেই অবস্থায় রোগীর সহিত চিকিৎসকের যোগাযোগে রোগীর অর্থের যদি কোন স্থান না থাকে, তবে রোগীর সহিত চিকিৎসকের অধিকতর একাত্ম-ভাব সংস্থাপিত হয় না কি? অবশ্য ইহা লিখিয়া আমরা সরকারী হাঁসপাতালসমূহের চিকিৎসকগণের অবিমিশ্র প্রশংসা করিতেছি না। মোটামুটী আমাদের বক্তব্য এই যে, উৎকৃষ্ট চিকিৎসার নির্দ্দেশ এবং উৎকৃষ্ট ঔষধ যদিও অর্থ-লভ্য বস্তু, কিন্তু প্রত্যক্ষ অর্থ-সংস্রববিহীনতায় কোন বিশেষ জিলার প্রতি-ব্যক্তির পক্ষে তাহা লভ্য হইতে পারে (যেরূপ আমাদের মুন্সিপালিটি-সমূহ সহরে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, জল গ্রহণ করিবার কালে তাহার মূল্য দিতে হয় না, কিন্তু জলকর প্রদানের যোগ্য ব্যক্তিগণ পরোক্ষে তাহার মূল্য প্রদান করিয়া থাকেন)—এইরূপ একটা ব্যবস্থা যদি সেই জিলায় গঠিত করিয়া লওয়া যায়, তবে তাহা সেই জিলার সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সবিশেষ কল্যাণপ্রদ হয় না কি? এদেশের গভর্ণমেণ্ট ও জিলাবোর্ড-সমূহ যে সমস্ত হাঁসপাতাল পরিচালনা করিতেছেন, প্রয়োজনের অনুপাতে তাহার সংখ্যা বর্দ্ধিত করিলে প্রত্যক্ষ কার্য্য-ক্ষেত্রের যে একটা চিত্র অঙ্কিত হয়, আমরা যে ব্যবস্থার কথা বলিতেছি, তাহার যান্ত্রিক অংশের প্রতিরূপও তাহাই বটে। বলা আবশ্যক যে, এক্ষেত্রে ঔষধ বলিতে আমরা বিজ্ঞান-নিয়ন্ত্রিত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বলিয়াই বুঝিতেছি।

আমাদের সর্ব্বশেষ বক্তব্য এই যে, গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় আমাদের নিজেদের নির্ব্যাধি হইয়া চলিবার জীবন্ত স্বার্থে,—যে স্বার্থের পরিপূরণ আমাদের প্রত্যেকেরই কাম্য—ঘর জীর্ণ হইয়া গেলে স্বহস্তে বা আপন তত্ত্বাবধানে তাহা মেরামত করিয়া লওয়ার স্বার্থের সহিত যে স্বার্থ তুলনীয়, তাহারই ভিত্তিতে আমরা যদি পরীক্ষামূলক ভাবে আমাদের নিজেদের এবং জিলা-বিশেষের সামর্থ্যবান্ ব্যক্তিগণের

অর্থানুকূল্যে একটা পরিকল্পনা মূলে সেই জিলায় একটি চিকিৎসাগত সংরক্ষণ ও পোষণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি এবং সময় ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হইয়া যদি আমরা উহাকে ক্রম-প্রসারিত করিয়া লইতে পারি, তবেই সেই জিলার এবং তাহার প্রসারিত অংশের সর্ব্বসাধারণ স্বাস্থ্য ও শক্তিতে উন্নততর হইয়া অধিকতর কর্ম্মশক্তি আহরণে অধিকতর অর্থ উপার্জ্জন করতঃ তাহার অংশ-বিশেষ দ্বারা কালে তাহাদেরই স্বার্থকেন্দ্রভূত সেই চিকিৎসাগত সংরক্ষণ ও পরিপোষণ যন্ত্রকে নিজেদের দায়িত্বে পরিচালনা করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন। এইরূপ একটা বাস্তব পরিকল্পনা ব্যতীত দেশের চিকিৎসাগত অপর কোন আশু কল্যাণজনক পন্থা আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

আমরা কি স্বাস্থ্যবান্ ?

(১)

স্বস্থ শব্দে ষ্ণ্য প্রত্যয় সংযোগ করিয়া 'স্বাস্থ্য' শব্দ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। স্বস্থ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—স্ব-তে স্থিত, আত্মায় স্থিত। সুতরাং স্বস্থ ব্যক্তির যে প্রকৃত ভাব, তাহাকেই স্বাস্থ্য বলা যাইতে পারে।

শব্দ ও চৈতন্যধারা বিশাল সৃষ্টির আদি কারণ। একদা ঐ শব্দ ও চৈতন্যধারা তাহার উৎসারণ-কেন্দ্র হইতে বিনির্গত হইয়া অসীম-ব্যঞ্জনায়-সৃজনমুখর হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল, ব্যক্ত-প্রতীক সত্তায়। তাহার এই চলন-প্রগতি নব নব সৃষ্টির জন্ম দান করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল এমন এক স্থানে, যে স্থানে তাহার অধিকতর সৃজন-কলা-কৌশল প্রয়োগের প্রয়োজন হইল। ঐ প্রয়োজনের একান্ত খাতিরে ঐ ধারা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পুরুষ ও প্রকৃতি রূপে পর্যবসিত হইল। পুরুষ ও প্রকৃতি মিলিত প্রবাহে চলিল আবার অব্যক্তের বুকে তার সৃজন-মঙ্গল-শঙ্খ নিনাদিত করিয়া। শঙ্খের ভৈরব হুংকার অসীমের কোণে সূক্ষ্ম সত্তায় সীমায়িত করিয়া তুলিল কত ঐশ্বর্য, কত প্রাণ! কিন্তু যাহাকে সৃজন করিতে হইবে, স্থূলেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিশ্বজোড়া অপরূপ তাজমহল, ক্রমিকতায় তাহার আরও আরও রকমারি উপাদানে রূপান্তরিত না হইলে চলে কি? সুতরাং উৎপত্তি লাভ করিল, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ। কেন্দ্রের এই ক্রমাগতি কম্পনের পর কম্পন তুলিয়া ক্রম-বিকাশচ্ছটায় এই পর্যন্ত যাহা-কিছু সৃজন করিয়া অভিদীপ্ত করিয়া তুলিল, তাহার চলমান স্রোতপ্রবাহ আরও বহুধা প্রকটিত হইতে হইতে সত্ত্ব-রজ-তম—এই তিন গুণজ শক্তিতে যাইয়া রূপান্তর পরিগ্রহ করিল। এই তিন গুণ বহু কলা-কৌশল প্রয়োগে আরও বহুতর নব নব সৃষ্টিতে নব নব সুষমা বিমণ্ডিত করিয়া অধিকতর সৃজন-সম্বেগ ও অঘটনঘটনপটিয়সী-শক্তি লইয়া আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি—এই পঞ্চভূতে ঘনীভূত হইয়া পর্যবসিত হইল; আর এই পঞ্চভূত হইতেই বিকাশ লাভ করিল

এই পরিদৃশ্যমান, স্থূলেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের যাহা-কিছু সব। এমনি করিয়া সৃজন-প্রগতি চলিয়া আসিয়াছে অসীম হইতে সসীমে, অরূপ হইতে রূপে, অকাল হইতে কালে।

"পৃথিবী, আকাশ, জল, তেজ, বায়।
জগৎ চলিছে এই পঞ্চতত্ত্বের লীলায়॥"

জড়বিজ্ঞানে উদ্ভাবিত পদার্থ বিদ্যায় (Physics) দ্রব্য সকল কঠিন, তরল, বায়বীয় ও তৈজসী (radiant state of matter)—এই চারি ভাগে বিভক্তই হউক বা রসায়ন-শাস্ত্রানুসারে বহুবিধ মৌলিক পদার্থে বিভাজিতই হউক, স্রষ্টাপুরুষ সৃষ্টি মাঝারে পঞ্চতত্ত্ব লইয়া যে খেলা খেলিতেছেন, উহারা সেই পঞ্চতত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেহও এই পঞ্চতত্ত্বের দ্বারাই গঠিত।

সেই মহা সুদূরে অবস্থিত সৃজনধারার যে উৎসারণ-কেন্দ্র, পরমপিতা বা পরমাত্মা যাহার কেন্দ্রাধিপতি, সূর্যমণ্ডল হইতে তাহার রশ্মিকণার বিনির্গমের মত, জীবাত্মা তাহা হইতেই বিনির্গত হইয়া উৎসারণ-ধারা বাহিয়া ঐ ধারারই ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান্ হইয়া চলিয়া আসিয়াছে, এই স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-ময় বিশ্বনাট্যশালায়। অতএব প্রত্যেক ব্যষ্টিই সেই পরমাত্মারই একটা প্রকট সীমায়িত ভাব ছাড়া আর কিছু নহে। আর সেই সীমায়িত ভাবই জীব, পুরুষ বা চেতনা। আয়ুর্ব্বেদ ঐ পঞ্চভূতকে পঞ্চধাতু এবং জীব বা পুরুষকে চেতনাধাতুরূপে আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যে দেহকে চলৎশীল কোষাণুসমষ্টির একটি শিল্পকলাময় প্রতীক বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়, তাহারই সত্য স্বরূপের সন্ধানে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে আবর্ত্তন করিলে সর্ব্বাগ্রেই উপলব্ধির দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠে, দেহের পঞ্চভূত ও চেতনার লীলা। তাই আয়ুর্ব্বেদকার লিখিলেন, —"বিকারো ধাতুবৈষম্যং সাম্যং প্রকৃতিরুচ্যতে।" দেহের পঞ্চভূত ও তাহার সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত চেতনা, এই ষড়্‌ধাতুর বৈষম্যই বিকার বা ব্যাধি এবং তাহার সাম্যাবস্থাই স্বভাব বা স্বাস্থ্য।

স্বাস্থ্যের এবম্বিধ সুসমঞ্জস ও সুসমাপ্ত সংজ্ঞা অথবা স্ব-তে অবস্থিত ব্যক্তির যে প্রকৃত ভাব, তাহারই এরূপ সুসঙ্গত নামাকরণ আর্য্যঋষিগণের অন্তঃশক্তির কতখানি গভীরতার পরিচয় প্রদান করে, তাহা অনুভবনীয়। আয়ুর্ব্বেদ অন্যত্র লিখিয়াছেন—

"সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুমলক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে॥"

স্মৃতি, চেতনা ও ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট আমাদের দেহের যবনিকার অন্তরালে অনন্ত-শক্তির বিদ্যমানতা রহিয়াছে। সেই শক্তির স্থূলপ্রান্তে বীজাকারে তিনটি শক্তির খেলা চলিতেছে। সেই তিনটি শক্তি সত্ত্ব, রজ, তমোরই রূপান্তরিত অবস্থা বায়ু, পিত্ত ও কফ। উহারা বিকৃত হইয়া ধাতু ও মল পদার্থ সকলকে দূষিত করে বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ উহাদিগকে দোষ নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাহার দেহে এই দোষত্রয় কোন প্রকার বিকৃতি উৎপন্ন না করিয়া সমভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তুষ্টি-পুষ্টি ও বৃদ্ধি যোগায়, তাহাকে সমদোষ বলে। যাহার কায়াগ্নি ও পরিপাকাগ্নি যথাবিহিত সামঞ্জস্য লইয়া যথোচিত পরিমাণে ও অব্যাহত গতিতে ধাত্বগ্নি-সংরক্ষণ ও পরিপাক-ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহাকে সমাগ্নি বলে। পঞ্চভূতকে আয়ুর্ব্বেদ যেরূপ পঞ্চধাতু আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ রস-রক্ত-মাংস-মেদ-অস্থি-মজ্জা ও শুক্র—উহারা ভ্রূণদেহ হইতে ক্রম-বিকাশতত্ত্বের ন্যায় একটি আর একটি হইতে নবরূপে উদ্ভিন্ন হইয়া মানবদেহ ধারণ করে বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ উহাদিগকেও ধাতু নামে অভিহিত করিয়াছেন। উভয় প্রকার ধাতুর মধ্যে পার্থক্য হইল এই যে, প্রথমোক্তটি সূক্ষ্মকে লইয়া স্থূলদেহের এবং দ্বিতীয়োক্তটি প্রধানতঃ স্থূল-দেহেরই গঠন ধারণ করিতেছে। প্রথমোক্তটি যেমন দেহের সম্রাট এবং দ্বিতীয়োক্তটি যেমন তাহারই অধীনস্থ রাজা। ঐ সপ্তধাতু রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র—উহাদের কার্য্য যথাক্রমে প্রীণন, জীবন, লেপন, স্নেহন, ধারণ, পূরণ ও গর্ভোৎপাদন। উহাদের কোন একটির বিকৃতিতে সেই একটির

কার্য্যেও বিকৃতি জন্মে এবং অপরগুলির কার্য্যেও বিঘ্ন উৎপাদিত হয় অতএব উহাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিভূত অবিকৃত অবস্থার নাম সমধাতু। মল দুই প্রকার, আহারজ ও ধাতব। পুরীষ ও মূত্র আহারজ মল; আর নাসাপথে প্রশ্বাসের সহিত এবং চর্ম্মছিদ্রপথে ঘর্ম্মরূপে যে মল বিনির্গত হয়, তাহা ধাতব মল। এই উভয় প্রকার মলের অবিকৃত অবস্থায় যথোচিতরূপে বহির্গমনকে মলক্রিয়া বলে। যাহার আত্মা সুপ্রসন্ন, মন বিশুদ্ধ, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটি এককরূপে এবং সংযুক্তভাবে সুস্থ, স্ব স্ব কর্ম্মে সুদক্ষ, তাহাকে প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনা বলে।

মোটের উপর ঐ শ্লোকটির এইরূপ অর্থ দাঁড়াইল যে, অবিকৃত ও প্রকৃতিস্থ দোষ ও অগ্নি, অবিকৃত সপ্তধাতু ও মলক্রিয়া এবং আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রসন্নতাই স্বাস্থ্য।

স্থূল ও সূক্ষ্ম অস্তিত্বের অভিজ্ঞানকুশল আর্য্যঋষি স্বাস্থ্য বলিতে যাহা বুঝাইতেছেন, আমরা সেইরূপ স্বাস্থ্যে স্বাস্থ্যবান্ আছি কি ?

(২)

বস্তু-জগৎ, জীব জগৎ সকলই আত্মাতে স্থিত। পরমাত্মাই আত্মারূপে প্রকটিত হইয়া তাঁহার অভিনব সৃষ্টি-চাতুর্য্য ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এক মাত্র মানুষই এই আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া আত্মস্থ ও স্ব-স্থ হইয়া স্বাস্থ্যের বিকাশমানতা লইয়া অবস্থান করিতে পারে। কিন্তু জল ও মাটী যেরূপে কর্দ্দম হইয়া অবস্থিতি করে, আমরাও সেইরূপ আত্মাতে অবস্থান করিতেছি। আমাদের অবস্থান করা আবশ্যক জলাধারে তৈলবিন্দুর মত, সরোবরে প্রস্ফুটিত শতদলের মত, গীতার ভাষায়—'পদ্মপত্রমিবাম্ভসি।'

পৃথিবীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্ত ব্যাপিয়া নরমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। * যুদ্ধ নূতন নয়। ইতিহাসের পাতা উল্টাইলে মানবের সকল

* চীন-জাপান যুদ্ধ ও স্পেনের গৃহযুদ্ধ।

কৃতিত্বকে ছাপাইয়া যে শোভমান কদর্য্যতা নগ্ন হইয়া উঠে, তাহা যুদ্ধ। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত যুদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল যুদ্ধের আহুতিকে একত্র করিলে ধনজন ও বস্তুর ক্ষতি হিমালয়-সমান হইয়া উঠিবে। যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা আছে বৈ কি। শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অর্জ্জুনের রথ-সারথি। একান্ত আপনার জনকে হত্যা করিতে হইবে, ইহা প্রত্যক্ষরূপে দেখিয়া অর্জ্জুনের যখন নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল এবং যুক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তেজগর্ভকণ্ঠে বলিলেন,—

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥"

উঠ, জাগ, যুদ্ধ যাহাতে না বাধে, ধরিত্রী যাহাতে নরশোণিতে প্লাবিত না হয়, তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু আমার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। হত্যার চুলকানি আমার নাই; আর আমারই বক্ষের উপর আমারই স্নায়ু-শিরার বলিষ্ঠ বর্দ্ধনকে অপঘাত করিয়া তোমাদের এই হত্যা-লীলা! কিন্তু অর্জ্জুন, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ তুমি, সম্মুখ সমরে আসিয়া এক্ষণে প্রত্যাবর্ত্তন তোমার শোভা পায় না।

ইহার উপরেও অর্জ্জুন যখন স্বজন হত্যার জন্য বিলাপ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ একটু বক্রোক্তি না করিয়া পারিলেন না। বলিলেন,—

"—অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।"

যাহার জন্য শোক করা অনাবশ্যক, তুমি তাহার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছ, অথচ পণ্ডিতের মত কথাও কহিতেছ। ভাবার্থ এই যে, এ যুদ্ধকে ঠেকাইয়া রাখিবার আর উপায় নাই। অমঙ্গল, অকল্যাণ দানা বাঁধিয়া অস্বাস্থ্যের পাহাড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া ঝাটাইয়া সাফ না করিলে মঙ্গল আর কল্যাণের পুনঃ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না।

যুদ্ধ বাঁধে মানুষের বৃত্তির সহিত বৃত্তির। যে দুইটি শক্তি দুর্দ্দম্য ও অদমনীয়

সত্তায় সমগ্র বিশ্বভুবনকে পরিচালনা করিতেছে, উহাদের একটির নাম কাল (time and space) এবং অপরটির নাম দয়াল (full and infinite spirituality beyond time and space)। যাহা পরিবর্ত্তনশীল, তাহাই কাল; আর যাহা পরিবর্ত্তনের অতীত, তাহাই দয়াল। আমাদের প্রতি-প্রত্যেকের ভিতরে ঐ কাল ও দয়ালের অবস্থিতি আছে। "নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন"—বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ঐ দয়াল দেশেরই ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যখন অনিবার্য্য হইয়া উঠিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ আপনার স্বতঃ অভিজ্ঞান লইয়া ঐ যুদ্ধের ভিতর দিয়া কালবৃত্তিগুলিকে এমনি কুশলতায় নিয়ন্ত্রিত ও নিঃশেষ করিয়াছিলেন, যাহার মাঙ্গল্য-নিঃস্রাব শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া অশোকের মহাসমৃদ্ধিপূর্ণ রাজত্ব পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া ভারতকে শান্তি ও স্বস্তি প্রদান করিয়াছিল। তখন কেহ ছিলনা এমন—যে ভারতকে আক্রমণ করিবে অথবা ভারতে বিদ্রোহ উত্থাপন করিবে।

কিন্তু সার্ভিয়া ও রুমানিয়াকে কেন্দ্র করিয়া ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে যে সমরানল প্রজ্জলিত হয়, যাহা পৃথিবী শোষিয়া ধনজন আকর্ষণ করতঃ বিপুলকায় দানবীয় মূর্ত্তিতে সকলই সংহার করে, তাহার শোকভার, ক্ষয়ভার, ঋণভার সামলাইয়া না লইতেই পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে ঐ ইউরোপে, অধিকন্তু এশিয়ায়। শতাব্দী দূরে থাকুক, তাহার সিকিভাগও অতিক্রান্ত হইল না।

কালবৃত্তির সহিত কালবৃত্তির যুদ্ধে কালবৃত্তি আরও বৃদ্ধি পায়, ভবিষ্যতের যুদ্ধকে আরও ঘনায়মান করিয়া তোলে। তাহারই ক্রমাগতি যদি চলে ধরিত্রীর বক্ষ মথিয়া, তবে বুঝিতে হইবে, বর্ব্বর-যুগকে আবাহন করাই আমাদের নিয়তির বিধান।

বাষ্পকণার সমবায়ে যেরূপ মেঘ, সেইরূপ বহু কালবৃত্তির সমবায়ে এক একটা যুদ্ধ। রাষ্ট্রে, সমাজে, জীবনে, কর্ম্মে, ব্যবহারে, বাক্যে—আমাদের জীবন-চলনার প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে অসত্য, যে গ্লানি প্রতিক্ষণ ব্যাপিয়া রেণু রেণু

হইয়া উৎপত্তি লাভ করে, তাহার মূলোচ্ছেদ করিতে না পারিলে দিগন্ত ছাইয়া যেমন করিয়া কাল-বৈশাখীর উদয় হয়, তেমনি করিয়া মানব সমাজে যুদ্ধের আবির্ভাব হইবেই।

ভারতেও অহিংস যুদ্ধের এক বিরাটপর্ব্ব সমাপ্ত হইয়াছে। অহিংস হও, ইহা বলিতে আমরা বুঝি, ত্রিগুণাতীত হও, কালাতীত হও, দয়ালদেশে যাইয়া অবস্থান কর।

ক্লোরোফর্ম্ম করিলে আমরা সাময়িকভাবে চেতনা হারাই। তাহার অর্থ—আমাদের মন কিছু সময়ের জন্য নিষ্ক্রিয় (inoperative) হয়। কিন্তু আমাদের চৈতন্য, সুরত বা libido নিষ্ক্রিয় হয় না, তাহা আমাদের সত্তার এক গভীর অংশে অনুপ্রবেশ করে। মন ও সুরতের এই যে অবস্থা এবং অবস্থানান্তর, তাহাতেই আমরা বোধশক্তিরহিত হইয়া যাই এবং ক্লোরোফর্ম্মের উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

ধ্যান, ধারণা ও সমাধির কথা আমরা সকলেই জানি। ধ্যান অর্থ কোন-কিছুর চিন্তা করা, আর এই চিন্তা যখন একান্ত তৃপ্তির হইয়া উঠে এবং নিরন্তর মনে লাগিয়াই থাকে, তখনই তাহা হয় ধারণা। এই ধারণা যখন প্রগাঢ় হইয়া প্রগাঢ়তা আনুপাতিক ক্ষেত্রে ধারণাকারীকে বহন করিয়া লইয়া যায়, যেথায় তাহার বাহ্য-চেতনার অবলুপ্তি ঘটে, তখন তাহার হয় সমাধি। ক্লোরোফর্ম্মে মন নিষ্ক্রিয় হয়, কিন্তু সমাধিতে মন সক্রিয়-ত থাকেই, অধিকন্তু জোয়ারের প্লাবনের মত আরও ক্রিয়মানতায় উচ্ছল হইয়া সুরতের সহিত ঊর্দ্ধগামী হয়। অতএব ক্লোরোফর্ম্ম, ধারণা ও সমাধির ভিতর দিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আমাদের দেহাতিরিক্ত একটি চৈতন্যময় বস্তু আছে এবং তাহার একটি নিজস্ব, সুবিশাল অনুভূতিভিত্তিক ক্ষেত্র আছে। স্যার অলিভার লজের একটি কথা "We are each of us larger than we know"—আমরা আমাদিগকে যতখানি জানি, আমরা তদপেক্ষাও বৃহৎ। বৃহৎ ত বটেই। আমরা জানি কতটুকু ? জানি মাত্র তিল ; এই তিলের পশ্চাৎ কত যে তাল রহিয়াছে,

কে তাহার খবর রাখে ? আমরা আমাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেরূপ নামাকরণ করিয়াছি, সেইরূপ মন ও সুরতের ঊর্দ্ধগামী হওয়ার, কালাতীত হওয়ার, দয়ালদেশে উপনীত হওয়ার যে অমৃতসম্বাহী পথ—দ্রষ্টাপুরুষগণ তাহারও বিশেষ বিশেষ স্থানের বিশেষ বিশেষ নামাকরণ করিয়াছেন। স্থূলের পরে সূক্ষ্ম জগতের প্রান্তে আছে শূন্য বা দশমদ্বার নামীয় স্থান যেথায় উপনীত হইলে প্রকৃত আত্মদর্শন হয়। শূন্য মানে নাস্তিত্ব নয়। অস্তির জ্ঞান না থাকিলে কি নাস্তির জ্ঞান হয় ? উহারা পরস্পর-সাপেক্ষ। যাহা অনির্ব্বচনীয়, প্রকাশ করা যায় না—তাহাই শূন্য। আর ইহাই বুদ্ধদেবের শূন্যবাদ।

অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের পারে, সসীম-অসীমের পারে, সান্ত-অনন্তের পারে, ভাব-অভাবের পারে এই যে শূন্য বা নির্ব্বাণতত্ত্ব, তাহাকে লাভ না করা পর্য্যন্ত অর্থাৎ দয়াল দেশে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের অস্তি ও বৃদ্ধি ক্ষুণ্ণ হওয়া অনিবার্য্য। কেননা—কাল (time and space) স্বয়ংই ক্ষয়মান, পরিবর্ত্তনশীল। ঐ পরিবর্ত্তনশীলতার ঊর্দ্ধে গমন করিতে পারিলেই আমরা হিংসার হাত এড়াইতে পারি, আমরা অহিংস হইতে পারি।

তাই বলি, স্ব-তে বা আত্মাতে স্থিতির ভাবরূপ যে স্বাস্থ্য, তাহা প্রাচ্যেও নাই, প্রতীচ্যেও নাই। এই না-থাকা আর কতকাল হাহাকার তুলিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ-নিঃশ্বাসে পৃথিবীকে তপ্ত করিবে, কে জানে !

(৩)

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ভারতে ১ হইতে ১০ বৎসর বয়স্ক শিশু ও বালক-বালিকা শতকরা ৪৯ জন মারা যায়। ইংলণ্ডে ঐ বয়সের মৃত্যু-সংখ্যা শতকরা ১২ জন। ইংলণ্ডে ১ বৎসর বয়স্ক যত শিশু মারা যায়, তাহার সাড়ে তিন গুণ বেশী ভারতবর্ষে মরে। ভারতবর্ষে এক বৎসরের মোট মৃত্যু সংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ শিশু মৃত্যু। পৃথিবীর ৪৬টি দেশের শিশু মৃত্যুর হার ভারতীয় জন-স্বাস্থ্য-বিভাগ সংগ্রহ করিয়াছেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে দেখা

গিয়াছিল যে, বিভিন্ন ৪০টি দেশের শিশুমৃত্যুর হার ভারতবর্ষের হার অপেক্ষা কম। নিম্নে কয়েকটি দেশের প্রতি হাজারের সাধারণ জন্ম-মৃত্যু এবং শিশু-মৃত্যুর একটি তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল।

দেশ	জন্ম	মৃত্যু	শিশু-মৃত্যু
বৃটিশ-ভারত	৩৫·৪	২২·৬	১৬২
ইংলণ্ড ও ওয়েলস্	১৪·৮	১২·১	৫৯
মালয়	৩৮·৭	১৯·২	১৪২
জাপান	২৯·৯	১৭·৭	১১৭
প্যালেষ্টাইন	৪৪·৯	১৬·১	১২২
মিশর	৪১·৮	২৭·৩	১৬৪
স্কটল্যাণ্ড	১৭·৯	১৩·৪	৮২
অষ্ট্রেলিয়া	১৭·১	৯·৪	৪৯
কানাডা	২০·২	৯·৭	৬৬
নিউজিল্যাণ্ড	১৬·৬	৮·৭	৩০
দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন	২৪·১	৯·৬	৫৯

১ বৎসর হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সে ইংলণ্ডে যত লোক মরে, ভারতবর্ষে তাহার ৫ গুণ অধিক মারা যায়।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ৯৫৬ বা মোট মৃত্যু সংখ্যার শতকরা ২৩·৪ ভাগ। ইহার মধ্যে অনধিক ১ মাস বয়স্ক শিশু মৃত্যুর হার শতকরা ৫৬·৫। শুধু বসন্ত রোগে অনধিক ১ বৎসর বয়স্ক শিশু ৪৩৬৪ এবং ১০ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকা ১০০৯৯ জন মারা গিয়াছে। ঐ বৎসরে ৭৩ হাজার ৩৯৯টি শিশু মৃত প্রসব হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের সংখ্যা ছিল ৭২ হাজার ৫৫৮।

১৯৩৫ ও ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের বিভিন্ন রোগের মৃত্যুর সংখ্যার একটি তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল।

রোগের নাম		১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ		১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ
কলেরা	...	৫৯৬০৫	...	৭৬১০০
বসন্ত	...	৭৫৪৮	...	৪৬২৬৭
ম্যালেরিয়া	...	৩৩৬৬৪৭	...	৯৪২৯৫৫
কালাজ্বর	...	২১১৬১	...	১৭৪৬৯
শ্বাসরোগ	...	৮৪৮৬৮	...	৯৪৮১৭
নিউমোনিয়া	...	৪১৯৩৮	...	৪৯১৫৫
অতিসার	...	...	...	২৭৩০৭
আমাশয়	...	...	...	৯০৯০৫
কুষ্ঠ	...	...	...	৯৯৪
যক্ষ্মারোগ	...	১৬৫২৪	...	২৫২৬৬

বিগত ৫০ বৎসরে ইংলণ্ডে সাধারণ মৃত্যুর হার একদিকে যেমন শতকরা ৫০ জন কমিয়াছে, যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর সংখ্যাও ⅔ অংশ হ্রাস পাইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে আমেরিকাতে যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা ৭৫ ভাগ কমিয়াছে। বিগত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মার্কিন দেশের মিচিগান সহরে যক্ষ্মারোগে মারা যায় ১৪৭ জন। কিন্তু ঐ খৃষ্টাব্দের ঐ মাসে কলিকাতা সহরে মারা যায় ২৪৭ জন। মনে রাখা আবশ্যক, মিচিগানের লোকসংখ্যা ৪৪ লক্ষ, কিন্তু কলিকাতার লোকসংখ্যা ১৩ লক্ষ মাত্র। লোকসংখ্যার হিসাবে মিচিগান হইতে কলিকাতায় যক্ষ্মারোগের মৃত্যু-হার ৬গুণ বেশী। ১৯৩৩ এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ও ভারতের কয়েকটি সহরের যক্ষ্মা-রোগের মৃত্যু-সংখ্যার হার পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হইল।

সহর		মৃত্যুর হার		প্রতি লক্ষে
লণ্ডন	...	৪২	...	”
বার্মিংহাম	...	৮৬	...	”
মাঞ্চেষ্টার	...	১০৪	...	”
কলিকাতা	...	২৩০	...	”
আহ্‌মদাবাদ	...	৩৮৯	...	”
কানপুর	...	৪২২	...	”

যক্ষ্মারোগে ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশের মৃত্যুসংখ্যা :—

প্রদেশ	১৯৩৪ খৃঃ	১৯৩৫ খৃঃ	১৯৩৬ খৃঃ
বাংলা	১৪৮০০	১৬৫০০	১৫৩০০
বোম্বাই	২৩২০০	২৩৬০০	২৪৬০০
সংযুক্তপ্রদেশ	৪১০০	৭৩০০	৬২০০
মাদ্রাজ	২৩০০	২৪০০	২৪০০
মধ্যপ্রদেশ	৪১০০	৪১০০	২৬০০

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে কলেরায় মৃত্যুসংখ্যা ছিল ৫৫ হাজার। পরবর্ত্তী ২৫ বৎসরে তাহার সংখ্যা খুবই হ্রাস পায়। বর্ত্তমানে নাই বলিলেও চলে। বাংলা দেশে প্রতি বৎসরে ৬০ হাজার হইতে ৭০ হাজার লোক কলেরায় মরে। বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধে প্রতি বৎসর গড়ে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার যোদ্ধা মরিয়াছিল। বাংলা দেশে প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া জরেই তাহার বেশী লোক মারা যায়।

কয়েকটি দেশের লোকের গড় আয়ু কত, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি :—

দেশ		গড় আয়ু
আমেরিকার যুক্তসাম্রাজ্য	...	৬০
ইংলণ্ড ও ওয়েলস্	...	৬০

দেশ		গড় আয়ু
জাপান	...	৪৪
ভারতবর্ষ	...	২৬
জার্ম্মানী	...	৫৯
কানাডা	...	৫৮
অষ্ট্রেলিয়া	...	৬৩
নিউজিল্যাণ্ড	...	৬৫

পণ্ডার প্রবর্ত্তিত ধারা (Ponderal Index)—দেহের ওজন ও দৈর্ঘ্যের পরিমাপ করাই এই ধারার বৈশিষ্ট্য। কয়েকটি দেশের অধিবাসীর পণ্ডারের তালিকার তারতম্য নিম্নে দেখান যাইতেছে :—

(ক) বিভিন্ন দেশের অধিবাসী			পণ্ডারের নির্দ্ধারিত তালিকা
১। নরওয়ের অধিবাসী	...	...	২·৩৪
২। পোলাণ্ড দেশীয়	...	...	২·৩৬
৩। বেলজিয়ামবাসী	...	...	২·৩৭
৪। জার্ম্মান ...	...	...	২·৩৭
৫। ওলন্দাজ ...	...	...	২·৩৭
৬। ইংরেজ ...	...	...	২·৩৮
৭। সুইজারল্যাণ্ডবাসী	...	...	২·৩৯
৮। যাভার অধিবাসী	...	...	২·২৫
৯। কোরিয়াবাসী	...	...	২·৩৫
১০। জাপানবাসী ...	...	...	২·৩৭

(খ) বাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র :—

১। বাঙ্গালী মোসলমান ছাত্র	... ...	২.২০
২। বাঙ্গালী বৈদ্য ছাত্র	... ...	২·২২
৩। বাঙ্গালী কায়স্থ ছাত্র	... ...	২·২৩

৪। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছাত্র	...	...	২.২৩
৫। অপরাপর শ্রেণীর ছাত্র	...	...	২.২১

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগের অধীনে ৩৪টি সরকারী ও সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের মোট ৭৮৫৭ জন ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শতকরা ৩৫.৮ জন পুষ্টিকর খাদ্য খায়, শতকরা ২৬.৭ জন চক্ষুরোগে, ৯ জন দন্তরোগে এবং ৬.১ জন টন্‌সিল রোগে ভুগিয়া থাকে। কলিকাতার বাহিরে ১০১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১০৪১০ জন ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শতকরা ২৭.১ জনের ভাগ্যে পুষ্টিকর খাদ্য ঘটে না, শতকরা ১০.৩ জন দন্তরোগে এবং ৯.১ জন চক্ষুরোগে কষ্ট পায়।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ছাত্রকল্যাণ সমিতি (Students Welfare Committee) কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানের কলেজসমূহের ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম উদ্ধৃত করিতেছি। *

পরীক্ষিত ছাত্র কোন্ রোগে ভোগে			শতকরা হার
অপরিপুষ্টতা	...	...	৪০
চর্ম্মরোগ	...	...	২৫.৫
দৃষ্টিরোগ	...	...	৩২.৯
হৃদ্‌রোগ	...	...	৪.১
বর্দ্ধিত প্লীহা	...	...	২
দন্তরোগ :—			
(ক) দন্তক্ষয়	...	...	৮.২
(খ) দন্তনালী	...	...	৩.৬
বর্দ্ধিত গলগ্রন্থি ও এডিনয়েড		...	১৮.৫

* ১৯৩৭-১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের অষ্টাদশ বার্ষিক রিপোর্টে ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে।

উপরে আমাদের স্বাস্থ্যের যে কঙ্কাল-প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করা হইল, তাহা আমাদের সকল-গৌরব-ম্লানকারী জাতীয় ললাটের এক দুরপনেয় কলঙ্ক-বিশেষ। বংশানুক্রমিক ভাবে আমরা স্বাস্থ্যহীন, দুর্ব্বল, অকালমৃত্যু-প্রবণ হইয়া পড়িতেছি। যে কোন বৃদ্ধ বা অতি-বৃদ্ধ সেই বংশানুক্রমিকতার জাজ্জ্বল্যমান ক্রম-নিম্নগতির বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতে পারেন। এদেশের যে কোন ইউরোপীয় লোক রাস্তায় বহির্গত হইলে তাহার দেহের দৈর্ঘ্য, বলিষ্ঠ গঠন, উন্নত ও তেজোদৃপ্ত চলন, তাহার চতুঃপার্শ্বের লোকদিগকে তাহাদের স্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইউরোপীয়ানদের উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যসমন্বিত হইবার একটি প্রধান কারণ এই যে, তাহাদের আপন আপন দেশের ষ্টেটের দেশরক্ষারূপ কার্য্যে তাহাদের স্বাস্থ্য-শক্তির অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন হয়। সেই প্রয়োজনের তাগিদ তাহাদের দেশের প্রতি শ্রেণীতে, প্রতি পরিবারে, প্রতি পিতায়-মাতায় বিসর্পিত হইয়া দেশের সমষ্টিকে উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী করিয়া তোলে। তদ্ধেতু আমরা কখনও ইহা বলিব না যে, আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অধিগত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে উদাসীনতা অবলম্বন করিয়া এক অনাগত শুভদিনের প্রতীক্ষায় দিন অতিবাহিত করিব। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে স্বাস্থ্যের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছি, তদনুসারে স্বাস্থ্যের যে ত্রিধারা পরিলক্ষিত হয়, তন্মধ্যে ইউরোপীয়ানগণ দুইটি ধারাকে অধিগত করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাহারা দৈহিক স্বাস্থ্য-শক্তি অর্জ্জনে উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং আরও উন্নতি সাধনের জন্য যে কর্ম্মনিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তাহার প্রয়োগে তাহারা শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেছেন না।

দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক-স্বাস্থ্য একই সঙ্গে সমতালে অর্জ্জন করিতে হইলে আমাদের চৈতন্য, সুরত বা libidoকে জাগ্রত করা আবশ্যক। আধুনিক-কালের লোকের মনে এরূপ একটি ধারণা আছে যে, এই চৈতন্য বা সুরতকে জাগরিত করিতে হইলে সংসার পরিত্যাগ

করিয়া নির্জ্জনতায় যাইয়া অবস্থান করিতে হয়। প্রাচীন ভারতে আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ স্ত্রী-পুত্র-কলত্রাদি পরিবেষ্টিত হইয়া সংসারে লিপ্ত থাকিয়াই দেহের চৈতন্য-সত্তাকে জাগরিত করতঃ স্ব-তে স্থিতিরূপ দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক স্বাস্থ্য লাভ করিতেন। শ্রীরামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইবার অভিসন্ধিতে নাস্তিক জাবালী চিত্রকূট পর্ব্বতে শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "ন তে কশ্চিৎ দশরথঃ, ত্বং চ তস্য ন কশ্চন।" শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্ম সত্যপরো লোকে, মূলং সর্ব্বস্য চোচ্যতে।"—ধর্ম্মেই সমস্তের মূল, সত্যেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। সেই জাতীয় প্রশ্নের সেই জাতীয় উত্তর আজও আমরা দিতেছি। কিন্তু তাহা আমাদের কার্য্যে প্রতিবিম্বিত হইতেছে না।

আমরা পোলাও-কোর্ম্মা আহার করিতেছি বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছি, কিন্তু রান্না করিবার প্রকৃত প্রণালী বিস্মৃত হইয়া যেরূপে পারি, সেইরূপে রান্না করিয়া আহার করিতেছি; ফলে পুষ্টির পরিবর্ত্তে ক্ষয় লাভ করিতেছি। পাশ্চাত্য জাতি সুরত বা আত্মার জাগরণরূপ পোলাও-কোর্ম্মার ধার না ধারিয়া যাহা আহার করিতেছে, তাহা বিধিমাফিক রান্না করিয়া আহার করিতেছে। তাই, তাহারা যথানুপাতিক পুষ্টি লাভ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা না পারিতেছি, তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে, না পারিতেছি আমাদের চৈতন্য-শক্তির উৎসের অনুসন্ধান করিতে। আমরা স্বাস্থ্যবান্ দেহেও নহি, মনেও নহি, আত্মার বিকাশেও নহি।

স্বাস্থ্য লাভের উপায়

(১)

এক শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতের বড়লাট লর্ড মিণ্টো বলিয়াছিলেন যে, "বাঙ্গালীরা দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, পালোয়ানের ন্যায় তাহাদের শরীরের গঠন। আমি এরূপ সুন্দর জাতি আর দেখি নাই।" ভারতের প্রদেশ-বিশেষের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য ও কান্তি সম্পর্কে বড়লাট সাহেবের এই যে উক্তি, তাহা অপরাপর প্রদেশের অধিবাসীদের সম্পর্কেও সমানরূপে প্রযোজ্য ছিল কি না, তাহার বিচার না করিয়া আমরা ইহা বলিতেছি যে, বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতবাসী তাহাদের বাহুবল হারাইয়াছে, স্বাস্থ্যবল হারাইয়াছে। ভারতমাতা এক্ষণেও যে সকল সন্তান বক্ষে ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন, যাঁহাদের সুবিশাল মানবীয়তার তুলনা পৃথিবীতে দুর্লভ, তাঁহাদের মানবীয় দীপ্তিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর শোকতপ্ত, রোগ-জর্জ্জর দেহ-কঙ্কাল। সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি আলোচনা লইয়া আমরা যে বিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছি, তাহা কেমন করিয়া আমাদের আননে তৃপ্তির ব্যঞ্জনা অঙ্কিত করিতে পারে বুঝিতে পারি না,—যখনই দেখি, আমাদেরই পাশে আমাদেরই স্বদেশবাসী লুপ্ত-স্বাস্থ্যের জয়টীকা ললাটে পরিধান করিয়া কখনও ত্বরিৎ গতিতে, কখনও বা মন্থর গতিতে মৃত্যুর শীতল হস্তকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছে। স্বাস্থ্যলাভের উপায় সম্বন্ধে লেখক-মহলে এবং পাঠক-মহলে এত অধিক আলোচনা হইয়াছে যে এবং স্বাস্থ্যলাভে আধুনিক বিজ্ঞানের নির্দ্দেশও এত সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে যে, তৎসম্পর্কে তৎপ্রকারের প্রয়াস করা বৃথা মনে করি। স্বীকার করি যে, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে 'থিসিস' লিখিয়া সুখ্যাতি লাভের অবকাশ এখনও আছে, ভবিষ্যতেও

থাকিবে, কিন্তু আমরা যাহাদের হস্ত-পদ-দেহকাণ্ডের মস্তক বিশেষ, দেশের সেই দুঃস্থ জনসাধারণ কোন দিন 'থিসিস' বুঝে নাই, এখনও বুঝে না। তাহারা অস্বাস্থ্যে ভুগিয়া ভুগিয়া মরণাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা চায় ঔষধ, চায় পথ্য, চায় জীবন, চায় বৃদ্ধির পথ। যাহারা দেশের মেরুদণ্ড, তাহারা যদি ভাঙ্গিয়া পড়ে, তবে কাহাকে লইয়া দেশ আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া মহাদেশের পুষ্টিবিধান করিবে ?

বলা হইতেছে যে, দেশ স্বাধীনতা লাভ না করিলে দেশের কোন সমস্যারই সমাধান সম্ভবপর হইবে না। গভর্ণমেণ্টর যে শাসন-যন্ত্রটি পৌণে দুইশত বৎসর ব্যাপিয়া বহুসংখ্যক শাসক-শিল্পীর শিল্প-প্রতিভায় ক্রম-পরিপক্কতা লাভ করতঃ কর্ম্মকুশল একটি সুনিপুণ যন্ত্রে পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহার ক্রিয়মানতা ব্যতিরেকে আমাদের উন্নয়নের কার্য্য পরিপূর্ণভাবে সফল হইবে না, আমাদের এই যে ধারণা, তাহাকে আমরা উড়াইয়া দিতে চাই না; কেননা ঐ শাসন-যন্ত্রটিকে অধিগত করা আমাদের একান্তরূপেই প্রয়োজন। কিন্তু আমরা ইহা বলিতে চাই যে, উক্ত শাসন-যন্ত্রটিকে অধিগত করার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটি স্বতন্ত্র প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়া এরূপ কিছু করাও প্রয়োজন, যাহার ফলে জনগণের অবর্ণনীয় দুঃখ-ক্লেশের আশু প্রতীকার হয়, মৃত্যু অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়ায়। তাহারা যদি ফাড়া কাটাইয়া, আশু বিপদ অতিক্রম করিয়া একটুখানি তাজা হইয়া উঠিতে পারে, তবে তাহাদের বল লইয়া আমরা আরও জোরের সহিত দেশের শাসন-যন্ত্রটিকে অধিগত করিবার জন্য লড়াই চালাইতে পারিব।

ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এবম্প্রকার মনোবৃত্তি দেশের ফাঁকে ফাঁকে উৎপত্তি লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কংগ্রেসের উদ্যোগে ভারতের শিল্প-সংগঠনের জন্য যে শিল্প কমিটি গঠিত হইয়াছে, তাহা তৎপ্রকার মনোবৃত্তি সমূহেরই একটি সুপরিস্ফুট বিকাশ। কংগ্রেস সংগঠনের গোড়ায় মিঃ হিউম ভারতবাসীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন,

"By themselves are nations made." আমরা পুনরায় বলি, ষ্টেট আমাদের দখল করিতেই হইবে; কিন্তু ইহাও বলি যে, বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আমাদের যে সমষ্টিগত প্রয়োজন আছে, তৎপ্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়া আমরা জনগণের অকালমৃত্যুর কারণ হইতে পারি না।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যনীতি প্রতিপালন, বিশুদ্ধ বায়ু জল ও পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ, বাড়ীঘর-পায়খানা ও তৎচতুঃপার্শ্বের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিধান, ব্যাধির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা, সংক্রামক রোগ বিতাড়নের চেষ্টা, মিতাচার পালন ও আভ্যন্তরিক পরিশুদ্ধি বিধান ইত্যাদি স্বাস্থ্য-লাভের প্রাথমিক ভিত্তি এবং নরনারী নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই প্রতিপালনীয়। এই ভিত্তির পাশাপাশি আরও দুই প্রকারের দুইটি ভিত্তি একটি অপরটিকে ধারণ করিয়া তিনে এক হইয়া আছে। তাহার একটি শিক্ষার ভিত্তি, অপরটি অর্থোপার্জ্জনের ভিত্তি। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অর্থোপার্জ্জন অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত। একটিকে ফেলিয়া অপরটি আয়ত্ত করা সম্ভবপর নয়। রোগী হাঁসপাতালের চিকিৎসাধীনে সুস্থ হইয়া বাড়ী প্রস্থান করিয়াছে, কিন্তু সুস্থ-ভাব বজায় রাখিবার শিক্ষা পায় নাই বলিয়া এবং অর্থোপার্জ্জন ক্ষমতা স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী নয় বলিয়া পুনরায় রোগাক্রান্ত হইয়া হাঁসপাতালের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত এই হতভাগ্য দেশে নিত্যই পরিলক্ষিত হইতেছে।

এই তিনটি বস্তু স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অর্থে যাহাতে আমরা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতে পারি, তজ্জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে যে চারিটি বিভাগ বহুপ্রকার শাখাপ্রশাখায় সুশোভিত হইয়া বিরাজমান আছে, তাহাদের অধীনে বিভিন্ন প্রদেশেও ঐ প্রকার চারিটি বিভাগ বিদ্যমান আছে। সেইগুলিকে বলা হয়—স্বাস্থ্যবিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, কৃষিবিভাগ, শিল্পবিভাগ। ঐ বিভাগচতুষ্টয়ের কার্য্য-ধারাকে প্রলম্বিত করিয়া প্রতি গৃহবাসীর দৈনন্দিন কার্য্য-ধারার সহিত সংযোগ করিয়া লইলে কেন্দ্র হইতে রস-ধারা প্রবাহিত হইয়া প্রতি ব্যক্তিকে সঞ্জীবিত করতঃ প্রতি ব্যক্তির

কার্য্যকে প্রগতিপন্নতায় সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানে আমাদের অস্তিত্ব-রক্ষা-কল্পে যাহা যাহা করা একান্ত রূপে আশু প্রয়োজন, তাহা আমরা নিজেরা সাধন করিতে পারি না কি ? দেশের শাসনতন্ত্রগত সংস্কার যাহা হইবে, তাহা যাহাতে ভাল করিয়া হয় এবং সেই ভাল হইতে আমরা যাহাতে বাঁচিবার উৎকৃষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারি, তাহার জন্ম যাহা করিবার তাহা ত আমরা করিবই, কিন্তু আমাদের তৎকর্ম্মের সমগ্রতা তৎকল্পে নিয়োজিত না করিয়া (যাহার প্রয়োজনও নাই) তাহার অর্দ্ধাংশকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া হিমাচলের মত বিপুলতা ও দৃঢ়তায় উন্নীত করিয়া, তাহারই গঙ্গোত্রী-ধারার মত তাহাকে দেশের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ জনগণের রোগ-শোক-মৃত্যু বিতাড়নে, শিক্ষা-অর্থ-আহরণে নিয়োজিত করিতে পারি না কি ?

(২)

শিল্প, কৃষি, শিক্ষা ও বাণিজ্যের সহিত স্বাস্থ্যের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক

দেশের শিল্প, কৃষি ও শিক্ষার ক্রমোন্নতির সহিত আমাদের স্বাস্থ্যের ক্রমোন্নতি যে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত, তদ্‌বিষয়ে আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে লিখিয়াছি। এই প্রবন্ধে উহাদের সহিত বাণিজ্যের সংযোগ সাধন করা হইল।

সরকারী সংগঠনী-প্রচেষ্টা

ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহের পক্ষ হইতে শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, বাণিজ্য ও স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানের জন্য যাহা করা হইতেছে, তাহার ফলে তৎ তৎ-বিষয়ের উন্নতির একটা ক্রমপর্য্যায় আমাদিগকে যে কখন আলিঙ্গন করিবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সুতরাং অনতিবিলম্বে আমাদের নিজেদেরই আত্মোন্নয়ন-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আমাদের অবর্ণনীয় দুঃখ-ক্লেশের লাঘব করিবার প্রয়াস করা উচিত।

ভারতের বিশালতা

কোন পরিকল্পনা লইয়া কার্য্য করিবার ইচ্ছার উদয় হওয়া মাত্রই ভারতের ভয়াবহ বিশালতা চক্ষুর উপর সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কিন্তু আমাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়, কোন বৃহৎ প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলার ইহাই একটি প্রধান কৌশল যে, উহাকে বৃহৎ রূপে আরম্ভ না করিয়া ক্ষুদ্র রূপে আরম্ভ করা। সাফল্যকে অনুসরণ করা মানব-চরিত্রের একটি সহজাত গুণ। ঢাকেশ্বরী কটন মিলের সাফল্যদর্শনে নারায়ণগঞ্জে আরও কয়েকটি কটন মিল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নব নব প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় এইরূপেই হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের সংগঠনী-প্রচেষ্টা বা পরিকল্পনাকে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস করিতে হইবে।

অল ইণ্ডিয়া বোর্ড-অব-ডেভেলপ্‌মেণ্ট

ভারতের সর্ব্বদলীয় নেতৃবৃন্দের একটি সম্মেলনে একটি অল ইণ্ডিয়া বোর্ড-অব-ডেভেলপ্‌মেণ্ট গঠন করিতে হইবে। বোর্ডের একটি পার্লামেণ্ট ও একটি ক্যাবিনেট থাকিবে। পার্লামেণ্ট ও ক্যাবিনেটের গঠন সম্পূর্ণীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত সম্মেলনের প্রতিনিধি সভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত একটি কার্য্যকরী সমিতি বোর্ডের কার্য্য পরিচালনা করিবেন। সভাপতি, ছয় জন সদস্য এবং ছয় জন সহকারী সদস্য দ্বারা সমিতি গঠিত হইবে। বোর্ড প্রথম বৎসরে বৃটিশ ভারতের ১১টি প্রদেশান্তর্গত ২৩৮টি জিলার মধ্যে ১১টি জিলা নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবেন এবং দ্বিতীয় বৎসর হইতে প্রতি বৎসরে প্রতি ১১টি জিলায় তাহার কার্য্য সম্প্রসারিত করিবেন। এই ক্রম অনুযায়ী ২১২ বৎসরে সমগ্র বৃটিশ ভারত বোর্ডের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

বোর্ডের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থ—এই ছয়টি প্রধান বিভাগ থাকিবে। এক এক জন সদস্য এক একটি বিভাগের ভার গ্রহণ

করিবেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্প তৎ তৎ বিষয়ের বিশেষজ্ঞবৃন্দের নিয়ন্ত্রনাধীনে পরিচালিত হইবে। বাণিজ্য বিভাগের কার্য্য হইবে, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই স্থানীয় উৎপন্ন-দ্রব্যের কেনা-বেচাতে উৎসাহ প্রদান করতঃ স্থানীয় অন্তর্বাণিজ্য দ্বারা সর্ব্বতোভাবে স্থানীয় লোকের পরিপোষণ বিধান করা। আর অর্থ বিভাগের কার্য্য হইবে, অর্থ সংগ্রহ এবং অর্থের বিলিব্যবস্থা করা।

স্বাবলম্বন

বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রায় সকল দেশেই অবাধ বাণিজ্যনীতির প্রসার ছিল, যুদ্ধের পরে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে সকল দেশই স্বাবলম্বী হইবার জন্য নানাপ্রকারে চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষকেও একটি স্বাবলম্বী দেশ রূপে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের চতুঃসীমার প্রান্তরেখায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তদ্রূপ প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করিলে ভারতের বিশালতা হেতু তাহার স্থান-বিশেষ প্রাচুর্য্যে পরিস্ফীত এবং স্থান-বিশেষ অপ্রাচুর্য্যে অবনমিত হইবার সম্ভাবনা জন্মিবে। অধিকন্তু যে মূলনীতি দ্বারা মানবজীবন পরিচালিত হয়, সেই নীতির সহিত তাহার সংঘাত বাঁধিবে। প্রকৃতি প্রতিটি মানুষকেই প্রতিটি মানুষের স্বপরিবর্দ্ধনে অভিন্যস্ত করিয়াছেন। এই স্বপরিবর্দ্ধনের একটি অঙ্গ স্বাবলম্বন। সুতরাং মানব জীবন পরিচালনার মূলে যে নীতি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার একটি নির্দ্দেশ হইল ইহাই যে, প্রতিটি মানুষ প্রতিটি মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু যথাসম্ভবরূপে নিজেই উৎপাদন করিয়া স্বাবলম্বী হইবে। প্রকারান্তরে তাহার অর্থ ইহাই যে, প্রতিটি মহকুমা, প্রতিটি জিলা যথাসম্ভব রূপে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইবে। সুতরাং ঢাকা ও ছাপ্রা জিলা যদি ডেভেলপ্মেন্ট-বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে সেই সেই জিলাবাসীদের বাঁচা-বৃদ্ধির শ্লোগান হইবে, Bye Dacca, Bye Chhapra,—ঢাকার উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করুন, ছাপ্রার উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করুন। অবশ্য যে দ্রব্য যে জিলায় উৎপন্ন হয় না বা বেশী উৎপন্ন হয়, সেই জিলায় সেই দ্রব্যের আমদানী বা রপ্তানীতে

কোন বাধা থাকিবে না। এই প্রকার আমদানী ও রপ্তানী যখন ভারতের সীমা ছাড়াইয়া যাইবে, তখনই তাহা ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

যে সমস্ত জিলা বোর্ডের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইবে, বোর্ড চারি বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরে সেই সকল জিলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য প্রতি দফায় ২ লক্ষ টাকা হিসাবে মোট ৮ লক্ষ টাকা সাহায্য করিবেন। কিন্তু পঞ্চম বৎসর হইতে তৎ তৎ বিষয়ের তৎ তৎ পরিমাণ ব্যয়ভার জিলাসমূহকেই বহন করিতে হইবে। অর্থাৎ বোর্ড হইতে চারি বৎসরে ক্রমে ৩২ লক্ষ টাকা সাহায্য প্রাপ্তির ফলে উপার্জ্জন-ক্ষমতা কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করতঃ এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চারিত্র্যগুণে কিঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করতঃ আরও বৃদ্ধি ও উন্নতি লাভের জন্য পঞ্চম বৎসর হইতে প্রতি বৎসরে সেই সেই জিলাসমূহ ৮ লক্ষ টাকা বোর্ডের হস্তে প্রদান করিবেন। কার্য্যতঃ বোর্ডকেই তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রয়োগ করিয়া বোর্ডের প্রতি জিলার পরিপোষণ-ব্যয় প্রতি জিলা হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে সত্য, কিন্তু জিলা-বিশেষের উন্নয়নপ্রয়াসশীলতা এবং তদানুপাতিক ব্যয়ভার বহন সমর্থতা কতখানি আছে, পূর্ব্বেই বোর্ডকে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশের গভর্ণমেণ্টসমূহ দেশের উন্নতি বিধানের জন্য জনগণের মধ্যে লক্ষ-কোটী মুদ্রা ঢালিয়া থাকেন। অল ইণ্ডিয়া ডেভেলপ্‌মেণ্ট বোর্ডের প্রতি জিলাকে চতুর্বার্ষিকী সাহায্যস্বরূপ ৩২ লক্ষ টাকা প্রদান করার মূলে ঐ নীতিই নিহিত থাকিবে। বলা আবশ্যক যে, পঞ্চম বৎসর হইতে প্রতি জিলার সংগৃহীত অর্থ দ্বারা প্রতি জিলার হিসাবে যে স্বতন্ত্র তহবিল সৃষ্টি করা হইবে, তাহা হইতে বোর্ডের কেন্দ্রীয় আফিস পরিচালনার ব্যয় বাবত কোন অর্থ গ্রহণ করা হইবে না।

বোর্ড জিলাসমূহকে কি প্রকারে সাহায্য করিবেন

প্রথম বৎসরের ব্যয় প্রতি জিলায় ৮ লক্ষ টাকা হিসাবে ১১টি জিলার জন্য ৮৮ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় বৎসরে ২২টি জিলার জন্য ১৭৬ লক্ষ টাকা। তৃতীয় বৎসরে ৩৩টি জিলার জন্য ২৬৪ লক্ষ টাকা। চতুর্থ বৎসরে ৪৪টি জিলার জন্য ৩৫২ লক্ষ টাকা। পঞ্চম বৎসর হইতে বোর্ডের আর ব্যয় বৃদ্ধি হইবে না। পঞ্চম

বোর্ডের সাহায্য ব্যয়ের হিসাব

বৎসর হইতে প্রতি বৎসরে নূতন ১১টি জিলা বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হইবে সত্য, কিন্তু সেই বৎসর হইতে বোর্ড পুরাতন প্রতি ১১টি জিলার ব্যয় ভার বহন হইতেও রেহাই পাইতে থাকিবেন। চতুর্থ বর্ষ হইতে একবিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত বোর্ডকে প্রতি বৎসরে ৩৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে। তাহার পরবর্ত্তী ৪ বৎসরে ঐ ব্যয় বৎসরে ৮৮ লক্ষ টাকা হিসাবে ক্রমে হ্রাস পাইয়া পঞ্চবিংশ বৎসরে বোর্ডের জিলা সাহায্য-ব্যয় একেবারেই হ্রাস পাইবে। বোর্ডের কার্য্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় আফিসের পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। তাহা উপরিউক্ত হিসাবের বহির্ভূত হইলেও ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, বাৎসরিক ৫ কোটি টাকার চলতি আয়ের সংস্থান হইলেই বোর্ড কার্য্য পরিচালনা করিতে পারিবেন।

সম্রাটের যক্ষ্মা নিবারণী তহবিলে ৬০ লক্ষ টাকার মত দান পাওয়া গিয়াছে। কোয়েটা ভূমিকম্প এবং বিহারের ভূমিকম্প সাহায্য ভাণ্ডারেও লক্ষ লক্ষ টাকা দান পাওয়া গিয়াছিল। ধনকুবের রকফেলারের দানের ফলে ভারতে কয়েকটি কল্যাণ-কর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়া পরিচালিত হইতেছে।

অর্থের সচলতা

বেলুড়ে মন্দির নির্ম্মাণের জন্য আমেরিকার দুইজন মহিলা ২ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। খৃষ্টীয় মিশনারিগণ পরিচালিত ভারতের বহু কুষ্ঠাশ্রমের ব্যয় ইংলণ্ডের জনসাধারণ বহন করেন। বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধে ভারতবর্ষ ঋণ করিয়াও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে ১৭০ কোটি টাকা দান করিয়াছিল। চীনের

যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতের দান প্রেরিত হইয়াছে। স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্রেও ভারতের দান প্রেরিত হইয়াছে। কংগ্রেসের তিলক-স্বরাজ্য-ভাণ্ডারে ১ কোটী টাকা দান পাওয়া গিয়াছিল। দেশের বিভিন্ন জনহিতকর কার্য্যে রায় স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ বাহাদুরের দান ১ কোটী টাকা অতিক্রম করিয়াছে। বিড়লা ব্রাদার্স আসামের অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধানের জন্য আসাম গভর্ণমেণ্টকে ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি। বাঙ্গালী ও বিহারীদের মধ্যে সম্প্রীতি সাধনের জন্য আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর লক্ষাধিক টাকা দানের কথা আমরা জানি। যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট তৎপ্রদেশের অশিক্ষা দূরীকরণ সাহায্য-ভাণ্ডারে ২৲ টাকা হিসাবে জনসাধারণের নিকট দান প্রার্থনা করিয়াছেন। এই জাতীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, অর্থ অচল নহে, জাতিভেদ এবং দেশভেদের ঊর্দ্ধেও ইহা সচল এবং ইহাও প্রমাণিত হয় যে, ভারতে যে নিত্য দুর্ভিক্ষ এবং মৃত্যুর সহিত নিত্য লড়াই চলিতেছে, সে ক্ষেত্রেও ইহা তাহার সচলতা বজায় রাখিবে।

প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা চাই

ভারতের নেতৃবৃন্দ ভারতে এবং ভারতের বাহিরে অর্থের জন্য আবেদন করিবেন। বৎসরে ৫ কোটী টাকার চল্‌তি দান সংগ্রহ করা চাই। পৃথিবীতে এইরূপ ধনকুবের ব্যক্তি আছেন, যিনি এককভাবে বোর্ডের কার্য্য সুপরিচালিত করিতে পারেন। ব্যক্তি-বিশেষের এই সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চক্ষুর উপর ন্যস্ত রাখিয়া সমষ্টির অনুকম্পাকে উদ্রিক্ত করতঃ সমষ্টি হইতে বৎসরে ৫ কোটী টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব হইবে না। ইহা বলা আবশ্যক যে, অর্থশালীর নিকট অর্থ থাকিলেই হয় না, তাহা আদায় করিবার মত নৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন, অ-সাধারণ রকমের ব্যক্তিও চাই এবং তেমন মহৎ ব্যক্তি ভারতে একাধিক বর্ত্তমান আছেন।

কে কি ভাবে বোর্ডকে সাহায্য করিতে পারেন

ভারত গভর্ণমেণ্ট, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহ, অর্দ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, ভারতের জনসাধারণ, ভারতেতর দেশের মহৎপ্রাণ ব্যক্তিগণ বোর্ডকে সাহায্য করিতে পারেন।

পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯৩৫ এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহকে এক কোটী টাকা হিসাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর বোর্ডকে ততোহধিক অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতে পারেন। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহ অর্থ-সাহায্য ব্যতীত বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত জিলাসমূহের স্বাবলম্বন-শক্তি-অর্জ্জন-মূলে আইনগত সহায়তা প্রদান করিতে পারেন। জিলা বোর্ড এবং মুন্সিপালিটিসমূহ বোর্ডকে সাহায্য করিতে পারেন।

ভারতের প্রতিটি বয়স্ক ও উপার্জ্জনশীল ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তি, কুটীর ও মাধ্যমিক শিল্পজীবী, জমির উপস্বত্বভোগী, চাকুরিয়া, কৃষিজীবী এবং শ্রমজীবী। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে যাহারা সংলিপ্ত, যথা—ঔষধ-ব্যবসায়ী, বস্ত্র-ব্যবসায়ী, কাগজ ও পুস্তক ব্যবসায়ী, লৌহাদি ধাতব দ্রব্যের ব্যবসায়ী, কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনীয়ার, কনট্রাক্টর, চিকিৎসক, আইনজীবী, সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী প্রভৃতি এবং বিভিন্ন প্রকার কুটীর ও মাধ্যমিক শিল্পে যাহারা নিযুক্ত আছেন, তাহারা এককালীন এবং বার্ষিক সাহায্য করিতে পারেন। জমিদার-তালুকদার-শ্রেণী প্রতি বৎসরে এবং চাকুরিয়া প্রতি মাসের উপার্জ্জনের এক অংশ দ্বারা প্রতি মাসে বোর্ডকে সাহায্য করিতে পারেন। কৃষিজীবী ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতি বৎসর সাহায্য করিতে পারেন। শ্রমজীবী তাহার অবসরকালীন শ্রম দ্বারা বোর্ডকে সাহায্য করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় কোম্পানী আইনে রেজেষ্টারীকৃত, আয়কর প্রদানশীল প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ম্মকর্ত্তৃগণ যাঁহাদের প্রতিষ্ঠানসমূহের বাৎসরিক লভ্যাংশের পরিমাণ ৩০ কোটী টাকার

উর্দ্ধে হইবে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানসমূহের মর্য্যাদা এবং আর্থিক সঙ্গতির অনুপাতে বোর্ডকে এককালীন এবং প্রতি বৎসরে বিপুল পরিমাণে সাহায্য করিতে পারেন। পুস্তক ব্যবসায়ী এবং সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী শিক্ষার প্রসারে বোর্ডকে সাহায্য করিলে পরিণামে তাহাদের পুস্তক এবং পত্রিকার বিক্রয়-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। কৃষিজাতদ্রব্য ব্যবসায়ী শিল্পের প্রসারে বোর্ডকে সাহায্য করিয়া জনসাধারণের ক্রয়শক্তি বর্দ্ধিত করিলে তাহাদের কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপে যিনি যেরূপেই বোর্ডকে সাহায্য করিবেন, তিনিই তাহার প্রতিদান লাভ করিবেন। বোর্ডের কার্য্য বিভিন্ন সীমাবদ্ধ স্থানে আবদ্ধ থাকিয়া ক্রম-প্রসারণশীল হইবে বলিয়া তাহাদের দান সমুদ্রে শিশির-বিন্দু নিক্ষেপ করার মত হইবে না। তাহাদের দানের ফলে ঐ ঐ স্থানের জনসাধারণ তাহাদের চক্ষুর উপরেই পুষ্টি লাভ করিয়া তাজা হইয়া উঠিবে এবং সেই পুষ্টি তাহাদেরই আত্মপুষ্টিতে যাইয়া রূপান্তরিত হইবে, তাহাদের দানশক্তি ক্রমে আরও বাড়িয়া যাইবে অর্থাৎ ক্রমেই তাহারা আরও ধনী হইতে থাকিবেন।

ভারতেতর দেশের যে সকল মহৎপ্রাণ ব্যক্তি ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুরাগী, যাঁহারা ভারতকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন এবং শ্রদ্ধা করেন, তাঁহারা বোর্ডকে মাসিক অথবা বার্ষিক সহায়তা করিয়া ভারতের আপামরজনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারেন। পাশ্চাত্য দেশের ভ্রমণকারিগণের মধ্যে অনেকেই এদেশে পরিভ্রমণ করিতে আসিয়া ভারতবাসীর দুর্ব্বহ দারিদ্র্য দর্শনে ক্লেশ অনুভব করিয়াছেন। তাঁহারা বোর্ডের কার্য্যে সহায়তা করিয়া নিজেদের ক্লেশের অপনোদন করিতে পারেন।

কার্য্য পরিচালনায় মিতব্যয়িতা

বোর্ডের কেন্দ্রীয় আফিসের অধীনে প্রাদেশিক আফিস, প্রাদেশিক আফিসের অধীনে জিলা আফিস এবং জিলা আফিসের অধীনে মহকুমা আফিস থাকিবে। কেন্দ্রীয় এবং অপর তিন শ্রেণীর আফিসের পরিচালনা কার্য্যে বোর্ডের যে ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যাযুক্ত বিপুল কর্ম্মিদল থাকিবে, তাহারা

সকলেই মাসিক মাহিনা পাইবেন। মাহিনার হার ন্যূনতম ২০৲ টাকা এবং ঊর্দ্ধতম ২৫০৲ টাকা হইবে। বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণের মাহিনা সম্বন্ধে এই হারের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে। বোর্ডের যে কোন কর্ম্মী তাহার মাসিক মাহিনার একাংশ বা সর্ব্বাংশ বোর্ডে দান করিতে পারিবেন। ইহা বলা আবশ্যক যে, কেন্দ্রীয় আফিসের কর্ম্মিবৃন্দ ব্যতীত অপরাপর আফিসের কর্ম্মিবৃন্দ সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় লোক হইবেন।

ধনবান্ পিতার পুত্র সহসা গরীব হইয়া পড়িলে যেরূপ তাহার পুরাতন, জীর্ণশীর্ণ বাড়ীঘর সংস্কার করিতে আপন জনের সহায়তায় যথাসম্ভবরূপে নিজেই সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী হয়, বোর্ডের কর্ম্মিবৃন্দও সেইরূপ স্থানীয় শিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, চাষী, মজুর প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের কায়িক পরিশ্রমের সাহচর্য্যে স্থানীয়, কায়িক শ্রমমূলক কার্য্যাদি যথা—কচুরিপানা উত্তোলন, হাজামজা খাল বা নদীর সংস্কার, জমিতে সেচকার্য্যের জন্য খাল খনন, বন্যা প্রতিরোধ করিবার জন্য বাঁধ নির্ম্মাণ, নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ বা পুরাতন রাস্তার সংস্কার, পতিত জমির উদ্ধার ইত্যাদি বিশেষজ্ঞের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিয়া যথাসম্ভবরূপে নিজেরাই সম্পাদন করিবেন।

পার্লামেণ্ট ও ক্যাবিনেট

সর্ব্বদলীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি-সভার নিকট বোর্ডের কার্য্যকরী সমিতি প্রথম দুই বৎসর দায়ী থাকিবেন। তৃতীয় বৎসর হইতে যে প্রদেশের যাহারা এক শত বা ততোধিক অর্থ বোর্ডে প্রতি বৎসর দান করিবেন, তাহারাই প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ভোটাধিকার লাভ করিয়া প্রদেশের লোক সংখ্যার অনুপাতে বোর্ডের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন। এই নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ বোর্ডের পার্লামেণ্টের সদস্যপদ লাভ করিবেন। পার্লামেণ্টের সদস্যগণ বোর্ডের ক্যাবিনেট গঠন করিবেন এবং ক্যাবিনেট মন্ত্রিগণ বিভিন্ন বিষয়ের ভার গ্রহণ করিবেন। পার্লামেণ্ট ও ক্যাবিনেট গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত প্রতিনিধিসভা এবং কার্য্যকরী সমিতি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। কার্য্যকরী সমিতির সভ্যবৃন্দ পার্লামেণ্টের সদস্যপদ নির্ব্বাচনে দণ্ডায়মান হইতে পারিবেন। তিন বৎসর পর পর পার্লামেণ্টের সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে।

প্রতি জিলায় অর্থ বণ্টন জিলার লোক সংখ্যার অনুপাতে হইবে।

প্রসারণ

বলা হইয়াছে, বোর্ড প্রতি জিলাকে বৎসরে ৮ লক্ষ টাকা হিসাবে চারি বৎসরে ৩২ লক্ষ টাকা সাহায্য করিবেন। তাহা হইলে বোর্ড ২৩৮টি জিলাতে ৭৬১৬ লক্ষ টাকা সাহায্য করিবেন। যখন বোর্ডের জিলা-সাহায্য-ব্যয় থাকিবে না, তখন দেখা যাইবে যে, প্রতিটি জিলা প্রতি বৎসরের দেয় অর্থ বোর্ডের নিকট প্রদান করিয়া বোর্ডের মধ্যস্থতায় নিজেদের সমষ্টিগত সংরক্ষণ ও পরিপোষণ কার্য্যের কতকাংশ নিজেরাই সুনির্ব্বাহ করিতেছেন। এই সংরক্ষণ ও পরিপোষণ কার্য্যের পরিধি গোড়া হইতেই অথবা সুযোগ সুবিধা অনুসারে যে কোন সময় হইতেই যাহাতে ক্রমবর্দ্ধনশীলতা লইয়া চলিতে পারে, তৎপ্রতি বোর্ড সর্ব্বসময়ে সুতীক্ষ্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ রাখিবেন এবং তাহার উপায় বাহির করিবার প্রয়াস করিবেন।

ডেভেলপ্‌মেণ্ট বোর্ড ও গভর্ণমেণ্ট

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহের আইন-পরিষদাদির নির্ব্বাচনে বোর্ড প্রার্থী দণ্ডায়মান করিবেন এবং তাহাদের সাফল্য লাভে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবেন। এই প্রকারে বোর্ড আইনানুগ উপায়ে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের পরিচালন-ক্ষমতা দখল করিবার প্রয়াস করিবেন। এই প্রয়াসের সাফল্যের অনুপাতে বা সাফল্যের চরমে অল-ইণ্ডিয়া-বোর্ড-অব-ডেভেলপ্‌মেণ্টের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সার্থকতা যদি হ্রাস পায় বা না থাকে, তবে তাহার অর্থ ইহাই হইবে যে, দেশবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানে এবং দেশের শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির ক্রমোন্নতি বিধানের অন্তরালেও তাহাদের যে স্বাস্থ্যের অমৃতধারা লুক্কায়িত আছে, তাহার বিকাশ সাধনে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহ সবিশেষ মনোযোগী হইয়া কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ঐ পন্থা যত দিন পর্য্যন্ত প্রকৃষ্টরূপে অবলম্বিত না হইতেছে অর্থাৎ যত দিন পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের শাসন-যন্ত্রের

উপর আমরা সার্ব্বভৌম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিতেছি, তত দিন পর্য্যন্ত আমাদের পরিকল্পিত বোর্ড জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া মুমূর্ষু জাতিকে রক্ষা করিয়া সকল দিক দিয়া স্বাস্থ্যবান্ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

(৩)

বিগত ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের খৃষ্টোৎসব উপলক্ষে 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল :—

"মানুষ সভ্যতার গর্ব্ব করে; কিন্তু যে দশ হাজার বৎসরের ইতিহাস আমরা পাই, তাহার মধ্যে মানব-সভ্যতার কি পরিচয় আছে? দুই এক জন বুদ্ধ, খৃষ্ট, শঙ্কর, চৈতন্য, কন্‌ফুসিয়াস, রামকৃষ্ণ আসিয়া তাহাকে মনুষ্যত্বের বাণী শুনাইয়াছেন বটে, কিন্তু মানুষের জীবনে ঐসব উচ্চ আদর্শ কোন রেখাপাত করিতে পারে নাই। তাই, দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে আদিম মনুষ্য পর্ব্বত, অরণ্য, মরুভূমিতে যেরূপ হানাহানি, কাড়াকাড়ি করিত, আজও তথাকথিত সভ্য মানব সেইরূপই করিতেছে। প্রভেদের মধ্যে আদিম বর্ব্বর মানবের পরস্পরের সঙ্গে হানাহানি করিবার অস্ত্র ছিল প্রস্তরখণ্ড বা বৃক্ষশাখা, আর সভ্যজগতের অস্ত্রসম্পদ বাড়িয়াছে—বন্দুক, কামান, বোমা তাহার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে।"

মানবীয়-সভ্যতার যে গলিত নিঃস্রাবের কাহিনী শক্তিশালী লেখনী মুখে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে অতিরঞ্জন নাই। যুগে যুগে যুগ-মানবগণ আসিয়া আমাদিগকে মালিন্য-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করতঃ আমাদের সত্য-স্বরূপের পথে চলৎশীল করিবার জন্য কত প্রকারেই না প্রয়াস করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদের প্রয়াসকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিলাম কৈ? এই না-পারার অবস্থাটা আমাদিগকে ইহা অতি নিষ্ঠুরভাবে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, দেহের চর্ম্মমাংসমেদে আমাদের যে স্বাস্থ্য লীলায়িত হইয়া উঠে বলিয়া আমরা গর্ব্বিত ও

পুলকিত হই, তাহাই আমাদের সমগ্র সত্তার স্বাস্থ্যের অভিব্যঞ্জক নহে,—তাহার অন্তরালে রহিয়াছে, আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য, আত্মার বিকাশমানতা। ক্লেদময় শৈবালদল সরোবরের স্বচ্ছ জলরাশির উপর ঘন আস্তরণ পাতিয়া জলের স্বচ্ছতাকে যেরূপ ঢাকিয়া ফেলে, সেইরূপ আমাদের জন্মপরম্পরানুক্রমিক কর্ম্মের বিচিত্র সংস্কার আমাদের মন ও আত্মার শুভ্রতাকে আবরিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহাকে সরাইতে না পারিলে আমাদের আত্ম-প্রদীপ্তি কখনও বিকাশলাভ করিতে পারিবে না।

পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিকগণ অনমনীয় অধ্যবসায়ের সহিত দ্রুতপদে চলিয়াছেন, দুরূহ পথ বাহিয়া অন্তর্লোকের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেও তাহার তরঙ্গলহরী আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যাঁহারা বিজ্ঞানের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ, তাঁহাদিগকে যথোচিত নতি ও সম্মান সহকারে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া ইহা লিখিতেছি যে, বিজ্ঞানের উদ্দীপনাময় স্পর্শ আমরাও লাভ করিয়াছি, আমরা অবৈজ্ঞানিক নহি। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ যান্ত্রিক অভিজ্ঞানে পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানবিদ্‌গণের যে বাণীর রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইতেছেন না, আমরা সেই বাণীকে অ-বিজ্ঞানোদ্ভূত বলিতে পারি না। ঋষি-বৈজ্ঞানিক ছান্দোগ্যোপনিষদে তাঁহার অমর লেখনীর রেখাপাতে লিখিয়া গিয়াছেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—ব্রহ্মই সর্ব্বত্র পরিবিরাজমান। "স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বং"—তিনিই অধে, তিনিই ঊর্দ্ধে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে, সর্ব্ববস্তুতেই তিনি। "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ং"—আদিতে এক অদ্বিতীয় সৎই বিদ্যমান ছিলেন, আর কিছু ছিল না। এই বাণী যে শুদ্ধ চৈতন্যলোকের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে, তাহার কোটী যোজন দূরে হউক বা সীমার অতিক্রমণেই হউক, যে লোকে আমরা অধিবাস করিতেছি, তাহা কি সেই লোকেরই স্থূল প্রকাশোদ্ভূত রূপরসগন্ধময়তার একটী প্রতিরূপ নয়? প্রতিরূপ বলিয়াই

নোবেল লরিয়েট ডক্টর কম্‌টন বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "Modern physics gives place to God"—আধুনিক পদার্থবিদ্যা একেকেই অর্থাৎ আদিরূপকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষী। প্রতিরূপ বলিয়াই এডিংটন বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, "Materialism, in its literal sense, is long since dead"—বস্তুবাদ বহুকাল পূর্ব্বে মৃত্যুর কোলে সমাধি লাভ করিয়াছে। প্রতিরূপ বলিয়াই রাদারফোর্ড ইলেক্ট্রণের আবিষ্কার সংসাধন করিয়া গৌরব গর্জ্জনে ঘোষণা করিলেন, নাই নাই, কোথাও বস্তু নাই, আছে মাত্র বিদ্যুৎ বিসর্পণ (radiation)। বৃহদারণ্যকোপনিষদের ঋষি কি বলেন নাই,—"বিদ্যাদ্ ব্রহ্মেত্যাহুঃ"—ব্রহ্মকে বিদ্যুৎ বলা হয় ? অর্থাৎ ব্রহ্ম ক্রম-বিকাশমান অবস্থার এক সুদূরবর্ত্তী পটে বিদ্যুৎ-ঘনরূপেও প্রকাশিত ? সুতরাং ইহা একটী সত্য সিদ্ধান্ত যে, আমরা প্রতি মানুষ ব্রহ্মও বটে, ভাবঘন প্রতীকও বটে, বিদ্যুৎ বা চিৎস্পন্দন সমষ্টিও বটে।

কালপ্রবাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আমরা আমাদের এই ব্রহ্মত্ব বা চিৎস্পন্দনসত্তাকে সংস্কারের আবরণ দ্বারা আবৃত করিয়া ফেলিয়াছি, তাহা বুঝিতে হইলে আদি-প্রাণঃ হইতে আমাদের ক্রমাবতরণ চিত্রটি একবার অঙ্কিত করিয়া দেখা প্রয়োজন। চিত্রটি এইরূপ :—
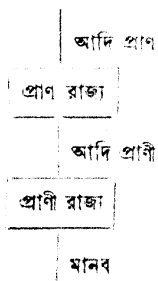
আমরা আদি-প্রাণ হইতে নির্গত হইয়া, প্রাণ-রাজ্য উৎক্রমণ করিয়া আদি-প্রাণীতে (protoplasm) পর্য্যবসিত হইয়া প্রাণী-রাজ্যের প্রান্তস্থিত পিথ্‌কেন্‌থ্রপাস, হিডেলবার্গ, ক্রোমাগনন প্রভৃতি মানবস্তরের ক্রম-বিকাশমানতার ভিতর দিয়া পূর্ণ মানব পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছি; অর্থাৎ যে বিরাট কালপ্রবাহকে আমরা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহারই ক্রোড়ে পরিপালিত হইয়া আমরা যে অগণিত সংস্কার (কর্ম্মের ছাপ) আহরণ করিয়াছি, তাহাই রূপঘন হইয়া অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে এবং অধিকতর রূপে অভিব্যক্তিশীল হইয়া চলিয়াছে যে জীবত্বের পর্য্যায়ে, আমরা সেই পর্য্যায়ভুক্ত পূর্ণ মানব। সহজ কথায় আদি-প্রাণ হইতে নির্গত, প্রাণ-রাজ্য ও প্রাণী-রাজ্য উৎক্রান্ত প্রতিটি মানুষ আমরা প্রতিটি মানুষের জন্মজন্মানুক্রমিক চিন্তা ও কর্ম্মোদ্ভূত অগণিত সংস্কারের সমষ্টিভূতরূপের এক একটী চলমান, জীবন্ত প্রতীক। আমাদের প্রত্যক্ষতা সম্বন্ধে ইহাই যদি সত্য হয়, তবে ইহা স্বতঃই প্রমাণীকৃত হয় যে, সেই স্তূপীকৃত সংস্কার বা কর্ম্মের ছাপকে আমাদের মস্তিষ্ক-কোষ হইতে যত অধিক পরিমাণে অপসারিত করা সম্ভবপর হইবে, তত অধিক পরিমাণে আমাদের চৈতন্যসত্তা আত্মপ্রকাশশীল হইবে।

ঐ সংস্কার বা কর্ম্মের ছাপকে দূর করিবার উপায় কি? শুধু মাত্র মনোবল প্রয়োগ করিয়া তৎপ্রয়াসে আত্মনিয়োগ করিলে আমাদের প্রয়াস ব্যর্থতায় সমালঙ্কৃত হইবে। বাহির হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে আমরা যে সংঘাত লাভ করিতেছি, তাহার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় আমাদের চিৎশক্তিতে যে কম্পন জাগে, সেই কম্পনের পারম্পর্য্যানুক্রমিক চলনই মন। মন যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হয়, তবে তাহার সর্ব্বশক্তিমত্তা তাহাতেই নিঃশেষ হইয়া যায়।

আধুনিক বলিয়া যে ভাবধারা বর্ত্তমান যুগে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে, সেই ভাবধারায় যাঁহারা অনুপ্রাণিত, তাঁহাদিগকে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের অনুদার দৃষ্টি নিক্ষেপকে সংবরণ করিবার আবেদন জানাইয়া এবং যে চিরন্তন সত্য বিভূষিত আর্য্যবাদের লোহিত রক্তে আমাদের উদ্ভব, তাহার শৌর্য্য বীর্য্যমর্য্যাদাকে

প্রবীণ প্রণিপাতে স্মরণ-মনন করিয়া ইহা বলিতেছি যে, আদি-প্রাণ শব্দ রূপে প্রকাশিত হইয়া যে অনাহত শব্দ-ধারায় আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, পর্ব্বত নির্গলিত স্রোতস্বতীর এক একটা বাঁকে যেরূপ এক এক প্রকার ঊর্ম্মিগুঞ্জন প্রকাশ পায়, যাহা তদ্রূপ আমাদের সত্তার সূক্ষ্ম হইতে স্থূলানুক্রমিক এক একটা বাঁকে বা স্তরে এক এক প্রকার গুঞ্জন লইয়া ধ্বনিত হইতেছে, এক মাত্র সেই অনাহত শব্দ দ্বারাই আমাদের মস্তিষ্ক-কোষ-নিহিত সংস্কারের লয় সাধন সম্ভব। বস্তু বা ভাব বিনাশ পায় না, রূপান্তরিত হয়, ইহাই আমরা জানি ; কিন্তু আমরা ইহা অনেকেই জানি না যে, বস্তু বা ভাব উৎপত্তি লাভ করে যে যে শব্দ-কেন্দ্রে, সেই সেই শব্দ-কেন্দ্র তৎ তৎ বস্তু বা ভাবের লয় সাধন করিতে পারে। আমাদের সত্তানিহিত সেই শব্দ-ধারার পারম্পর্য্যানু ক্রমিকতা এইরূপ :—
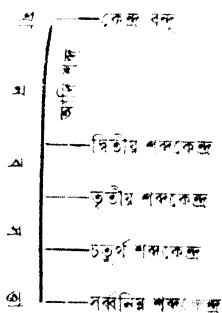
যিনি বা যাঁহারা যথাক্রমে চতুর্থ, তৃতীয় ও দ্বিতীয় শব্দ-কেন্দ্রে অধিগমন করিয়াছেন, তিনি বা তাঁহারা অপর সমুদয় লোকের তৎতৎ কেন্দ্রের নিম্নস্থান জাত কর্ম্মের ছাপ দূর করিতে পারেন। যিনি আদি শব্দে অধিগমন করিয়াছেন, তিনি সর্ব্ব সংস্কার বা সকল কর্ম্মের ছাপ দূর করিতে সক্ষম। স্বর্ণের মালিন্য দূর করার ন্যায় আমাদের চৈতন্যসত্তার গাত্রে যে মালিন্য

সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা দূর করিয়া পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে ক্রমোৎকর্ষমুখর পরিশুদ্ধ ভাব প্রবাহিত করিতে হইলে—নীতিজ্ঞান, মানসিক স্বাস্থ্য, অহিংসা, মানবপ্রেম ও আত্মার বিকাশমানতা লাভ করিয়া ধনজন-সাম্রাজ্য-জোতজমিস্বরূপ স্বর্ণ লাভের জন্য জগৎ ব্যাপিয়া প্রতি মানুষের সহিত প্রতি মানুষের যে হানাহানি ও কাড়াকাড়ি চলিতেছে, তাহা দূরীভূত করিতে হইলে এই শব্দ রূপ সত্যের আশ্রয় ভিন্ন অন্য কোন পথ নাই।

আমেরিকার সুবিখ্যাত পদার্থবিৎ জর্জ্জ হ্যারিসনের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। উক্তিটি এই :—"Digging for truth has always proved not only more interesting but more profitable than digging for gold. If urged on by the love for digging, one digs deeper than if *searching for some particular nugget and much gold is* usually produced eventually as a byproduct."

তাৎপর্য্য—সত্যের অনুসন্ধান শুধু কৌতূহলোদ্দীপক নহে, স্বর্ণের অনুসন্ধান অপেক্ষা লাভজনকও বটে ; কোন বিশেষ বস্তুর অনুসন্ধানের পরিবর্ত্তে যদি প্রাণের ঐকান্তিক চাহিদায় সমৃদ্ধ হইয়া সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তবে তাহা গভীরতর হয় এবং তাহার ফলে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ উপজাত দ্রব্যরূপে অভিলব্ধ হইয়া থাকে।

ব্যবসায়ের গোড়ার কথা

(১)

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি।
তদৰ্দ্ধং রাজ-সেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ॥"

—ইহা বণিক ভারতবর্ষেরই মর্ম্মবাণী। কিন্তু ভারতবাসীর কর্ম্ম-বৈগুণ্যে বর্ত্তমান যুগে বাণিজ্য-লক্ষ্মী ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপ-আমেরিকায় যাইয়া তাঁহার সুবর্ণ সিংহাসন পাতিয়াছেন। আমরা আড়ম্বর সহকারে লক্ষ্মী-দেবীর অর্চ্চনা করি, ব্রত করি, লক্ষ্মীর কৌটায় পয়সা রাখি, কিন্তু তাঁহার কল্যাণ-নিঃস্রাবে অভিসিঞ্চিত হইতে পারি না। কংগ্রেস সংগঠনের পূর্ব্বে মনোমোহন বসু সখেদে লিখিয়াছিলেন—

"তাঁতী কর্ম্মকার করে হাহাকার,
সূতা যাতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার।
সূচ সূতা কাঁটা আসে তুঙ্গ হতে,
দেশলাই কাঠি তাও আসে পোতে!
প্রদীপটি জ্বালিতে খেতে শুতে যেতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন!"

দেশের তৎকালীন অবস্থা অর্দ্ধশতাব্দী পরেও কিছুমাত্র বদলায় নাই। এদেশে দেশলাই কাঠির আমদানীর হিসাব এইরূপ:—

বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে প্রতি বৎসর গড়ে ৮৮ লক্ষ টাকার অধিক। মহাযুদ্ধের সময় প্রতি বৎসর গড়ে ১৫৩ লক্ষ টাকার অধিক। মহাযুদ্ধের পর হইতে গড়ে ১৭৬ লক্ষ টাকার অধিক।

বোম্বাই-আহ্‌মদাবাদের কটন মিলের মালিকগণ বাংলাদেশে বস্ত্র পরিবেশন না করিলে বাঙ্গালীর লজ্জা নিবারণ হয় না—ইহা বঙ্গবাসীর এক মর্ম্মান্তিক

দুরবস্থার পরিজ্ঞাপক! ঐতিহাসিকগণ বলেন, কোম্পানীর আমলে এবং তাহারও পূর্ব্বে বাংলা বস্ত্রের জন্য পৃথিবী-বিখ্যাত ছিল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দেও একমাত্র ঢাকা জিলা হইতেই ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের মস্‌লিন ইংলণ্ডে রপ্তানী হইয়াছিল। কিন্তু ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এই রপ্তানী একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার 'নয়া বাংলার গোড়া পত্তন' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা ইত্যাদি মুল্লুকে গবেষণা-ভবন, অনুসন্ধানালয়, পরীক্ষাগৃহ ইত্যাদি নামের জ্ঞান-বিজ্ঞানকেন্দ্র বিপুল আকারে মাথা তুলিয়াছে। ঐগুলির কোন কোনটা ঠিক যেন এক একটা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মূর্ত্তি গ্রহণ করিতেছে। কয়লা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, চামড়া, চিনি, কাচ, দুধ, তুলা, রেশম ইত্যাদি প্রত্যেক বস্তু লইয়াই অতি উঁচুদরের লেবরেটরি, কর্ম্মশালা বা পরীক্ষাকেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছে।"

ব্যবসায়-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের মূলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার যে অপরিহার্য্য প্রয়োজন আছে, ইহা বুঝিয়া আমরা নিরলসভাবে তৎ-গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতঃ আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের বলিষ্ঠতা সাধনে তৎপর হইব কবে!

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেন, "আজকাল দেখা যায়, শিল্প-বাণিজ্য শিখিবার জন্য শত শত যুবক ইউরোপ, জাপান ও আমেরিকায় ছুটিতেছেন। তাহারা শিক্ষিতব্য বিষয়ে যতদূর পারেন, জ্ঞান লাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া হতাশ হইয়া বেড়াইতেছেন। তুমি বস্ত্র রঞ্জনই (dyeing) শেখ, বৈদ্যুতিক পূর্ত্তকার্য্যই (electrical engineering) শেখ, কি কোন বিশেষ রাসায়নিক শ্রমশিল্পই (chemical industry) শেখ, যতদিন আমাদের দেশের লোক সেই সমস্ত ব্যাপারে (enterprise) প্রবৃত্ত না হইবে, ততদিন সেই বিদেশলব্ধ শিক্ষা কার্য্যকরী ও ফলবতী হইতে পারিবে না।"

ইংলণ্ডের আধুনিক তাঁতে ভারতবর্ষের ঠক্‌ঠকি তাঁত অপেক্ষা চারিগুণ দ্রুত কাজ হয়। বিলাতের তাঁত এদেশে চালাইতে চেষ্টা করিলে আমাদের

দেশব্যাপ্ত তাঁতীদের যদি 'অচলায়তন' বোধই প্রবল হইয়া দেখা দেয়, তবে কেমন করিয়া বিদেশলব্ধ উন্নত শিক্ষা এদেশে কার্য্যকরী ও ফলবতী হইবে? এতৎসম্পর্কে আমাদের বিনীত অভিমত এই যে, আমাদের বিশেষ শিক্ষা কার্য্যকরী ও ফলবতী হইবে তখন, যখন একটি বিশেষ স্থান অর্থাৎ একটি বিশেষ একক বা ইউনিটকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের কর্ম্মের উন্মাদনা জাগিবে।

এই ঢাকা সহরে অবস্থান করিয়া ঢাকাই ঘি, ঢাকাই চিনি, ঢাকাই ময়দা, ঢাকাই তৈল, ঢাকাই ডাল, ঢাকাই বস্ত্র ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু পাওয়ার উপায় নাই। ঢাকায় তৈল আসে লক্ষ্ণৌ হইতে, ঘৃত আসে পাটনা হইতে, ডাল আসে মুঙ্গের হইতে, বস্ত্র আসে আহ্‌মদাবাদ হইতে। লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই, মাদ্রাজ সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। তথাকার লোকও তাহাদের বহুপ্রকার নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য অপর স্থানের লোকের উপর নির্ভরশীল। আন্তপ্রাদেশিক ও আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্র ব্যাপিয়া এতৎসম্পর্কে আমাদের যে বিরাট পরনির্ভরশীলতার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা আধুনিক সভ্যতার আশীর্ব্বাদ কি অভিশাপ, তাহার আলোচনা না করিয়া ইহা বলিতেছি যে, ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনাকে আমরা এতদিন যাবৎ যে দৃষ্টি-ভঙ্গীতে অবলোকন করিয়া আসিতেছি, এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তন সাধন একান্ত পক্ষেই আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

পঞ্চাশ কি এক শত বৎসর পূর্ব্বেও এদেশে গ্রাম বা মহকুমার নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রাম বা মহকুমাতেই উৎপন্ন হইত। আন্তপ্রাদেশিক বা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য তখনও ছিল, কিন্তু গ্রামগুলি দুর্ভিক্ষ পীড়িত ছিল না। ঢাকা জিলার লোক সংখ্যা ৩৪ লক্ষ ৩২ হাজার। ঢাকা জিলার সমস্ত বয়স্ক ও সুস্থ লোক একত্রে মিলিয়া একটা পরিকল্পনার নিয়ন্ত্রণাধীনে তাহাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সমুদয় বস্তু যথাসম্ভবরূপে উৎপন্ন করিতে পারেন। ক্ষেত্রের বিশালতায় আমরা ভয় পাই, কিন্তু ৩৫ লক্ষ লোকের পক্ষে ঢাকা জিলা বিশালায়তন নহে।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র 'বাংলার শিল্প ও আর্থিক উন্নতি' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "আজ অধিকাংশ জাতিরই লক্ষ্য হইতেছে, প্রয়োজনীয় বিষয়ে দেশকে যতদূর সম্ভব আত্মনির্ভরশীল করিয়া, সম্ভব হইলে, বাহিরের জন্য অতিরিক্ত উৎপাদন করা। অবশ্য ইহার অর্থ এই নহে যে, আন্তর্জাতিক বা আন্তপ্রাদেশিক বাণিজ্যকে উৎসাহ দেওয়া হইবে না। পুরাপুরি স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অসম্ভব, জাতির অর্থনৈতিক জীবনে তাহা স্বাস্থ্যের লক্ষণও নহে।" নিজের অস্তিত্ব ও বৃদ্ধিকে বজায় রাখিয়া আন্তর্জাতিক বা আন্তপ্রাদেশিক বাণিজ্যকে উৎসাহ দিবার অবকাশ যদি পাওয়া যায়, তবে উৎসাহ দেওয়া উচিত বটে। আমরাও পুরাপুরি স্বয়ং-সম্পূর্ণতার কথা না বলিয়া যথাসম্ভব স্বয়ং-সম্পূর্ণতার কথাই বলিতেছি এবং প্রতি দেশ বা প্রদেশ সম্পর্কে না বলিয়া প্রতি মহকুমা বা প্রতি জিলা সম্পর্কে বলিতেছি।

ব্যবসায়ের মূলে আছে, একে অন্যের প্রয়োজন পরিপূরণ, একে অন্যের সেবা বা service. এই সেবা নিকটতম পারিপার্শ্বিক হইতে যদি উৎপন্ন হয়, তবেই তাহা স্বাভাবিক ও শোভন হইতে পারে। প্রকারান্তরে তাহার অর্থ ইহাই যে, একে অন্যের প্রয়োজন পরিপূরণরূপ কার্য্য যদি পাড়াকে অবলম্বন করিয়া, মহকুমাকে অবলম্বন করিয়া বা জিলাকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে, তবেই তাহা জনগণের বাঁচা-বাড়ার পাকা বনিয়াদ হইয়া উঠিতে পারে।

(২)

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লায় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের যে উৎসব সমাপ্ত হইল, তাহার বিজ্ঞান-শাখার অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী বলিয়াছেন, "বাংলাকে সুজলা, সুফলা করিয়া তুলিতে হইলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাধ্যমিক এবং কুটীর-শিল্পের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাংলার শিল্প সংগঠন করিয়া তুলিলে বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় হইবেই।"

আমরা ব্যক্তিগত জীবনে শিল্প-বাণিজ্যের পত্তন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য যেমন একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া তথায় দোকান-পসার সাজাইয়া লই, তারপর উন্নতির ক্রমতালে অন্যান্য স্থানেও দোকানের শাখা-প্রশাখা খুলিয়া দেই, সেইরূপ আমাদের জাতীয় জীবনের জীবনবৃদ্ধিগত অর্থাৎ ব্যবসায়-বাণিজ্যগত ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত ও বলিষ্ঠ করিয়া ক্রম-প্রসারিত করিতে হইলে বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়—অপেক্ষাকৃত অল্পায়তনবিশিষ্ট স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া এবং সেখানেই আমাদের জাতীয় জীবনকে সম্প্রসারিত করিবার চেষ্টা করা। আমাদের বক্তব্য বিষয় সহজে পরিস্ফুট করিবার জন্য আমরা এস্থলে ঢাকা জিলাকেই সেই বিশেষ স্থান বলিয়া ধরিয়া লইতেছি।

ভারত-গভর্ণমেণ্টের অর্থসচিব ১৯৩৯-১৯৪০ খৃষ্টাব্দের বাজেটে যে তূলার উপর আমদানী শুল্ক দ্বিগুণিত করিয়া আমাদিগকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন, সেই তূলা ঢাকা জিলাতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। ঢাকার প্রাকৃতিক আবহাওয়াতে বর্ত্তমানে এমন কোন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই, যাহাতে এরূপ বলা সম্ভব হইতে পারে যে, ঢাকায় কার্পাস চাষ সাফল্য লাভ করিবে না। ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ম্যানেজিং এজেণ্ট শ্রীযুক্ত অখিলবন্ধু গুহ ঢাকায় তূলার চাষ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, লম্বা আঁশবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট তূলা ঢাকায় প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা যাইতে পারে। অতএব ঢাকাবাসী কেন তাহাদের প্রয়োজনীয় তূলার জন্য অপর স্থানের উপর নির্ভর করিবেন, তাহার কোন সদ্‌যুক্তি আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

"সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তূলার চাষ হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিলে পাটের প্রতি ঢাকার কৃষকদিগের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল।" নারায়ণগঞ্জ, সাতুরিয়া, বায়রা, কেরাণীগঞ্জ, তালতলা, লৌহজঙ্গ, ঢাকা প্রভৃতি বন্দর হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে পাট কলিকাতায় রপ্তানী হয়। কলিকাতার চট-কলওয়ালাগণ পাটচাষীদিগের প্রাণান্ত পরিশ্রম-লব্ধ পাটের দর

নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। তাহার একমাত্র প্রতিকার—সম্পূর্ণতঃ চটকলওয়ালাগণের উপর নির্ভর না করিয়া পাটজাত পণ্যের কুটীর-শিল্প প্রবর্ত্তন করা। পাট উৎপাদনের কেন্দ্রসমূহে পাটের সূতা কাটিবার ছোট ছোট কল স্থাপন করিলে পাট যাহারা উৎপাদন করেন, তাহারাই চট, দড়ি, কার্পেট, সতরঞ্চি, সুজনী, তোয়ালে, ঝাড়ন, বিছানার চাদর, ষ্ট্রেচারের কাপড়, আসন, ব্যাগ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারেন। গভর্ণমেণ্ট বাংলাদেশে পাটের চাষ হ্রাস করিবার জন্য যে প্রচার কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা বিফল হইয়াছে। কারণ—পাটের পরিবর্ত্তে আর কি বস্তু চাষ করা যাইতে পারে, তাহার প্রচার কার্য্য করিয়া গভর্ণমেণ্ট পাটচাষীদিগকে কার্য্যতঃ তাহার কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। উৎকৃষ্ট ধরণের বীজ দ্বারা অল্প স্থানে অধিক পাট জন্মাইবার নীতি গ্রহণ করিয়া বাজারের চাহিদা নির্দ্দেশে পাটের চাষ হ্রাস করা-ত আবশ্যক বটেই, কিন্তু আখের চাষ, খেজুরের চাষ, চীনাবাদাম, তিল, তিসি প্রভৃতির চাষ দ্বারা ঐ হ্রস্বীভূত চাষকে সহজেই পূরণ করা যাইতে পারে। সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় ঢাকার পাটের উৎপাদন সরবরাহে কেন সামঞ্জস্য সাধিত হইবে না, কেন ঢাকাবাসী আখের চাষ ও খেজুরের চাষ ব্যাপকভাবে প্রবর্ত্তন করিয়া কুটীর-শিল্পের মারফতে নিজেদের প্রয়োজনীয় চিনি, গুড়, মিশ্রি ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবেন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

বন্যা ও অনাবৃষ্টি নিবারণ করিয়া এবং কৃষি-বিজ্ঞানের নির্দ্দেশে ধান্যের চাষ নিয়ন্ত্রিত করিয়া ঢাকা জেলার ধান্যোৎপাদনের পরিমাণ এবং ধান্যের গুণ বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। ঢাকার অনাবাদী, পতিত ও জলে-ডোবা জমির পরিমাণ ৯৫০ বর্গমাইল। সেই ৯৫০ বর্গ মাইল জমির অন্ততঃ কতক অংশেও শস্যাদি ফলান যাইতে পারে কি না, তাহার গবেষণা করা যাইতে পারে।

গম, তিল, সরিষা, তিসি, গোল আলু, তামাক, বিভিন্ন প্রকারের ডাল প্রভৃতি অপরাপর শস্যাদির চাষও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রবর্ত্তন করিলে ঢাকার কৃষিজাত সম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে। ঢাকার মণিপুর ফার্ম্মে কৃষিবিষয়ক যে

বৈজ্ঞানিক গবেষণা হইতেছে, তাহার অভিজ্ঞতা ঢাকা জিলার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিতে না-পারার কোনই কারণ নাই।

ইউরোপ-আমেরিকায় জনপ্রতি ফল ও দুগ্ধ ব্যবহার করিবার পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। আর আমরা মুনি-ঋষির দেশের লোক হইয়াও তৎপ্রতি বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া চলিতেছি। তাহার ফলে আমাদের জীবনীশক্তি হ্রাস পাইয়া যে ক্রমে শূন্যবাদের দিকে পরিধাবিত হইয়া চলিয়াছে, তৎপ্রতি আমাদের ভ্রূক্ষেপ নাই বলিলেও চলে। নিউজিল্যাণ্ডের এক-চতুর্থাংশ লোক গোপালন-ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ঢাকাবাসী কি বাগ্‌বাগিচা করিয়া ব্যাপকভাবে ফলের চাষ করতঃ ফল ভক্ষণ করিতে পারিবেন না, ফলের ব্যবসায় করিতে পারিবেন না? উৎকৃষ্ট প্রজনন দ্বারা উৎকৃষ্ট দুগ্ধবতী গাভী লাভ করিয়া প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতে পারিবেন না? বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া তাহার ব্যবসায় চালাইতে পারিবেন না?

"শিল্প-সমৃদ্ধিতে ঢাকা বঙ্গের গৌরবস্থল ছিল। ঢাকার বস্ত্রশিল্প স্বীয় মহিমায় জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সুযোগে জগতের ধনরাশি শতমুখী জাহ্নবীর ধারার ন্যায় ভারতে আসিয়াছিল। ঢাকার শিল্পীকুলকে রাজশক্তি বলে আপনাদের পণ্যদ্রব্য জগতের গ্রহণীয় করিতে হয় নাই। ঢাকার বস্ত্রের জন্য সমগ্র জগৎ যে এক সময়ে সোৎসুক নয়নে তাকাইয়া থাকিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ১৩,৬২,১৫৪ টাকা মূল্যের বস্ত্র ঢাকা হইতে রপ্তানী করা হইয়াছিল।" বস্ত্রশিল্পে এই ঢাকাবাসীকে যদি স্বাবলম্বী করিয়া তোলা না যাইতে পারে, তবে আমাদের সকল শিক্ষা-দীক্ষা কি ব্যর্থ হইয়া যাইবে না? নারায়ণগঞ্জ মহকুমার মাধবদী এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে সম্প্রতি ২০ হাজার তাঁত চলিতেছে। প্রত্যক্ষভাবে ৬০ হাজার এবং পরোক্ষভাবে ১ লক্ষ লোক এই তাঁত-কার্য্য দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে। কুটীর শিল্পত্ব নষ্ট না করিয়াও ছোটখাট যন্ত্র ব্যবহারের সুবিধা লাভ করিবার জন্য তথাকার লোক

সম্প্রতি একটি সমবায়-সমিতি স্থাপন করিয়া ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার বৈদ্যুতিক-শক্তি উৎপাদনের যন্ত্রাদির অর্ডার দিয়াছেন। স্থানীয় লোকের চেষ্টায় স্থান-বিশেষের লুপ্ত শিল্প যদি এই ভাবে জাগরিত হইতে পারে, তবে জিলাবাসিগণের চেষ্টায় ঢাকা জিলা কেন তাহার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে না, তাহা আমরা বুঝিতে অপারগ।

হোসিয়ারি দ্রব্য, পিত্তল-কাংস্য-লৌহ ও ইস্পাতের দ্রব্য, লোহার যন্ত্রপাতি, খেলনা, দিয়াশলাই, চামড়ার জিনিষ, লণ্ঠন, কাগজ, সেলুলয়েড, ফিতা, বোতাম, নিব, ছুরিকাঁচি, রঞ্জন-দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য এবং অপর যে সমস্ত খুঁটিনাটি শিল্পদ্রব্যের ঢাকাবাসীর দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য্য প্রয়োজন, বিশেষজ্ঞের নিয়ন্ত্রণাধীনে কুটীর-শিল্পের মারফতে তাহাদের ঐ সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে না পারার কোনই কারণ নাই। "আমাদের দেশে অনেকেই মনে করেন যে, বড় বড় কল-কারখানা না হইলে শিল্পের উন্নতি হয় না। কিন্তু জাপানের শিল্প-ইতিহাস আমাদের এই ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করিবে। জাপান তাহার কুটীরশিল্প দ্বারা বৈদেশিক প্রতিযোগিতাকে পরাহত করিয়াছে। জাপানের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিচালিত কুটীরশিল্প জাপানকে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দিক দিয়া স্বাবলম্বী করিয়া তুলিয়াছে। জাপানে কুটীরশিল্পসমূহ ক্রমশঃই এত উন্নত ও ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে, অনেকেই এই কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভারের উপর নির্ভর করে। ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন গ্রামে পল্লীবাসীদিগকে কাঁচা মাল সরবরাহ করে। তাহারা তাহাদের কৃষিকার্য্যের অবকাশ সময়ে ছোট ছোট যন্ত্রপাতির সাহায্যে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করে।" এতৎসম্পর্কে জাপান আমাদের অনুসরণীয় নহে কি?

মোটকথা, ঢাকা জিলাকে সমগ্র বাংলার অথবা ভারতবর্ষের অস্তিবৃদ্ধিমুখর ব্যবসায়-জীবন সুরু করিবার কেন্দ্রস্থল বলিয়া যদি ধরিয়া লওয়া যায়, অর্থাৎ গোটা বাংলাবাসী বা ভারতবাসী যদি আপনাদিগকে একটি ব্যষ্টি মনুষ্য, যথা— প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ঘনশ্যাম দাস বিরলা বা স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ রূপে কল্পনা

করিয়া ঢাকা জিলাকে তাহার প্রগতিপরায়ণ অর্থনৈতিক জীবন চালনা করিবার কেন্দ্রস্থল বলিয়া ধরিয়া লন, তবে তাঁহাকে ঢাকার কৃষিক্ষেত্রের ও শিল্পক্ষেত্রের সম্পদ পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহা তাহা করিতে তাহার জীবনের ক্রম-সফলতা অর্থাৎ ঢাকাবাসিগণের ব্যবসায়-বাণিজ্যগত ক্রমোন্নতি অনিবার্য্যরূপেই দেখা দিবে। বঙ্গবাসী বা ভারতবাসিরূপী সেই ব্যষ্টি মনুষ্য অপরাপর জিলায়ও তাঁহার কার্য্য প্রসারিত করিতে পারিবেন অর্থাৎ ঢাকা জিলার আত্মোন্নয়নের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অপরাপর জিলার অধিবাসিগণও তাহাদের আর্থিক সচ্ছলতা বিধানে প্রযত্নশীল হইয়া উঠিতে পারেন। *

এই কার্য্যে মূলতঃ তিনটি বস্তুর প্রয়োজন :—

(১) জিলাবাসীদের যথাসম্ভবরূপে স্বাবলম্বী হইবার ঐকান্তিক আগ্রহ

(২) অর্থ

(৩) নেতৃত্ব

এতদর্থে ঢাকাবাসীদের মধ্যে স্বাবলম্বী হইবার প্রবৃত্তি জন্মাইতে হইবে সর্ব্বভারতীয় নেতৃত্ব-শক্তিকে ঢাকায় বিনিয়োগ করিতে হইবে। যে সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা হইবে, তাহার প্রাথমিক পর্ব্বের অর্থ সর্ব্বভারতীয় নেতৃবৃন্দকে সরবরাহ করিতে হইবে। দ্বিতীয় পর্ব্ব হইতে জিলার পরিকল্পনা পরিচালনার ব্যয় বাবত জিলার প্রতি-বয়স্ক ও সমর্থ ব্যক্তির নিকট হইতে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দান সংগ্রহ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে।

প্রতি জিলার অর্দ্ধ-সরকারী প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ লোকাল ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের শাসনযন্ত্র যিনিই অঙ্কুরিত করিয়া তুলিয়া থাকুন না কেন, তিনি সশরীরে এক্ষণে বর্ত্তমান না থাকিলেও উক্ত শাসনযন্ত্রের কার্য্য প্রতি জিলাতেই সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে। সর্ব্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ ঢাকাবাসীদের আর্থিক সচ্ছলতাবিধানের জন্য যে পরিকল্পনাকে মূর্ত্ত করিয়া যন্ত্রে পরিণত করিবেন, তাহার পরিচালন

* ভারতবর্ষের অন্ততঃ কয়েকটি জিলাতে যে একই সময়ে একপ্রকার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা যাইতে পারে না, ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

এবং কলাকৌশল পরিবর্দ্ধনের বুদ্ধি যখন স্থানীয় লোকের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিবে, তখন তাঁহারা উহার দায়িত্ব বহন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া তাঁহাদের নেতৃত্ব-শক্তিকে অন্যত্র প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

আমাদের দেশে সম্প্রতি জমাজমির সরকারী খাজানা হ্রাস করিবার এক আন্দোলন চলিতেছে। দুই-একটি প্রদেশে ভূমি-কর হ্রাস করা হইয়াছেও বটে। ইহাকে আমরা জাতীয়-জীবনের ক্ষয়রোগের লক্ষণ বলিয়া অভিহিত করিতেছি। নদীর স্রোতধারায় ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের মত জীবন চালনার বিভিন্ন লওয়াজিমার প্রাচুর্য্যের স্রোতে আমরা ভাসিয়া চলিব—ইহাই হউক আমাদের সঙ্কল্প; তবেই তৎলওয়াজিমা উৎপাদনে আমরা মনোযোগী হইতে পারিব। ইংলণ্ডের লোক আমাদের অপেক্ষা তাহাদের গভর্ণমেণ্টের হস্তে চার পাঁচগুণ অধিক ট্যাক্স প্রদান করেন। তাই বলিতেছি যে, ভূমি-কর হ্রাস করিবার প্রয়াস না করিয়া ভূমির ফসলোৎপাদন কেমন করিয়া দ্বিগুণিত, ত্রিগুণিত হইতে পারে, কেমন করিয়া লক্ষ্মীদেবীর অপরিমিত ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার আমরা লুণ্ঠন করিয়া আনিতে পারি, তাহার প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করাই হইবে আমাদের জাতীয়-জীবনের সচ্ছন্দ-সজীবতার লক্ষণ, এবং তৎপ্রয়াসে আত্মনিয়োগের ফলে আমাদের হস্তে যে অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চিত হইবে, তাহার অংশবিশেষ অর্থাৎ আমাদের অতিরিক্ত আয়ের পাঁচ পয়সার দুই পয়সা আমাদের আরও উদ্বর্দ্ধনের মূলে ব্যয় করিবার নীতিকে যদি আমরা সক্রিয় করিয়া তুলিতে পারি, তবে শুধু যে আমরা আর্থিক সচ্ছলতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিব, তাহা নয়, দেশে আমাদের স্বাধিকার বা আত্মরাজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও বলিষ্ঠতর হইয়া দ্রুততর ফল প্রদান করিবে। সুতরাং আমরা ইহা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতেছি যে, দেশের মেরুদণ্ড সবল করিয়া তুলিবার কাযা গভর্ণমেণ্টের কার্য্য, আমরা তাহা করিবই না—আমাদের মধ্যে যদি এই মনোবৃত্তির উদ্ভব হয়, তবে তাহা বাড়ী-ঘরে আগুন লাগিলে অপরের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিয়া আগুন না নিভাইবার মতই হইবে।

আমরা এই প্রবন্ধে পুনরায় ইহা বলিতেছি যে, ব্যবসায়ের গোড়ায় আছে,

একে অন্তের প্রয়োজন পরিপূরণ, সেবা বা service. আর এই সেবা যদি নিকটতম পারিপার্শ্বিক হইতে উদ্ভিন্ন হয়, অর্থাৎ এই একে অন্তের প্রয়োজন পরিপূরণরূপ সেবা যদি পাড়া, গ্রাম, মহকুমা, জিলাকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে, তবেই তাহা নির্ব্বন্ধ হইয়া অমৃত ফল প্রসব করিবে।

(৩)

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শা মে তারিখে 'আনন্দবাজার' লিখিতেছেন, "রংপুর জিলার আদিতমারী গ্রামে ১॥ মাইল দীর্ঘ ও ২৬ ফিট প্রশস্ত একটি খাল কাটিয়া তুইটি বিলের সহিত স্বর্ণমতী নদীর সংযোগ সাধন করা হইয়াছে। এই খাল খননের ফলে বিলের জল বাহির হইবার পথ পাওয়ায় প্রায় ১॥ লক্ষ বিঘা জমি চাষের উপযুক্ত হইয়াছে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবারও সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। এই বিরাট কার্য্য গ্রামবাসীদের দ্বারা সাধিত হইয়াছে, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ফরিদপুর জিলার গোপালগঞ্জ অঞ্চলে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে গ্রামবাসিগণ যে সব খাল কাটিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহাও স্মরণীয়। কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাহাবাজপুর প্রাইমারি কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক ১॥ মাইল লম্বা ও ৩৯ ফিট প্রশস্ত এক রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। গ্রামের উন্নতির জন্য কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া না থাকিয়া গ্রামবাসীরা যে নিজেদের হাতেই উহার ভার লইতেছেন, ইহা আশার কথা সন্দেহ নাই।"

শুধু খাল কাটা এবং রাস্তা বাঁধার ব্যাপারে নয়, কৃষি ও শিল্পের সমুন্নতি বিধান এবং তদানুষঙ্গিক কার্য্যাদি সাধন করিবার ভারও প্রতি জিলার অধিবাসিগণ সম্মিলিতভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, যদি তাহারা প্রাথমিক অর্থ সাহায্য এবং দেশের নেতৃত্ব-শক্তির সহযোগিতায় বঞ্চিত না হন, ইহা আমরা দৃঢ়কণ্ঠেই বলিতে চাই।

ইংলণ্ডের নৈসর্গিক সম্পদ প্রচুর নহে, ছয় মাসের খাদ্যও সেই দেশে উৎপন্ন হয় না। এই অবস্থাতেও ইংলণ্ডবাসিগণ তাহাদের শিল্প-বাণিজ্যের

বিপুল উন্নতি সাধন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে শ্রাদ্ধোপলক্ষে বা বিবাহ-উৎসবে যে পরিমাণ কাঙ্গালীর সমাবেশ হয়, বড় বড় সহরের রাস্তায় বা ফুটপাথে কাঙ্গালী এবং কুষ্ঠরোগীর যে প্রাচুর্য্য দেখা যায়, গ্রামে প্রবেশ করিলে গ্রামবাসীর অস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্যের যে জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি নয়নে পতিত হয়, তাহা আমাদের অর্থ আহরণ করিবার কৌশল-বোধ জাগরিত করিতে পারিতেছে না। স্বরাজ লাভ করিতে যদি আমাদের আরও ২৫ বৎসর লাগিয়া যায় (লাগিবে না, এরূপ কোন নিশ্চয়তা কেহই দিতে পারেন না), তাহা হইলে তাহারই আশায় বসিয়া থাকিলে আমাদের অবস্থা যে ক্রমাগতই মন্দ হইতে থাকিবে, কল্পনার চোখে তাহা নিরীক্ষণ করিতে পারা যায় না কি ? দেহরক্ষার উপযোগী নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ ত বটেই, তাহা ছাড়া আরামের জন্যও যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন হয়, তাহাও আমাদিগকে উৎপাদন করিতে হইবেই। ডক্টর মেঘনাদ সাহা বলেন, "আধুনিক বিজ্ঞান-প্রমাণিত করিয়াছে যে, দেশ জয় করিয়া মানুষ যাহা করিতে পারে না, নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে কাজে লাগাইলে তাহার অনেক বেশী সম্ভব হয়। ভারতের খনিজ দ্রব্য, কৃষি ও শিল্পসংক্রান্ত ব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে দেশীয় মাল ভারতেই নিঃশেষিত হইবে এবং তাহার ফলে ভারতের জীবনযাত্রা প্রণালী ধীরে ধীরে উন্নত হইবে।"

দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য একটি পরিকল্পনা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইলে আমাদের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, এক বা একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র, অর্থ এবং সর্ব্বভারতীয় নেতৃত্ব—ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এক্ষণেও তৎসম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার প্রয়াস করিব।

পরীক্ষা-কেন্দ্র :—ঢাকা জিলা অথবা এক একটি প্রদেশের এক একটি জিলাকে পরীক্ষা-কেন্দ্ররূপে নির্ব্বাচন করিবার সার্থকতা ইহাই যে, নেতৃত্বশক্তি ঐ ঐ স্থানে কেন্দ্রীভূত হইতে পারিবে, যেমন আইন-অমান্য-আন্দোলনের সময় স্থান-বিশেষে সর্ব্বভারতীয় নেতৃত্ব কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, সাফল্যকে সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করা। প্রাথমিক

পরীক্ষা-কেন্দ্র বা কেন্দ্রগুলিতে যদি সাফল্যের সম্ভাবনা ফুটিয়া উঠে, তবে অপরাপর স্থলে অর্থাৎ অপরাপর জিলার অধিবাসিগণও নিশ্চয়ই তৎপ্রকার কার্য্যে উৎসাহ, উদ্যোগ ও অর্থ বিনিয়োগে তৎপর হইয়া উঠিতে পারিবেন।

অর্থ :—গভর্ণমেণ্টের বিরাট কার্য্য চলিতেছে যে অর্থের বলে, সেই অর্থ কোথা হইতে আমদানীকৃত হয়, তাহার বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই, তাহা নিম্নোক্ত পন্থাগুলির ভিতর দিয়া গভর্ণমেণ্টের তহবিলে আসিয়া জমা হয়, যথা :—

(১) ভূমির খাজানা

(২) আমদানী-শুল্ক ও রপ্তানী-শুল্ক (tariff duty)

(৩) উৎপাদন-শুল্ক

(৪) আয়-কর, বন-কর, মাদকদ্রব্য-কর, ষ্টাম্প-ফি ইত্যাদি

ঢাকা জিলার কালেক্টর ঐ ঐ পন্থায় ঢাকা জিলা হইতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যে অর্থ সংগ্রহ করেন, তাহা ঐ জিলাবাসিগণেরই দান ব্যতীত আর কিছু নয়। গড়পড়তা হিসাবে ঢাকা জিলার প্রতি গৃহস্থ প্রতি বৎসরে গভর্ণমেন্ট-তহবিলে যে দান উৎসর্গ করেন, তাহার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ বেশী দান করিবার সঙ্কল্প যদি তাহারা আপ্রাণতার সহিত গ্রহণ করেন এবং প্রতি বৎসর তাহা তাহাদের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা মূলে অর্পণ করেন, তবে অতি দ্রুত তাহাদের আর্থিক অবস্থা উন্নততর হইবেই।

সেবাই আমাদের প্রস্তুতি। রামকৃষ্ণ মিশন কার্য্যের জন্য আবেদন করিলে ততখানি পরিমাণ অর্থই প্রাপ্ত হন, যতখানি সেবা তাহারা প্রয়োগ করিতে সক্ষম হন। মহাত্মা গান্ধী অর্থের জন্য আবেদন করিলে ততখানি পরিমাণ অর্থই লাভ করেন, যতখানি সেবা তিনি দেশে প্রয়োগ করিতে পারেন, অথবা প্রয়োগ করিবার আকাঙ্ক্ষাকে অভিব্যক্ত করিতে পারেন। সুতরাং দেশ-নেতৃগণকে পরীক্ষা-কেন্দ্র বা কেন্দ্রগুলির উন্নয়ন কার্য্যের প্রাথমিক ব্যয়ভার বহন করতঃ কেন্দ্র বা কেন্দ্রগুলির অন্তর্ভুক্ত জনগণের কৃষি, শিল্প ও

ব্যবসায়ের উন্নতিপ্রসূ সেবায় সর্ব্বপ্রথমে আপ্রাণ হইতে হইবে। সেই সেবার ফলে তাহারা যে পুষ্টি লাভ করিবে, তাহার অনুপাতে তাহারা নেতৃবৃন্দের হস্তে অর্থ প্রদান করিবেই। প্রতি দেশেরই গভর্ণমেণ্ট গঠনের গোড়ায় অর্থাৎ উন্নয়ন-উর্দ্ধনের মূলে, দেশের চালক ও চালিত—এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে এমনি প্রকারের একটা আদান-প্রদানের ভাব বিদ্যমান ছিল, ইহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি।

নেতৃত্বঃ—নেতৃবৃন্দের কৃষি-শিল্পাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার আবশ্যক করে না। কংগ্রেস কর্ত্তৃক নিযুক্ত শিল্প-পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল শিল্প বিশেষজ্ঞ নহেন, কিন্তু কমিটির বিশেষজ্ঞবৃন্দ তাঁহারই নিয়ন্ত্রণাধীনে আপনাদের যথানির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধন করিয়া যাইতেছেন। যত অধিক জনগণের মনোবৃত্তির সহিত সহানুভূতিপরায়ণ হইয়া যিনি যত অধিক জনগণকে আপনার অভীষ্ট পথে পরিচালিত করিতে পারেন, তিনি তত বড় নেতা। বাংলার স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ নাজিমুদ্দিন যখন পাবনার কোন বিলের কচুরীপানা উত্তোলন করিবার জন্য স্বয়ং জলে অবতরণ করিলেন এবং এই সংবাদ যখন চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল, তখন কচুরীপানা উত্তোলন কার্য্যে পাবনার জনসাধারণ অপূর্ব্ব উৎসাহ লাভ করিয়াছিল। নেতৃবৃন্দকেও আর্থিক উন্নয়নের পরিকল্পনার মধ্য দিয়া জনগণের চিত্তে এমনি প্রকারের উৎসাহের সৃষ্টি করিতে হইবে। এই উৎসাহকে জিয়াইয়া রাখা যখন জনসাধারণ নিজেদের পরম স্বার্থ বলিয়া বিবেচনা করিবে, তখন তাহারা নিজেদের উন্নয়ন-পরিকল্পনার মূলীভূত শাসনতন্ত্রের (পোষণতন্ত্র বলিলেই ভাল হয়) পরিচালনা ও পরিরক্ষণে নিজেরাই সজাগ হইয়া উঠিবে।

দেশের আশ্রম, সঙ্ঘ, মিশনসমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণ পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজন পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে ইণ্ডাষ্ট্রীতে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। ইণ্ডাষ্ট্রীর মূলগত অর্থ ভিতর হইতে গঠন করা। কাল্‌চার এবং ইণ্ডাষ্ট্রীর অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধই প্রাকৃতিক নিয়মানুমোদিত। আশ্রম কথাটি আসিয়াছে আ—শ্রম

ধাতু হইতে। যেখানে শ্রমের দ্বারা মানুষ উৎকর্ষ লাভ করে, তাহাকেই আশ্রম বলে। সঙ্ঘ এবং মিশনও আশ্রম বটে। "পূর্ব্বে এদেশের আশ্রমসমূহের প্রধান অঙ্গ ছিল—তপস্যা, সেবা ও ভিক্ষা। পারিপার্শ্বিকের শুভ কামনায় তপস্যা প্রাণবান্ হইত এবং পারিপার্শ্বিকের নিকট লব্ধ ভিক্ষা দ্বারাই আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। এই অবস্থায় পারিপার্শ্বিককে সেবা দান করা আশ্রমবাসীদের একটা প্রধান কর্ত্তব্য ছিল।" ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, পূর্ব্বকালে আশ্রমবাসীদের এই সেবা দ্বারাই দেশের তৎকালোপযোগী ইণ্ডাষ্ট্রীর মূলসূত্রপাত হইত। এক্ষণেও সেইরূপ হইতে পারে।

ক্ষতি স্বীকার করিয়া ব্যবসায় চালনা করিলে তাহাকে ব্যবসায় বলে না। মূলধনাতিরিক্ত যে অর্থ ব্যবসায়ীর হস্তে জমায়েৎ হয়, তাহা দ্বারাই ব্যবসায়ী স্বয়ং, তাহার সমাজ, দেশ ও জাতি ক্রম-পরিপোষণে সমৃদ্ধ হইতে থাকে। তাই, পূর্ব্ব প্রবন্ধের জের টানিয়া এই প্রবন্ধেও ইহা বলিতেছি যে, ব্যবসায়ের গোড়ায় আছে, একে অন্যের প্রয়োজন পরিপূরণ, সেবা বা service এবং তাহার লাভজনক পরিচালনা।

(৪)

"মনুষ্য-সমাজের আদিম অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার নিজের আবশ্যক সমস্ত কার্য্য করিত। কালক্রমে এক ব্যক্তির পক্ষে নিজের যাবতীয় কার্য্যকরণ ও প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদার্থ আহরণ কষ্টকর হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন লোক সমাজের প্রয়োজনীয় ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য ও দ্রব্যাদি উৎপাদন ও সরবরাহ করিতে লাগিল। ... ...যে সকল কার্য্যে এবং দ্রব্যে মনুষ্যের আহার-বিহার, দেহরক্ষা, শোভা-সৌন্দর্য্য সাধিত হয়, সেই সকল কার্য্যের এবং দ্রব্যের আদান-প্রদানই ব্যবসায় নামে কথিত।"

ব্যবসায়ী-সমাজকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—পণ্য উৎপাদনকারী এবং পণ্য সরবরাহকারী। পণ্য উৎপাদিত হয় কৃষি ও শিল্পে।

খাদ্য, চা, ইক্ষু, পাট, খেজুর, তাল, কার্পাস, তামাক, চীনাবাদাম, ছোলা-মুগ-মসুর প্রভৃতি ডাল, তিসি, গম, যব ইত্যাদি কৃষিজ। শাক-সব্জি কৃষিজ। ফল এবং ভেষজ দ্রব্যের উৎপাদনও কৃষিজ। গো-মহিষ-মেষাদির উৎপাদনকে কৃষির অন্তর্গত বলিয়াই ধরা হইয়া থাকে। চিনি, দিয়াশলাই, সাবান, কাচ, পোর্সিলেন, পেন্সিল, কাগজ, বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক আলোর বাল্ব, ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য, পাম্প, থার্মোমিটার, রবার টায়ার, মোটর ইঞ্জিন, সাইকেল, ঘড়ি, গ্রামোফোন, রেডিও, ওয়াটার প্রুফ, চামড়া, কালি, লবণ প্রভৃতির উৎপাদন শিল্পের অন্তর্গত। সুতরাং দেখা যায়, জীবনচালনায় ব্যষ্টিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে আমাদের যাহা-কিছুর প্রয়োজন, তাহা আমাদের এক শ্রেণী-বিশেষ উৎপাদন করেন এবং অপর শ্রেণী-বিশেষ তাহা অপরের প্রয়োজনমত সরবরাহ করেন। উভয় শ্রেণীই অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং উভয়েরই ব্যবসায়গত মূলনীতি এক হইবারই কথা।

ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি, উৎকৃষ্টতর বীজ বপন, কীটাদির উৎপাত নিবারণ, অনাবৃষ্টি ও বন্যার প্রতিরোধ প্রভৃতি ব্যবস্থার ভিতর দিয়া ক্ষেত্রজ শস্য, শাক-সব্জি, ফল ও ভেষজাদি উৎপাদিত হইয়া সরবরাহকারীদের হাতে আসে। উৎকৃষ্টতম বলিয়া নির্ব্বাচিত পুং-পশুর দ্বারা স্ত্রী-পশুর গর্ভে পশুসন্তানের প্রজনন এবং উহাদের যথোচিত পুষ্টিপ্রদ খাদ্যাদির পরিবেশনের ভিতর দিয়া গো-মহিষ-ভেড়া-ছাগল প্রভৃতি সরবরাহকারীদের হাতে আসে। বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর কল্যাণ-সংস্পর্শে ক্রমোন্নত অবস্থা-প্রাপ্তির ভিতর দিয়া শিল্পশালায় শিল্পদ্রব্য উৎপাদিত হইয়া সরবরাহকারীদের হাতে আসে। পণ্য-উৎপাদনকারী স্বয়ং পণ্য-সরবরাহকারীর স্থান গ্রহণ করেন না, তাহা নয়, অনেক ক্ষেত্রে তাহারা সরবরাহকারী বা দোকানদারও বটেন।

যদি প্রয়োজনমাফিক পণ্য উৎপাদিত না হয় অথবা প্রয়োজনের সীমা ছাড়াইয়াও যদি পণ্য উৎপাদিত হয়, তবে সামাজিক ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটে। যুগের চাহিদা অনুসারে আমরা প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন করিতে

পারি নাই বলিয়া তৎপণ্য সরবরাহের সুযোগে এদেশে বৈদেশিক গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহার সত্যতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সরবরাহ-কারীদের সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় অধিক হইলে সমাজের ক্ষতি অনিবার্য্য হইয়া উঠে। এতৎসম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি।

ঢাকায় পুস্তকের দোকান, কাগজের দোকান, ষ্টেশনারী দ্রব্যের দোকান, ঔষধালয়, জুতার দোকান, ডাইং-ক্লিনিং, রেষ্টুরেন্ট, ছাপাখানা, কাপড়ের দোকান, বোর্ডিং বা হোটেলের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বাংলাবাজারে পুস্তকের দোকান ব্যতীত আর বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না। পাটুয়াটুলী এক্ষণে কাপড় ও কাগজের দোকানের বহিরঙ্গের শোভা-সৌন্দর্য্যে ঝলমল। ওয়াইজ ঘাট রোডে বসু-ঘোষ কোম্পানী, ঘোষ ব্রাদার্স, ইণ্ডিয়া সু-ষ্টোর প্রভৃতি বাঙ্গালী পরিচালিত কয়েকটি জুতার দোকানে জুতা প্রস্তুত ও বিক্রী হয়। কলিকাতা হইতে চীন দেশীয় লোক আসিয়া মিট্‌ফোর্ড রোড এবং বংশীবাজারে জুতার দোকান খুলিয়া ওয়াইজ ঘাট রোডের জুতার দোকানগুলির সমূহ ক্ষতি করিয়াছে। রমাকান্ত নন্দী লেনের আধুনিক নামশোভিত চিত্তরঞ্জন বোর্ডিং ঢাকার অন্যতম প্রাচীন হোটেল বলিয়া জানি। উক্ত লেনে ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত আর একটি লাইসেন্স প্রাপ্ত হোটেল চলিতেছে। সম্প্রতি আর একটি হোটেল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উহাও লাইসেন্স পাওয়ার চেষ্টা করিতেছে। ঢাকার ছাপাখানাগুলির আর্থিক অবস্থা মন্দ। এই অবস্থায়ও প্রতি বৎসরেই ৩টি ছাপাখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। বলা আবশ্যক, ঢাকা সহরের এই চিত্র ভারতবর্ষের সমষ্টি-সহরের সমষ্টি-চিত্রের একটি ব্যষ্টি অংশ মাত্র। সুতরাং বিষয়টি বাস্তবিকই গুরুতর বটে।

এই তথ্য হইতে আমরা ইহা সহজেই বুঝিতে পারি যে, ব্যবসায় অর্থ যদি পারস্পরিক প্রয়োজন পরিপূরণ বা সেবা নাম প্রাপ্ত হয়, তবে দেশের সর্ব্বত্রই পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহে নিয়ন্ত্রণ ও সামঞ্জস্য থাকা একান্ত পক্ষেই বাঞ্ছনীয়। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে সকল দেশেই অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রচলিত ছিল।

বর্ত্তমান যুগে সকল দেশই টেরিফের সহায়তায় অবাধ বাণিজ্যনীতিকে খর্ব্ব করতঃ দেশবাসীদের পারস্পরিক-প্রয়োজন-পরিপূরণ-কার্য্যে একটা উন্নত ও বলিষ্ঠ ভাব আনয়ন করিয়াছে। দেশের সমগ্র অংশের ব্যবসায়ীদের কল্যাণের তরে যে নীতি অবলম্বিত হইতেছে, দেশের খণ্ড অংশের ব্যবসায়ীদের কল্যাণের তরেও সেই নীতি অবলম্বিত না হওয়ার কোন কারণ দেখি না। জার্ম্মাণীর সহর-বন্দরেও না-কি পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ মূলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে নির্ব্বিরোধ সেবার ভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সরকারী নিয়ন্ত্রণবিধি প্রতিপালিত হয়। *

---

* শ্রীযুক্ত রাবেশচন্দ্র রায় প্রণীত 'হেন্‌রি ফোর্ড' নামক পুস্তক হইতে ফোর্ড সাহেবের অনাবশ্যক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা অবাধ বাণিজ্য সম্বন্ধীয় অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। হেন্‌রি ফোর্ড যে স্থানে দেশ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই স্থানে আমরা জিলা শব্দ প্রয়োগ করিয়া উহাকে আমরা আমাদের নিজস্ব চিন্তা ধারার আলোকে আলোকিত করিয়া লইয়াছি। পাঠকগণকেও আমাদের মনোবৃত্তি লইয়া তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। নতুবা আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধের অর্থবোধে বিঘ্ন হইবে।

"সম্প্রতি পৃথিবীতে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য বলিয়া যে একটা কথা উঠিয়াছে, তাহা শুধু কথার মারপ্যাচ ও ছলনা মাত্র। জগতের প্রত্যেক জাতি যাহাতে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে, তাহাই সকলের কামনার বিষয় হওয়া উচিত। প্রত্যেক দেশ (জিলা) নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈয়ার করিলে পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিতে পারিবে বেশী। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতিগুলির অজ্ঞতার সুযোগ লইয়াই আমরা বিদেশী বাণিজ্য চালাইয়া থাকি। স্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই আমরা অনুন্নত জাতিসমূহকে অনুন্নত রাখিয়া দেই। দুনিয়ার প্রত্যেক জাতি স্বাবলম্বী হইলে বর্ত্তমান বাণিজ্যে একটু বিপর্য্যয় ঘটিবে বটে, কিন্তু বর্ত্তমান ভাবধারাতেই বা জগৎ চলিবে কয় দিন? ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া আমাদের চাহিয়া দেখা উচিত জগৎজোড়া সভ্যতার দিকে। পরস্পরের সাহায্য-প্রবৃত্তি হইতেই ব্যবসায়-বাণিজ্যের উৎপত্তি। আমাদের দেশে (যে জিলায়) যে জিনিষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, নিজের ব্যবহারের পরিমাণ দ্রব্য রাখিয়া বাকিটা যে দেশে (যে জিলায়) সেই জিনিষ উৎপন্ন হয় না, তথায় প্রেরণ করিবার সদিচ্ছা হইতেই আন্তর্জ্জাতিক (আন্তর্দেশিক) বাণিজ্যের প্রচলন। জগতের সমস্ত দেশ (জিলা) স্বাবলম্বী হইলে তখন আর বৃথা প্রতিযোগিতার বালাই থাকিবে না।"

এক্ষণে প্রশ্ন আসে এই যে, কে বা কোন্ প্রতিষ্ঠান দেশের পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহে তৎপ্রকার নিয়ন্ত্রণ ও সামঞ্জস্য সাধনের ভার গ্রহণ করিবে। প্রতি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড জিলার অন্তর্গত মুাঙ্গিপালিটির সহযোগিতায় এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবার মত অবস্থা আয়ত্ত করিতে পারেন। তাহাদের নিজস্ব এলাকার প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদনের ভার তাহারা নিজেরাই যদি গ্রহণ করেন এবং পণ্য সরবরাহকারী মহলে যাহাতে অনাবশ্যক ভীড় বা অন্যায় প্রতিযোগিতা না জন্মে অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়-কার্য্য যাহাতে সেবা-ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়া উঠে, তাহারা যদি সেই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন, তবে তাহারা নিজেরাও অর্থের দিক দিয়া লাভবান্ হইবেন। আমরা এই প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশে জিলা-বিশেষ সম্পর্কে যে পরিকল্পনার ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছি সেই পরিকল্পনাকে যদি যান্ত্রিক অবয়বের ভিতর দিয়া প্রতিমূর্ত্ত করিয়া তোলা যায়, তবে তাহাও দেশবাসীর পারস্পরিক প্রয়োজন-পরিপূরণরূপ সেবাকার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার ভার গ্রহণ করিতে পারে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে এবম্প্রকার নিয়ন্ত্রণ ও সামঞ্জস্যের ফলে দেশে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। যাহারা অপরের চিন্তা ও কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করিয়া চলেন অর্থাৎ যাহারা চিন্তায় ও কার্য্যে মৌলিকত্ব-বর্জ্জিত, তাহারাই বেকার—ইহাই বেকারের একমাত্র সংজ্ঞা। অফুরন্ত প্রকারের পণ্য উৎপাদন করিবার ক্ষমতা আমাদের করায়ত্ত থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা আমাদের চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মশক্তিকে নব নব পথে চালনা করিব না? যদি আমরা তৎকার্য্যে অক্ষম হই (অবশ্য প্রত্যেকটি ব্যষ্টি মনুষ্য হইতেই তৎপ্রকারের সক্ষমতা আশা করা যাইতে পারে না), তবে ইহা স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে,

---

ফোর্ড সাহেবের ব্যবসায় জগৎজোড়া। উক্ত অভিমত দ্বারা তিনি ইহাই বুঝাইতেছেন যে, জগতের সমষ্টি-মানবের কর্ম্মশক্তিকে উদ্বোধিত করিবার শুভবুদ্ধিমূলে তিনি তাঁহার ব্যবসায়ের সুব্যবস্থাকে বলি দিতে প্রস্তুত। ইহা তাঁহার অকৃত্রিম জনসেবকত্বের এবং নিজের বোধশক্তিমার প্রগাঢ়ত্বেরই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

আমাদিগকে তৎকার্য্যে চালনা করিতে পারে, ঐরূপ একটি চালক-প্রতিষ্ঠানের আমাদের অপরিহার্য্য প্রয়োজন আছে। বিগত বৎসর (১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ) কলিকাতা কমার্সিয়াল মিউজিয়াম কর্ত্তৃক উক্ত নগরীতে যে যন্ত্রশিল্প ও পরিচালন-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে অল্প মূলধনে নূতন নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন করিবার বহুবিধ উপায় প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই উপায়গুলিকে শুধু প্রদর্শনীতে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া জনসাধারণের কর্ম্মশক্তির ভিতরে যদি ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের পরিসর আপনা হইতেই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। মোট কথা, প্রতি জিলাবাসী যদি তাহাদের সর্ব্ববিধ প্রয়োজন মিটাইয়া লইতে পারেন, তবে সেই জিলায় বেকারত্বের প্রশ্নই উঠিতে পারিবে না। জীবন-চালনায় সচ্ছলতা বিধানোপযোগী দ্রব্যাদি আহরিত হইলেও প্রত্যহ ৮।১০ ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করিতে হইবে, পরিশ্রম না করিলে বেকার নাম লাভ হইবে. এরূপ চিন্তন অস্বাভাবিক। প্রতি মানুষেরই কায়িক পরিশ্রমের ক্ষেত্র ব্যতীত মানসিক ও আত্মিক চর্চ্চার ক্ষেত্রও থাকা উচিত।

বোধপ্রবোধী স্নায়ু (sensory nerves) এবং কর্ম্মপ্রবোধী স্নায়ুর (motor nerves) উত্তম যোগাযোগে অসামঞ্জস্য ঘটিলেই চিন্তায় ও কার্য্যে অসম ভাবের উৎপত্তি হয়। পাশ্চাত্য দেশের ব্যবসায়ীদের কর্ম্মপ্রতিভার মূলে যাহা-কিছু উত্তম, তাহা গ্রহণ করিয়া তাহার আরও পোষণ-বর্দ্ধন সাধন করিতে হইলে আমাদের অন্তর্মুখীন হওয়া একান্তরূপেই আবশ্যক। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ অর্থাৎ আর্য্যঋষিগণ তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, ইষ্টের সহিত যুক্ত হইয়া ইষ্টপ্রাণ হইয়া চলিলে বোধ-প্রবোধী স্নায়ু ও কর্ম্ম-প্রবোধী স্নায়ুর মধ্যে উৎকৃষ্ট রকমের সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়। তাঁহাদের এই ঘোষণা শুধু আমাদের জন্যই নহে, জগতের সকল দেশের সকল লোকেরই জন্য।

আমাদের মোটামুটি বক্তব্য এই যে, যে সমস্ত বৈদেশিক পণ্য-দ্রব্য দ্বারা আমরা এক্ষণে সমষ্টিগতভাবে আমাদের প্রয়োজন মিটাইয়া লইতেছি, প্রতি ব্যষ্টি জিলাবাসী হিসাবে ব্যষ্টি জিলার সেই প্রয়োজন মাফিক তৎপ্রকার

এবং অপরাপর প্রকার পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করিবার এবং তাহার সমতালে সরবরাহ-নীতিকে প্রয়োগ করিবার জন্য আমরা একটি পরিকল্পনা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করতঃ প্রতি জিলাকে যথাসম্ভব স্বয়ং-সম্পূর্ণতায় অধিষ্ঠিত করিয়া তৎ-তৎ-জিলার পারস্পরিক সেবামূলক ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি সাধন করিতে পারি। তাহার ফলে তৎ-তৎ-জিলার লোক সমুদয় ব্যবসায়ের গোড়ায় যে মূলনীতি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা ক্রমে আয়ত্ত করিয়া প্রকৃত ব্যবসায়ী-পদবাচ্য লাভ করিতে পারেন।

আমরা আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব লেখার প্রতিধ্বনি লইয়া সর্ব্বশেষে ইহা লিখিতেছি যে, ব্যবসায়ের গোড়ায় আছে—সেবা বা service, লাভজনক পরিচালনা এবং ইষ্টানুরক্তি।

দর্শন ও শ্রবণ

(১)

রূপ! রূপ! রূপের প্রতি মানুষের কত না সমাকর্ষণ! রূপ-সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিয়াও মানুষ রূপকে নিত্যনূতন করিয়া উপভোগ করিতে চায়। পতঙ্গ যেরূপ আলোকের রূপ দেখিয়া তৎপ্রতি ধাবিত হয় এবং তাহাতেই আত্মবিসর্জ্জন করিয়া ভবলীলা সমাপন করে, অনেক মনুষ্যকেও রূপ-বহ্নিতে আত্মাহুতি দিয়া মনুষ্যত্বের নাট্যাঙ্কে অসময়ে যবনিকাপাত করিতে দেখা যায়। আমরা এক্ষণে যে মহাপুরুষের শতবার্ষিকী জন্মোৎসব প্রতিপালন করিতেছি, তাঁহারই মানস সন্তান গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে, সীতারাম শ্রীর রূপে বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়াছিল না কি? নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর রূপের মোহ হইতে আপনাকে সামলাইয়া লইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাকে পাতিত্যের শাস্তি কম ভোগ করিতে হয় নাই। এমনি কত গোবিন্দলাল, সীতারাম, এমনি কত নগেন্দ্র মনুষ্য সমাজের সর্ব্বত্র ঘোরাফেরা করিতেছে, তাহার কি কোন ইয়ত্তা আছে? রূপ গ্রাহ্য হয় চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা, শ্রবণ গ্রাহ্য হয় কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা। উত্তাল তরঙ্গমালার আকুলিত ফেনপুঞ্জের ন্যায় আমরা শুধু রূপ-তরঙ্গেই নাচিয়া বেড়াইতেছি না, প্রবল প্রতাপান্বিত শব্দ-তরঙ্গের ভিতরেও আমরা নৃত্য করিতেছি। অর্গান, পিয়ানো, এস্রাজ প্রভৃতিতে মনোরম ঝঙ্কার উঠিলেই গমনশীল ব্যক্তিও দণ্ডায়মান হন। তবলায় চাটি পড়িলে অপর তবলাবাদক কান খাড়া করেন। রণদামামা সৈন্যদিগকে শত্রুবধে অগ্রসর হইতে যেরূপ উৎসাহিত করে, তেমন আর কে করিতে পারে?

এই রূপ ও শব্দ কেমন করিয়া উৎপন্ন হয় এবং উহাদের গ্রহণ করিবার শক্তিকে আমরা কতদূর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিতে পারিয়াছি, তৎসম্পর্কে আলোচনা করা যাউক।

নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া একই প্রাণশক্তির স্পন্দন প্রবাহিত হইতেছে। জীবনহীন বলিয়া কোন পদার্থ নাই। মনুষ্যের জীবন আছে; যাহার উপর তাহার নিত্য পদচালনা হয় সেই অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণারও জীবন আছে। পদার্থ মাত্রেরই যুক্ত ও বিযুক্ত হওয়ার ঝোঁক আছে। এই ঝোঁক বা প্রবণতাই পদার্থের জীবন। প্রাণী-দেহ ও শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, উহারা একই প্রকারের জীবনের সাড়া প্রদান করে। কথাটা প্রথমতঃ অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রমাণের পরিচয় লইলে উহাকে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে হয়। সেই প্রাণশক্তির স্পন্দনকে বৈজ্ঞানিক ঈথর-স্পন্দন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং সেই ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যরূপে পরিদর্শন করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক বলেন, ঈথর-সমুদ্রে আবর্ত্তের সমুত্থানে পরমাণুর সৃষ্টি, পরমাণু হইতে বিন্দু, বিন্দু হইতে জগৎ ও মহাজগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রিয়দর্শন বালক যেরূপ ঈথরের রূপান্তর, অমিয় লাবণ্যসম্পন্না নবীনা ষোড়শীও ঈথরেরই রূপান্তর; দৃশ্য-পদার্থ-মাত্রই যেরূপ ঈথরের রূপান্তর, অদৃশ্য সত্তায় যাহা অবস্থান করিতেছে, তাহাও ঈথরেরই রূপান্তর। সর্ব্বত্রই ঈথর, সর্ব্বই ঈথরময়।

এই ঈথর-সমুদ্র অপার, অনন্ত, অসীম। এই মহা সমুদ্রে এক মহা কারণে একটি স্পন্দন জন্মিল। এই স্পন্দন জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই এমনি দুরন্ত হইয়া উঠিল যে, আমাদের এই লক্ষ-কোটী বৎসরের প্রাচীনা, বিশালায়তনা পৃথিবীকে সেকেণ্ডে সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়া ফেলিল। আর একটি স্পন্দন জন্মিল। তখন এই দুইটি স্পন্দন মনুষ্যলোকে আসিয়া হানা দিল। কিন্তু মনুষ্যের দৃষ্টিস্নায়ু (optic nerve) এতখানি অবশক্তিবিশিষ্ট নয় যে, দুইটি মাত্র ঈথর-স্পন্দনের নিকট সে আত্মসমর্পণ করিবে। তারপর ঈথর-সমুদ্রে আর একটি স্পন্দন জন্মিল, ক্রমে আরও জন্মিল। এমনি করিয়া প্রতি সেকেণ্ডে যখন চারি শত লক্ষ কোটী স্পন্দন জন্মিল, তখন দৃষ্টিস্নায়ু পরাজয় স্বীকার করিল, তখন উহারা মনুষ্যের দৃষ্টিস্নায়ুকে উত্তেজিত করতঃ সম্মুখ-মস্তিষ্কে (cerebrum)

সঞ্চালিত হইয়া তাহাদের নয়নে রক্তবর্ণ আলোক জন্মাইল। তারপর স্পন্দন-সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধিত হইয়া পীত, হরিৎ, ভায়োলেট ইত্যাদি নানাবর্ণ উৎপত্তি করিয়া দেখাইতে লাগিল। কিন্তু উহারা যখন ক্রমে পূর্ব্বোক্ত সংখ্যায় দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল, তখন আবার উহাদের পরাজয় ঘটিল। কেননা, তখন মনুষ্যের দৃষ্টিস্নায়ু কিছুই দেখিতে পায় না। ঈথর-স্পন্দন তাহার সকল প্রকার মারণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াও দৃষ্টিস্নায়ুর অন্ধকারের দুর্ভেদ্য দুর্গকে ভেদ করিয়া উঠিতে পারে না। দৃষ্টিস্নায়ু তখন রণবিজয়ী হইয়া অন্ধত্বকে আমন্ত্রণ করে। যে আলোক-স্পন্দন প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল পরিভ্রমণ করিয়া বৈজ্ঞানিকের আঙ্কিক হিসাবে বিস্ময় উৎপাদন করে, দেখা যাইতেছে, সেই আলোকের সর্ব্বাঙ্গতায় মানুষ চক্ষুরত্ন শোভিত হইয়াও অন্ধ।

শ্রবণস্নায়ুর (auditory nerve) অবস্থা কি প্রকার দেখা যাউক। ভূপৃষ্ঠ হইতে ৪৫ মাইল ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত বায়ু বিদ্যমান। ঈথর-তরঙ্গে যেরূপ আলোর উৎপত্তি হয়, সেইরূপ বায়ুতরঙ্গে শব্দ জন্মে। কর্ণের কর্ণপটহ (tympanum) এবং শ্রবণস্নায়ু শব্দ গ্রহণ করিবার প্রধান যন্ত্র। বায়ুতে প্রতি সেকেণ্ডে ত্রিশের অনধিক বার কম্পন জন্মিলে যে শব্দের উৎপত্তি হয়, তাহা উহারা গ্রহণ করিতে পারে না। আবার প্রতি সেকেণ্ডে ত্রিশ হাজার বার কম্পন জন্মিলে শব্দ অসহনীয় হয়। স্পন্দন-সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইলে কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রতি সেকেণ্ডে ৩০ হইতে ৩০ হাজার বার বায়ু-তরঙ্গ স্পন্দিত হইলেই শ্রবণস্নায়ু আমাদিগকে শব্দ শ্রবণ করায়। তদন্যথায় সে বধিরতাকে আবাহন করে। পৃথিবীতে বধিরের সংখ্যা কয়েক লক্ষ মাত্র কিন্তু বায়ু-তরঙ্গের সমগ্রতায় আমরা ত সকলেই বধির।

কিন্তু স্বতঃ অনুসন্ধিৎসাপ্রিয় মানুষ ক্ষুদ্রকে লইয়া পরিতুষ্ট থাকিতে পারে না। বৃহৎকে জানিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার দুর্দ্দমনীয়। তাই, মানুষ কি হইতে কি হয় এবং কেমন করিয়া হয়, তাহার ক্রমিক পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণায়

এমন কতগুলি যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে, যদ্দ্বারা আমাদের দর্শন-শক্তি ও শ্রবণ-শক্তি-পরিবর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছে।

কোপারনিকাস (Copernicus) পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। তাহারই মতকে সর্ব্বজনগ্রাহ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম গেলিলিও (Galileo) তৎকালীন প্রচলিত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতি সাধন করেন এবং তৎসহায়তায় পৃথিবীর পরিভ্রমণ-তত্ত্বকে প্রমাণ করেন। বর্ত্তমানে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আরও উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই দূরবীক্ষণ দ্বারা নীল নভোমণ্ডলের কত বিচিত্র রহস্যের মর্ম্মার্থ জানা গিয়াছে। বুধ সূর্য্য হইতে ৩ কোটী ৬০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। যতগুলি গ্রহ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তন্মধ্যে বুধ সূর্য্যের নিকটতম। ইহা তাহার কোলের ছেলে। পৃথিবী ৯ কোটী মাইল দূরে অবস্থিত। প্লুটো সর্ব্বাপেক্ষা দূরে। ইহার দূরত্ব ৩৭০ কোটী মাইল। দূরবীক্ষণ এবং স্পেক্ট্রোস্কোপ (spectroscope) দ্বারাই এই সব তথ্য জানা গিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক বৃহৎকে যেমন জানিয়াছেন, তেমনি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রকেও জানিয়াছেন। জীবাণুতত্ত্ব লইয়া জীবাণুবিজ্ঞান (bacteriology) নামক একটি শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। খোকা খেলা করিতে যাইয়া হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে। এক বিন্দু রক্ত পড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিক অণুবীক্ষণ ধরিয়া দেখিলেন, খোকার ঐ এক বিন্দু রক্তে সজীব জীবাণু আনন্দে পরিভ্রমণ করিতেছে। আরও দেখিলেন, রক্ত-জীবাণুগুলি (red corpuscles) $\frac{১}{৩২০০}$ ইঞ্চি এবং শ্বেত-জীবাণুগুলি (white corpuscles) $\frac{১}{২৫০০}$ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং এক ঘন ইঞ্চির $\frac{১}{১০০}$ অংশে ৫০ লক্ষ জীবাণু দিব্য আরামে বসবাস করিতেছে।

দুই প্রকার দর্শন-শক্তির আমরা পরিচয় পাইলাম। অধুনা আর এক প্রকার দর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই দর্শন-শক্তি বলে যে-কোন-স্থানের প্রতিমূর্ত্তি প্রবল শক্তিধর ঈথর-স্পন্দন দ্বারা বহাইয়া উহাকে যে-কোন-স্থানে প্রতিমূর্ত্ত করা যায়। ইহাকে বলে টেলিভিশন (television)। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এক জন বৃটিশ বৈজ্ঞানিক ইহা আবিষ্কার করেন।

টেলিগ্রাফ, টেলিফোন এবং রেডিও দ্বারা দূর-শ্রবণ সম্ভব হইয়াছে। স্যামুয়েল মর্স (Samuel Morse) টেলিগ্রাফের আবিষ্কারক। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নিউইয়র্কে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার আবিষ্কার প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন। টেলিফোনের আবিষ্কর্ত্তা গ্রাহাম বেল (Alexander Graham Bell)। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথম টেলিফোনের সহায়তায় এক স্থানের সংবাদ অপর স্থানে পাঠাইতে সমর্থ হন। জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক হার্জ্জ শুধু ঈথর-তরঙ্গ বলে শব্দ প্রেরণ করিবার যে মূলসূত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাকেই ভিত্তি করিয়া জগদীশচন্দ্র ও মার্কনী প্রায় একই সময়ে বেতারে সংবাদ-প্রেরণের যন্ত্র আবিষ্কার করেন। আবার উহারই মূলসূত্র হইতে বেতার টেলিফোন বা রেডিওর সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ সিংহাসন আরোহণ কালে যে বাণী প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আমরা রেডিওর কল্যাণে এখানে বসিয়াই শুনিতে পারিয়াছিলাম এবং নিত্যই আমরা দূর দেশের গীতবাদ্য, বক্তৃতা ইত্যাদি শ্রবণ করিয়া কর্ণযুগলের মহা পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছি।

(২)

দর্শন দেখা, শ্রবণ শোনা—অর্থ একেবারে সোজা। কিন্তু যাহা সোজা, তাহাই মানুষ বাঁকাইয়া তোলে। মানুষের স্বভাবই বক্রগতিসম্পন্ন। দার্জ্জিলিং পাহাড়ে রেল লাইন আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, সোজা যাইতে পারে না। মানুষ স্বরূপতঃ ঊর্দ্ধ লোকের জীব। ঊর্দ্ধলোকের প্রাণন-ধারা প্রতি নিয়ত জানায় ও অজানায় তাহার উপর ক্ষরিত হইয়া তাহাকে তন্মুখীনতায় সমাকৃষ্ট করিতেছে। তাই, তাহার চলা ও বলা হয় আঁকাবাঁকা। জৈগীষব্য যোগ-প্রভাবে তাঁহার দশ কল্পের জন্ম-বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। আবট্য তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—আপনি দশ কল্প পর্য্যন্ত সুরনরতির্য্যক্ যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। শুনিতে ইচ্ছা করি, কোন্ জন্মে যথার্থ সুখ উপভোগ করিয়াছিলেন? জৈগীষব্য উত্তরে বলিয়াছিলেন—যথার্থ সুখ কোন জন্মেই ভোগ করিতে পারি নাই।

কৈবল্য লাভ করিতে না পারিলে যথার্থ সুখ উপভোগ করা যায় না। মানুষ সেই কৈবল্যধামের জীব। অগণিত দার্জ্জিলিংএর পাহাড় একটির উপর আর একটি তুলিয়া সজ্জিত করিলে যতখানি উচ্চতাবিশিষ্ট হইবে, কৈবল্যধাম তদপেক্ষাও উচ্চ। তাহার উচ্চতার পার নাই। সেই মহামহিমান্বিত উচ্চলোকে অধিবাস-জনিত যে বিরাট স্মৃতি মানুষের অভিলব্ধ হইয়াছে, তাহাকেই সংগুপ্তির আবরণের ভিতর দিয়া বহন করিতেছে ঐ সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত মানব তাহার মস্তিষ্কের স্নায়ুমালায়। সুতরাং তাহার দেখা ও শোনা যে তদনুপাতে আকাঙ্ক্ষাগতিসম্পন্ন ও বৃহৎ পরিধিবিশিষ্ট হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

দর্শন ও শ্রবণ। অর্দ্ধস্ফুটকলমুখরিত শিশুও দেখে ও শুনে। উদ্ধমূল নাসিকার দুই প্রান্ত ব্যাপিয়া ভ্রূযুগলের কৃষ্ণরেখা শিরে প্রলম্বিত করিয়া যে আয়ত লোচনদ্বয় শোভা পায় মানুষের সুবিস্তারিত আননকমলে, নরের যাহা শৌর্য্য-বীর্য্যের ব্যঞ্জনা, নারীর যাহা সৌন্দর্য্যের পরম বৈভব, তাহার ভিতরে বিদ্যমান রহিয়াছে শুভ্র, স্বচ্ছ অক্ষিগোলক। এই অক্ষিগোলককে স্নেহাবরণে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, পর পর শ্বেতমণ্ডল, কৃষ্ণমণ্ডল এবং মুকুরিকা। এই মুকুরিকাতে সংযোজিত রহিয়াছে দৃষ্টিস্নায়ু যাহা দর্শন-জ্ঞান বহন করিবার প্রধান যন্ত্র। গণ্ডপ্রদেশদ্বয়কে অতিক্রম করিয়া মস্তকের দুই প্রান্তে 'কুসুমসঙ্কাশং' দেদীপ্যমান রহিয়াছে প্রতি মানুষের যে কর্ণযুগল, তাহারই শ্রবণনলীর অন্তর্ভাগস্থিত শ্রোত্রাকাশের সহিত শ্রবণস্নায়ু সংযোগান্বিত। এই শ্রবণস্নায়ুই শ্রবণ-জ্ঞান বহন করিবার প্রধান যন্ত্র। দর্শন যন্ত্র ও শ্রবণ যন্ত্র স্বয়ং-শক্তিধর নয়। উহাদের মূলে আছে মন। মন যখন চক্ষু ও কর্ণে সংযোজিত হয়, তখনই আমরা দেখি ও শুনি।

আমরা আমাদের সক্ষমতার অনুপাতে চলমান ঘটনাবলীর মধ্যে যে অনুকূলতা-প্রতিকূলতা সৃষ্টি করিয়া থাকি, তাহা বিস্তৃততর জগতে বিসর্পিত হইয়া এবং যথাযথভাবে কার্য্য সম্পাদন করিয়া কেমন করিয়া 'অদৃষ্ট' রূপে পুনরায় আমাদের নিকট সমুপস্থিত হয়, তাহা কি আমরা জানি ?

কিন্তু ইহা জানি যে, ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্ ঋষিগণ ভূমার অনুসন্ধানে সমাহিতপ্রাণ হইয়া যে ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের জাগতিক দর্শন ও শ্রবণ জ্ঞানেরই সুমহান্-পরিব্যাপ্তির ইতিহাস। তাহা কল্পলোকের জালবুনানি নয়।

সাঙ্খ্যকারের মতে যে বস্তু অক্ষিগোলক হইতে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রসর্পিত হইয়া দূরস্থ বস্তুর সহিত সম্মিলিত হয়, যে বস্তু কর্ণের শ্রোত্রাকাশ হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া বাহিরের শব্দ-কম্পন গ্রহণ করে, সেই সেই বস্তু আহঙ্কারিক বা অহং-তত্ত্বের পরিণাম-বিশেষ। মহর্ষি কপিল পরম কারণের উদ্দীপ্তিময় অনুসন্ধানের ভিতর দিয়া সৃষ্টিতত্ত্বকে যে প্রকারে উপলব্ধি করতঃ অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—
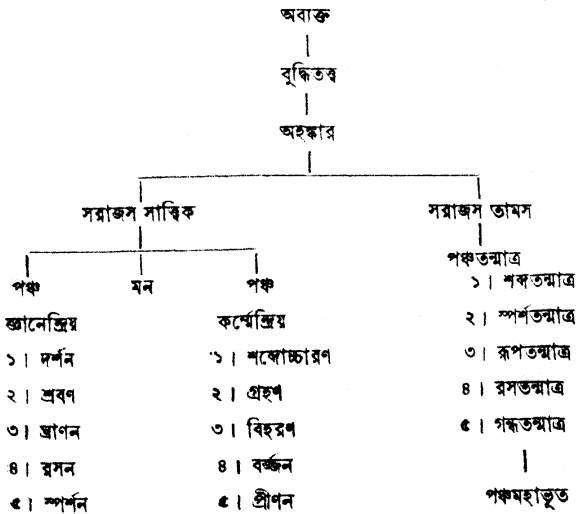
নিখিল বিশ্ব ইহারই ভিতর সীমাবদ্ধ। ইহারই প্রতিচ্ছবি মানব। মানবের তত্ত্ব (যাহা যাহা লইয়া মানব, তাহা) দুই প্রকারে অবধারণ-প্রয়াস-যোগ্য। এক—তাহার বৃত্তিনিচয়ের ক্রম-বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া তাহার সত্তার ক্রমাভ্যন্তর প্রদেশে গমন করা। দুই—পরম কারণকে জানিবার প্রয়াসের ভিতর দিয়া তাহার তত্ত্ব-স্বরূপের দ্বার উদ্ঘাটন করা। আর্য্যঋষিগণ শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাহাই প্রকৃষ্টতম পন্থা। "একংসদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"—সং, অস্তিত্ব বা বস্তু এক, তাহাকে বহু বলা হয়। সেই একের ঐশ্বর্য্যে অধিগমন করিতে সক্ষম হইলে আর কোন ঐশ্বর্য্যই অনধিগম্য থাকে না। মহর্ষি কপিল সেই একেরই চিদৈশ্বর্য্যের পরিচয় লাভ করিয়া মানবের জাগতিক দর্শন-জ্ঞান ও শ্রবণ-জ্ঞানের মূল-উৎস আবিষ্কার করিয়াছেন।

সেই উৎস কোথায়? সত্তার ক্রমিক স্তর-পারম্পর্য্যকে অতিক্রম করিয়া যে স্তরে আরোহণ করিলে আমিই সব—আমিই ব্রহ্মাণ্ডময়—বিশ্বের গ্রহ-উপগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য ধূলিকণা পর্য্যন্ত আমারই প্রতিচ্ছবি—এই বুদ্ধি দ্বারা আপন সামগ্র্য প্রলিপ্ত হয়, সেই স্তরের একান্ত দেশে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে সেই উৎসদ্বয়। দৃষ্টিস্নায়ু ও শ্রবণস্নায়ু বলে আমরা যাহা দেখি ও শুনি, সেই উৎসদ্বয় তাহারই অনন্ত-প্রসারণ-সমন্বিত পরিব্যাপ্তির কেন্দ্র-স্থল অর্থাৎ আমাদের ঐ দেখা ও শুনার পরিধিকে ক্রম-পরিবর্দ্ধনে সান্তাতীত অবস্থার দিকে আগুয়ান করিয়া লইয়া চলিলে সত্তার যে কেন্দ্রে উহাদের পৃথক স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া যায়, সেই কেন্দ্রই উহাদের মূল জনয়িত্রী। আর্য্য ঋষি ব্রহ্ম অনুরক্তির চেতন-আবেশে উদ্দীপনাময়ী বাণীতে ইহা সঙ্কেত করিয়া গিয়াছেন যে, সেই অমৃত-লোকের উৎসধারাকে অভিলব্ধ করার এক মাত্র পথ নিদিধ্যাসন বা তত্ত্বাভ্যাস অর্থাৎ ইষ্টে বা ব্রহ্মস্বরূপে যুক্ত হওয়া।

———

অভিব্যক্তিবাদ

(১)

চার্লস ডারুইন

অভিব্যক্তিদের আবিষ্কারক চার্লস ডারুইন ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের শ্রুবেরি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। যে আবিষ্কার সাধন করিয়া চার্লস ডারুইন বিজ্ঞানের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তেমন সৌভাগ্য খুব কম বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থদ্বয় 'অরিজিন অব স্পেসিস্' এবং 'ডিসেণ্ট অব ম্যান্' যথাক্রমে ১৮৫৯ এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহারও পূর্ব্বে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেন্স্‌লোর পরামর্শক্রমে 'বিগ্‌ল' জাহাজে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া চার্লস ডারুইন ভূ-বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্পর্কে বহু তথ্যাদি পরিপূর্ণ রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক শ্রেণীর জীবই নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, এই মতবাদ চার্লস ডারুইনের পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ফরাসী প্রাণিতত্ত্ববিৎ লামার্ক ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন। সেই মতবাদ তৎকালীন বিশিষ্ট প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ কর্ত্তৃক সমর্থিত এবং তাহাদের আপন আপন অভিজ্ঞতার সংযোগ দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা অভিব্যক্তিবাদের নিখুঁত চিত্ররূপে বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হয় নাই। চার্লস ডারুইনের গৌরব এই স্থলে যে, তিনি অসাধারণ মনীষা ও সুগভীর অধ্যবসায় বলে অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধীয় তৎকালীন প্রচলিত বিচ্ছিন্ন মতামতগুলির নির্য্যাস নিষ্কাশন করিয়া এবং উহাদের অপরিস্ফুট অংশগুলির পারম্পর্য্যানুক্রমিক বিকাশ সংসাধন করিয়া উহাকে সংশয়াতীত প্রামাণিক তত্ত্বরূপে বৈজ্ঞানিক জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অভিব্যক্তিবাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গঠনে চার্লস ডারুইন হাক্সলি, লায়াল, হুকার, ওয়াট্‌সন, ওয়ালেস, হেকেল প্রভৃতি তাঁহার সমসাময়িক বিশিষ্ট প্রকৃতিবাদিগণের নিকট প্রভূত সহায়তা

পাইয়াছেন। বহু অপরিচিত স্থান হইতেও তিনি অযাচিতভাবে বহু প্রকারের তথ্যাদি লাভ করিয়াছেন। তদুপরি তিনি স্বয়ং ভূ-বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান প্রভৃতির বিভিন্ন শাখার বিচিত্র তথ্যরাজী অধিগত করিয়া উহাতে নূতন আলোক প্রতিফলিত করিবার জন্য যে অসামান্য পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার কথা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।

জীবন-সংগ্রাম

অভিব্যক্তিবাদের মূলে আছে, জীবন-সংগ্রাম অর্থাৎ যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন এবং উদ্বর্দ্ধন।

কেন্দ্রায়িত প্রাণশক্তি অনন্ত প্রসারণ লইয়া যখন হইতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুজীবে আকারিত হইয়া প্রাণীরূপে পর্য্যবসিত হইল, তখন হইতেই ঐ অহংবোধ-সম্পন্ন জীবাণু-কুলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে জীবন-সংগ্রাম।

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ কুক যখন সর্ব্বপ্রথম স্যাণ্ডুইচ দ্বীপ আবিষ্কার করেন, তখন সেই দ্বীপে ৩ লক্ষ অধিবাসী ছিল। প্রায় এক শত বৎসর পরে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের লোকগণনায় দেখা গেল, তাহাদের সংখ্যা ৫১ হাজারে পরিণত হইয়াছে। আমেরিকা, আফ্রিকা এবং পূর্ব্ব প্রাচ্যের অপরাপর দ্বীপসমূহের আদিম অধিবাসীদের সংখ্যা এই প্রকারেই কঠোর জীবন-সংগ্রামের ফলে ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। প্রতিকূল প্রকৃতি ও প্রাণিকুলের সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিয়া যাহারা জীবিত থাকিতে পারে, তাহাদেরই উদ্বর্ত্তন এবং উদ্বর্দ্ধন হয়।

"জারজনন" (intercrossing) দ্বারা আমরা পশুপক্ষী ও বৃক্ষে কতপ্রকার নূতন শ্রেণীর (species) সৃষ্টি করিয়া থাকি। তাহারাও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, জলবায়ু এবং প্রকৃতির সহিত খাপ খাওয়াইয়া বাড়িয়া উঠিয়া বংশ পরম্পরায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ডারুইনের সিদ্ধান্ত এই যে, আমরা অতি সামান্য চেষ্টায় ও অল্প সময়ে যে বৈচিত্র্যের সৃজন করি, প্রকৃতি কোটী কোটি বৎসর ব্যাপিয়া তাহার বিপুল সংহত শক্তিবলে তেমনিভাবে শ্রেণী হইতে উপশ্রেণী, উপশ্রেণী হইতে তদুপশ্রেণী এবং তাহারও উপশ্রেণী-পরম্পরায় অঙ্কুরিত

বৈচিত্র্য দ্বারা পৃথিবীর জলস্থল পরিশোভিত করিতেছেন। ভ্রূণতত্ত্ববিদ্‌গণ *ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, জীব যেসকল পর্য্যায় অতিক্রম করিয়া* যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হয়, তাহার সেই অবস্থায় ভ্রূণের ক্রমপরিণতির ভিতরে তাহার পূর্ব্বতন অবস্থার বিকাশ ঘটিয়া থাকে।

পারিপার্শ্বিক সংস্থান এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার, অব্যবহার ও অপব্যবহার দ্বারা জীবমাত্রই বৈসাদৃশ্যযুক্ত হয়। তুষারস্নাত দেশ-বিশেষের জীবজন্তু বা বৃক্ষলতা সূর্য্যোত্তাপতপ্ত দেশে আনয়ন করিলে তাহারা শেষোক্ত দেশের আবহাওয়ার উপযোগী হইয়া বৃদ্ধি পাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যে দেশের যে প্রাণীর জীবন ধারণের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যে প্রকার, তদনুযায়ী তাহার দেহের গঠন সম্পূর্ণীকৃত না হইলে সেই দেশে তাহার জীবন-সংগ্রামে পরাজয় ঘটে। এই জীবন-সংগ্রামের ফলেই কোন জন্তু দ্রুতগমনশীল, কোন জন্তু লম্বাকৃতিবিশিষ্ট, কোন জন্তু ক্ষীণ বা ভারী অবয়বসংযুক্ত হইয়াছে। উষ্ট্রের দীর্ঘ গলা, পশুরাজ সিংহের বিপুল বলশালিতা, গর্দ্দভের অঙ্গসঞ্চালনে মন্থরতা ইত্যাদির কারণ তাহাদের আদি-শ্রেণীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তদনুপাতিক ব্যবহারের ফল। জীবন চালনার অনুকূলে যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন হয়, সেই সকলের কার্য্যকরী বৈশিষ্ট্য তেমনি রকমে পরিস্ফূরিত হয় এবং নিষ্প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্য্যকারিতায় অপহ্নব ঘটে। বহির্বিকাশে শ্রেণী হইতে শ্রেণীর পার্থক্য এই প্রকারেই ঘটিয়া আসিয়াছে।

জীবমাত্রেরই নিজস্ব শ্রেণীগত ভাষা আছে। কোন একটি জীব অপর জীব দ্বারা আক্রান্ত হইলে সে চীৎকার করিয়া আপন গণের সাহায্য প্রার্থনা করে এবং ঐ চীৎকাররূপী ভাষাকে যথাসম্ভবরূপে সে বিপদসঙ্কেতজ্ঞাপক করিতে প্রাণপণে প্রয়াস করে। আপন ভাব অপরকে বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য জীব মাত্রেরই এই প্রকার যে প্রয়াস, তাহাই ভাষার উদ্বর্দ্ধনমূলক সংগ্রাম। ভাষা সম্পর্কে যাহা প্রয়োজ্য, জীবের অপরাপর অন্তঃ-বৃত্তি সম্পর্কেও তাহাই প্রয়োজ্য। অন্তর্বিকাশে শ্রেণী হইতে শ্রেণীর প্রার্থক্যও এই প্রকারেই ঘটিয়াছে।

মানবের অভিব্যক্তি

আকৃতির সাদৃশ্যে, বুদ্ধিবৃত্তির সাম্যে এবং সর্ব্বোপরি মস্তিষ্কের গঠন-প্রণালীর অভিনব একত্বে ডারুইন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বানর মনুষ্যজাতির প্রত্যক্ষ পূর্ব্বপুরুষ; আফ্রিকার নিকৃষ্ট শ্রেণীর আদিম মনুষ্য এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বানরে তিনি বিশেষ কোন পার্থক্য দেখেন নাই, দেখা যায়ও না।

মানবের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ডারুইন বলেন—"The most ancient progenitors in the kingdom of the vertebrata consisted of marine animals resembling Ascidians. These animals probably gave rise to a group of fishes as lowly organised as lancelet and genoids. From such fish a very small advance would carry us to the Amphibians. From these mammals, monkeys; the from the latter, at a remote period. Man—the wonder and glory of the Universe proceeded." Descent of Man. page 254—255.

তাৎপর্য্য—মেরুদণ্ডবিশিষ্ট এক প্রকার ক্ষুদ্র প্রাণী হইতে মৎস্যের উৎপত্তি হইয়াছে। ক্রমবিকাশের ধারায় এই মৎস্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। পশ্চাৎ শ্রেণীর মৎস্য হইতে উভচর প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। এই উভচর হইতে স্তন্যপায়ী জন্তু, স্তন্যপায়ী জন্তু হইতে বানর, বানর হইতে সৃষ্টির পরম গৌরব—মনুষ্য উৎপত্তি লাভ করিয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অতীতের এক স্মরণাতীত, গহনতিমির যুগে আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ গরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাং ওটাং প্রভৃতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বানরের সমপর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন।

(২)

সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র সূর্য্য। পৃথিবী এই সৌরমণ্ডলের একটি গ্রহ। কোন এক আকর্ষণে সৌরদেহের অংশ-বিশেষ বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবী এবং

সৌরমণ্ডলের অপরাপর গ্রহাদির জন্ম দান করিয়াছে। মহাব্যোমে (Spiral Nebulae) এরূপ জ্যোতিষ্ক আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা সূর্য্য হইতে প্রাচীনতর এবং অধিকতর ক্ষমতাশালী। কিন্তু আকাশীয় জ্যোতিষ্ক মাত্রই যে কোন কালে তরল ও বায়বীয় ছিল, এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে এক্ষণে মতভেদ নাই। পৃথিবীও তপ্ত ও তরল বাষ্পসমন্বিত অবস্থায় সৌরদেহ হইতে জন্ম লাভ করে। পরে উহার আভ্যন্তরীণ তাপক্ষয়ে ঐ তপ্ত তরলীকৃত বাষ্প জমাট বাঁধিয়াছে, তাহার চারিধারের বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘলোক রচনা করিয়াছে, ভূ-কম্পনের ফলে পাহাড়-পর্ব্বতের সৃষ্টি হইয়াছে, বৃষ্টিধারা ও তুষার-স্রোতের ফলে নদনদীর রেখা পরিস্ফীত হইয়াছে।

পৃথিবীর গঠন এবং বয়স

বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হয়। তৎসম্পর্কে জেম্‌স হটনের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে এডিনবরা রয়েল সোসাইটির এক অধিবেশনে হটন সর্ব্বপ্রথম তাহার ভূ-তত্ত্বের আবিষ্কারের বিষয় বর্ণনা করেন। জেম্‌স হটনের ভূ তত্ত্ব গবেষণার সারমর্ম এই যে, ভূ-গর্ভস্থ তাপই ভূ-লোক গঠনের প্রধান উপাদান। সমুদ্রশায়িত কর্দ্দমের শিলায় পরিণতি এবং ভূ-কম্পনের ফলে শিলার সমুত্থানে পাহাড়-পর্ব্বতের রচনা—ইহা ভূগর্ভস্থ তাপেরই কার্য্য। পর্ব্বতগাত্রের স্তরে স্তরে যেসকল সামুদ্রিক জীবকঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছিল, জেম্‌স হটনের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ উহাদের তদনুরূপ সংস্থানের কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি বাহির করিতে পারেন নাই। জেম্‌স হটনই সর্ব্ব প্রথম তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন।

হটন ভূ-তত্ত্ব-বিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া উহা হইতে যে নূতন আলোক নির্গত করিলেন, তাহারই ফলে প্রাণীর জন্মকাল এবং পৃথিবীর বয়স নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টার সূত্রপাত হয়। ভূ-গর্ভে প্রোথিত এবং স্তরে স্তরে সজ্জিত জীবকঙ্কাল মাত্রই ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান্

বস্তু। ভূ-গর্ভের এক লক্ষ ফিট্ নিম্ন পর্য্যন্ত জীবকঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই এক লক্ষ ফিট্ ভূ-স্তর জমাট বাঁধিতে যত বৎসর লাগিয়াছে, অন্ততঃ তত বৎসরের মধ্যে প্রাণীর জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ধরা যায়। ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণ জীব-কঙ্কাল-সমন্বিত নিম্নতম ভূ-স্তরের শিলামৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, উহাদের স্থান-বিশেষের উদ্ভব-কাল ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ৭০ কোটী বৎসরের প্রাচীন। সুতরাং এই হিসাবে আদিম প্রাণীর জন্মকালও ৭০ কোটী বৎসরের প্রাচীন বলিয়া ধরিতে হয় এবং পৃথিবীর বয়স তদপেক্ষাও বহুগুণে বেশী বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

ভূ-গর্ভ হইতে যে তাপ নির্গত হইতেছে, তাহার বাৎসরিক পরিমাণের একটা হিসাব বাহির করিয়া গলিত অবস্থা হইতে পৃথিবী বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিতে কত বৎসর অতিক্রম করিয়াছে, তাহা অবধারণ করা যায়। লর্ড কেল্‌ভিন তৎপ্রকার সূত্রে গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ১০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং পৃথিবীর বয়স যে তদপেক্ষাও বেশী, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

নরওয়ের পুরাতন গ্রানাইট মাটীর বহু প্রাচীন রূপান্তরিত বস্তু। তাহার বয়স নির্দ্ধারিত হইয়াছে ১০০ শত কোটী বৎসর। আমেরিকার ন্যাশনাল রিসার্চ্চ সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক লেনের মতে উক্ত গ্রানাইট মাটীর প্রাচীনতম রূপান্তরিত বস্তু নহে। পুরাতন পাহাড়-পর্ব্বতাদির গাত্রে পৃথিবীর প্রাচীনতম মাটীর রূপান্তরস্বরূপ যে সমস্ত শিলাস্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার রাসায়নিক বিশ্লেষণের সাহায্য লইয়া অধ্যাপক লেন বলেন যে, পৃথিবীর বয়স ১২৫ কোটী বৎসরের কম নহে।

কানাডার জিওলোজিকেল সার্ভে বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর এলস্‌ওয়ার্থ কানাডার বহু স্থানের মাটী খুঁড়িয়া সেই সব মাটীর স্তূপ রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মাটীতে যে প্রকার রেডিও এ্যাক্টিভ উপাদান এবং সীসার রূপান্তর দেখা যায়, তাহা হইতে হিসাব করিয়া বলা চলে, পৃথিবীর বয়স অন্ততঃ ১ হাজার কোটী বৎসর।

অধ্যাপক লেন তাঁহার এই অভিমতে আস্থা স্থাপন করেন নাই। মোটামুটি ভাবে ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণ পৃথিবীর বয়স ২০০ শত কোটী বৎসর বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন যুগ বা স্তর

মানব-জাতি-কর্ত্তৃক পৃথিবীর পৃষ্ঠে যে যুগের চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা দুই অংশে বিভক্ত—ঐতিহাসিক এবং প্রাগৈতিহাসিক। শেষোক্ত যুগ প্রস্তর, তাম্র ও লৌহ যুগ ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত। আবার প্রস্তর যুগ দুইভাগে বিভক্ত—পেলিওলিথিক এবং নিও-লিথিক। উহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পেলিওলিথিক যুগের প্রস্তর বিনির্ম্মিত দ্রব্যাদি অপেক্ষা নিওলিথিক যুগের দ্রব্যাদির গঠন-পারিপাট্য উন্নততর ছিল। প্রস্তর, তাম্র ও লৌহ—এই তিন যুগে মানবজাতির ক্রমোন্নতি-পারম্পর্য্যে তিন প্রকার সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। ঐ তিন যুগ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমানভাবে অভ্যুদয় লাভ করে নাই। ইজিপ্ট যখন তাহার সভ্যতার চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছিল, ইউরোপে তখন প্রস্তর যুগ। গ্রাসে যখন লৌহ যুগের অভ্যুদয় হয়, ইটালীতে তখন তাম্র যুগ। প্রস্তর, তাম্র ও লৌহ যুগের মানব ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ভূ-গর্ভ হইতে আবিষ্কার করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ পৃথিবীর বুকে যে যুগ বা স্তরের রেখাপাত করিলেন, ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাকে ডিঙ্গাইয়া ভূ-গর্ভপ্রোথিত জীবকঙ্কাল এবং শিলাস্তরের উৎপত্তিকালের সমান্তরালতায় সমগ্র পৃথিবীর স্তরাবলীকে পাঁচটি প্রধানভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই দুরূহ কার্য্যে প্রসিদ্ধ ভূ-তত্ত্ববিৎ লায়াল, গিকি, ইভান্‌স, লাবক, ক্রল, টেলার প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভূ-স্তরের ক্রম-প্রাচীনত্ব অনুসারে উহাদের বিভাগগুলি এইরূপ :—

যুগ বা স্তর	সময়
১। কোয়াটারনারি	বর্ত্তমান বা পোষ্ট গ্লেশিয়াল, প্লিষ্টোসিন

যুগ বা স্তর	সময়
২। কাইনোজোইক	প্লাইওসিন, মাইওসিন, ওলিগোসিন, ইওসিন
৩। মেসোজোইক	ক্রিটাসিয়ন, জুরাসিক, ট্রায়াসিক
৪। পেলিওজোইক	
৫। আরশিয়ান	

কোন্ স্তরে কোন্ কোন্ প্রাণীর আবির্ভাব হইয়াছিল

আরশিয়ান যুগে কোন প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। পেলিওজোইক স্তরে সর্ব্বপ্রথম মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জলচর প্রাণী উৎপত্তি লাভ করে। সেই জলচর প্রাণী হইতে মৎস্য, মৎস্য হইতে উভচর প্রাণী ও সরীসৃপের অভ্যুদয় হয়। মেসোজোইক স্তরে পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর উৎপত্তি হয়। কাইনোজোইক স্তরের ইওসিন ও ওলিগোসিন বিভাগে লেমুর ও সিমিয়া জাতীয় বানর, মাইওসিন বিভাগে মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট বানর বা এপম্যান এবং প্লাইওসিন বিভাগে মানবের আবির্ভাব হয়। কোয়াটারনারি স্তরের প্লিষ্টোসিন বিভাগ পেলিওলিথিক যুগ এবং বর্ত্তমান বা পোষ্ট-গ্লেশিয়াল বিভাগ যথাক্রমে নিওলিথিক যুগ, তাম্র যুগ এবং লৌহ যুগের কাল।

আদিম মানবের আবির্ভাব স্থল :—

আদিম মানবের আবির্ভাব সম্বন্ধে ডারুইন বলেন, "It is probable tha Africa was formerly inhabited b extinct apes closely allied to the gorill and chimpanzee ; and as these tw species are now man's neares allies, it is some-what more probable that our earl progenitors lived in the African continent tha

elsewhere; but it is useless to speculate on this subject; for two or three anthropomorphous apes nearly as large as a man existed in Europe in Miocene age." Descent of Man. Page 240.

তাৎপর্য্য—গরিলা এবং শিম্পাঞ্জী জাতীয় বানর এক্ষণে অবলুপ্ত হইয়া গেলেও প্রাচীনকালে খুব সম্ভব আফ্রিকায় বাস করিত এবং উহারাই যখন মানব জাতির প্রত্যক্ষ পূর্ব্বপুরুষ, তখন অন্য স্থান অপেক্ষা আফ্রিকাতেই মানব জাতির প্রথম আবির্ভাব অধিকতর সম্ভব। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কেননা, মাইওসিন যুগের ইউরোপেও দুই তিনটী নরাকৃতিবিশিষ্ট এবং নরের সমান বানরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

ডাক্তার ওয়ারেন তৎপ্রণীত 'প্যারাডাইজ ফাউণ্ড' নামক পুস্তকে মানবজাতির আদিম বাসস্থান উত্তর মেরু বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ওয়ালেস্ ইউরেশীয় সমতল অধিত্যকাকে এবং মেক্সমূলার ইরাণীয় উপত্যকাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন যে, আর্য্য, মঙ্গোলীয়, দ্রাবিড়ী, নিগ্রো এবং সেমিটিক জাতীয় মানব বিভিন্ন কেন্দ্রে সমসাময়িককালে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহারা এক গোষ্ঠী (family) বা সমরক্তোৎপন্ন নহে। এই শেষোক্ত মত আমাদের নিকট সমীচীন এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

(৩)

পৃথিবী আপনার মেরুদণ্ডের নির্ভরতায় অয়নতলবৃত্তের (plane of the earth's orbit) সহিত কৌণিক ভাবে

উত্তরমেরু

(৬৬½°) অবস্থিত থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। তাহার এবম্প্রকার বৃত্তগত গতির ফলে সূর্য্যের কিরণ বৎসরের বিভিন্ন কালে বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বে লম্ব ভাবে পতিত হইয়া শীতোষ্ণতার পরিমাণে বৈষম্য উৎপাদন করে অর্থাৎ

ঋতুভেদ জন্মায়, ইহাই আমরা জানি। কিন্তু ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, আলপ্‌স এবং হিমালয় পর্ব্বতমালা যখন গাত্রোত্তোলন করে নাই, যখন এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপসমষ্টি মাত্র ছিল, সেই সুদূরবর্ত্তী পেলিওজোইক যুগে পৃথিবীর আবহাওয়ায় কোন প্রকার বৈচিত্র্য ছিল না। তৎপরবর্ত্তী মেসোজোইক ও কাইনোজোইক যুগে এই অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাহারও পরবর্ত্তী কোয়াটারনারি যুগের প্লিষ্টোসিন বিভাগ পর্যান্ত পৃথিবীর আবহাওয়া ক্ষেত্র হিসাবে পৃথকীকৃত হইয়া শীতপ্রধান ও গ্রীষ্মপ্রধান হইয়া উঠে নাই। প্লিষ্টোসিন যুগের পর ভূপৃষ্ঠে এক ভাঙ্গা-গড়ার আলোড়ন দেখা দেয়। তাহারই ফলস্বরূপ ভূপৃষ্ঠের আবহাওয়ায় এক বিষম পরিবর্ত্তন ঘটে। এই পরিবর্ত্তন উত্তর মেরুতে সমধিকরূপে প্রকটিত হইয়া তথায় এক ভয়ঙ্কর তুষার যুগের সৃষ্টি করে। সেই তুষার যুগে উত্তর আমেরিকা, গ্রীনল্যাণ্ড হইতে স্কাণ্ডিনেভিয়া, উত্তর সাগর, ইংলণ্ড (টেম্‌স নদীর উপকূল), জার্ম্মানী, রাশিয়া (মস্কো) এবং উরল পর্ব্বত পর্যান্ত বিস্তীর্ণ ১০ লক্ষ বর্গমাইল ভূভাগে শত শত ফিট্ গভীর তুষারপাত হইয়াছিল।

কোয়াটারনারি যুগের প্লিষ্টোসিন এবং তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী মাইওসিন বিভাগে মেরুপ্রদেশে বিস্তীর্ণ বাসযোগ্য ভূমি বর্ত্তমান ছিল এবং তৎকালীন পেলিওলিথিক মনুষ্য এবং জীবজন্তু তথায় সচ্ছন্দে বসবাস করিত। পরিমাপ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মেরুপ্রদেশের সমুদ্রের গভীরত্ব সর্ব্বত্রই ৬০০ ফিটেরও কম। ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় না ঘটিলে উহা আদৌ সমুদ্ররূপ ধারণ করিত কি না সন্দেহ।

মেরুপ্রদেশে ৬ মাস দিবা এবং ৬ মাস রাত্রি—আমরা এইরূপ জানি। ৬ মাস রাত্রির কল্পনা কষ্টকর বটে। সেই দীর্ঘ রাত্রি ব্যাপিয়া তথায় শুধু সূর্য্যালোকের অভাব হয় না, রাত্রির গভীরতার সহিত তাহার উত্তাপও হ্রস্বীভূত হইতে থাকে। কিন্তু মেরুপ্রদেশের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ দেখা যাউক।

সূর্যোদয়ের পূর্ব্বে এবং সূর্য্যাস্তের পরে পৃথিবীপৃষ্ঠে যে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়, তাহা বিষুবপ্রদেশে (equatorial region) দুই-এক ঘণ্টার জন্য মাত্র বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু মেরুপ্রদেশে এই আলোকরশ্মি ৯০ দিন (কাহারও কাহারও মতে ১২০ দিন) বর্ত্তমান থাকে। বিষুবপ্রদেশে সূর্য্যের অবস্থান যখন ক্ষিতিজ রেখার (horizon) ১৬° ডিগ্রি নীচে থাকে, তখনই তাহার আলোকরশ্মি ঊর্দ্ধে ব্যাপ্ত হয়, কিন্তু নাতিশীতোষ্ণপ্রদেশে ততোঽধিক ডিগ্রি নিম্ন হইতে সূর্য্যরশ্মি প্রক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ পৃথিবী পৃষ্ঠের উচ্চতর অক্ষাংশে (higher latitude) আলোকরশ্মির অবস্থান দীর্ঘতর এবং মেরুকেন্দ্রে দীর্ঘতম হয়। বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট ডক্টর ওয়ারেন মেরুপ্রদেশের একটি পূর্ণ বৎসরের দিবারাত্রির পরিচয় এইরূপ প্রদান করিয়াছেন—

"On the 16th March the sun rises, preceded by a long dawn of fortyseven days, namely, from the 29th January, when the first glimmer of light appears. On the 25th of September the sun sets and after a twilight of fortyeight days, namely, on the 13th November, darkness reigns supreme ; so far as the sun is concerned, for seventysix days, followed by one long period of light, the sun remaining above the horizon one hundred ninetyfour days. The year, therefore, is thus divided at the pole :—194 days sun ; 76 days darkness ; 47 days dawn ; 48 days twilight." —Paradise Found. Page 64.

তাৎপর্য্য—১৬ই মার্চ্চ সূর্য্যোদয়, তৎপূর্ব্ব ২৯শা জানুয়ারী হইতে প্রভাতকাল আরম্ভ ; ২৫শা সেপ্টেম্বর সূর্য্যাস্ত এবং তৎপরবর্ত্তী ৪৮ দিন ব্যাপী সন্ধ্যার পর ১৩ই নবেম্বর হইতে রাত্রির অভ্যাগম এবং ৭৬ দিন অবস্থিতি। মোটামুটি ১৯৪ দিন দিবা, ৪৭ দিন প্রাতঃকাল, ৪৮ দিন সন্ধ্যা এবং ৭৬ দিন রাত্রি, ইহার সমষ্টিই মেরুপ্রদেশের পূর্ণ একটি বৎসরের দিবারাত্রির চিত্র।

সুতরাং দেখা যায়, মেরুপ্রদেশের রাত্রিকাল আড়াই মাস মাত্র, ছয় মাস নহে। অধিকন্তু এই রাত্রিকালে মেরুজ্যোতি (Aurora Borealis) নামক এক প্রকার তড়িতের প্রকাশ হয় যাহা রাত্রির অন্ধকার বহুলাংশে হরণ করিয়া নৈশালোকে এক মনোরমতার সৃষ্টি করে। মেরুপ্রদেশের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পর্য্যালোচনায় হার্সেল উহাকে চিরবসন্তের সন্নিকটবর্ত্তী স্থল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান এবং তথা হইতে তাহাদের বহির্গমন সম্পর্কে বলেন—

আর্য্যজাতির আদিম জন্মভূমি

"It is upon Vedic passages and legends examined and the Avestic evidence discussed that we mainly rely for establishing the existence of the primeval Aryan home in the Arctic regions; when these both are taken together, we get direct traditional testimony for holding that the original home of the Aryans was destroyed by the advent of glacial epoch, and that the Indo-Iranians who were compelled to leave the country, migrated southwards and passing through several provinces of Central Asia, eventually settled in the valleys of the Oxus, the Indus, the Khuba, and the Rasa, from which region we see them again migrating,—the Indians to the East and the Persians to the West."—Arctic Home in the Vedas, Page—390.

তাৎপর্য্য—বৈদিক গবেষণা এবং আভেস্তার সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর প্রধানতঃ

নির্ভর করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, আর্য্য জাতির আদিম নিবাস উত্তর মেরুপ্রদেশে অবস্থিত ছিল। উভয়টি পুস্তকের সারবত্তা একত্রে গ্রহণ করিলে এই প্রমাণই অভিলব্ধ হয় যে, তুষার যুগের সমাগমে তাহাদের বাসস্থান ধ্বংসীকৃত হইলে তাহারা তদ্দেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া দক্ষিণাভিমুখে অবতরণ করেন এবং মধ্য-এশিয়ার কয়েকটি প্রদেশ অতিক্রম করিয়া অক্সাস, সিন্ধু, কুভা এবং রসা নদীর উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেন। সেই স্থান হইতে ভারতীয় আর্য্যগণ পূর্ব্বদিকে এবং পারসিক আর্য্যগণ পশ্চিমদিকে ক্রমে গমন করেন।

আর্য্যজাতির শ্রেষ্ঠত্বের ক্রম-বিকাশস্থল

পৃথিবীর যে সকল মহামানব মানব-জাতির আদর্শ-রূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়া তাহাদের অন্তরের অর্ঘ্য গ্রহণ করতঃ তাহাদিগকে সন্দীপ্ত করিতেছেন, যীশুখৃষ্ট এবং হজরত মোহাম্মদকে বাদ দিলে দেখা যায়, তাঁহাদের প্রায় সকলেই ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সেই সকল ঈশ্বর-তুল্য মহামানবগণকে বাদ দিলেও ভারতবর্ষে এত অধিক ঋষি, মুনি, সাধু, সন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের সংখ্যা নিরূপণ এক কঠিন ব্যাপার। মধ্য এশিয়ায় যাযাবর-জীবন অতিবাহিত করার পর আর্য্যগণের যে শাখা সিন্ধুনদীর তীরে আসিয়া বসতি স্থাপন করতঃ ভারতীয় আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া ধর্ম্মে, সমাজে, বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রে, কাব্যে ও সাহিত্যে যে ক্রমোৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, যাহার তুলনা অপরাপর আর্য্যশাখা অধ্যুষিত দেশে পরিদৃষ্ট হয় না—তাহার মূলে আছে, ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে মানবত্ব-বোধের বিস্তৃতি। এই বোধের বিকাশমানতা শুধু কালোপযোগিতা দ্বারাই সাধিত হয় না, স্থানের প্রভাব অত্যধিকরূপে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। সুতরাং আর্য্যরক্তের শ্রেষ্ঠত্বের ক্রম-বিকাশস্থল যে ভারতবর্ষ, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না।

(৪)

আর্য্যশাস্ত্রের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয়

"মৎস্যঃ কূর্ম্মোবরাহশ্চ নরসিংহোঽথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ॥"

আমাদের পুরাণকার এইরূপে দশাবতারের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া যে সত্যের ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার ভিতর অভিব্যক্তিবাদ উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট। তাহারই সূত্র ধরিয়া নবীনচন্দ্র 'রৈবতক' কাব্যে লিখিয়াছেন,—

"প্রথম সলিলে মৎস্য। এই নীতি বলে
সলিল পঙ্কিল যবে, কূর্ম্ম অবতার।
পঙ্ক দৃঢ়তর যবে আচ্ছন্ন উদ্ভিদে
হইল বরাহ সৃষ্টি। প্রাণীর শৃঙ্খল
ক্রমশঃ উন্নতিচক্রে হয়ে দীর্ঘতর
নরসিংহ। বিস্ময় মুরতি—অর্দ্ধপশু
অর্দ্ধনর। ক্রমে পশুভাগ
তিল তিল যুগে যুগে হইয়া অন্তর
বিকৃত মানব-মূর্ত্তি জন্মিল বামন।
তিন পদ ভূমি নাহি মিলিল তাহার,
জগৎ অরণ্যময় হিংস্র জন্তু বাস!
ঘুরিল উন্নতি চক্র—সকুঠার কর আ[illegible]।
পরশুরাম। সেই পশুভাব যে দিন হইতে
হ্রাস হইতে লাগিল, সেই দিন জগতের
যুগ বর্ত্তমান হইল সঞ্চার। অশ্রান্ত
উন্নতি পক্ষে আসিলা রামচন্দ্র—
প্রীতি অবতার......"

ডারুইনের আবিষ্কারের মর্ম্ম প্রাণীর বিবর্দ্ধন-ধারা এক হইতে অপরে অধিরোহণ করিয়া ক্রমাভিব্যক্ত হইয়াছে—ইহা যেরূপ সত্য, সেইরূপ ইহাও সত্য যে, আমাদের পুরাণোক্ত মৎস্যাদি প্রাণী-কেন্দ্র দ্বারা পৃথিবীর এক একটা পর্ব্ব এবং বিবর্দ্ধমান প্রাণন-ধারার এক একটা বিশেষ পর্য্যায়ই সূচিত হইতেছে।

"They mark stages in the evolution of the world, they mark new departures in the growth of developing life"—Ibid.

ভূবিজ্ঞান পৃথিবীর যে যুগকে প্রাচীনতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই আরশিয়ান যুগের কোন প্রাণীর চিহ্ন আবিষ্কৃত হয় নাই। তৎপরবর্ত্তী পেলিওজোইক স্তরে মৎস্য এবং সরীসৃপ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। সরীসৃপের প্রতিভূ কূর্ম্ম; সুতরাং পুরাণোক্ত মৎস্যযুগ (Ascidian evolution) এবং কূর্ম্মযুগকে (Amphibian evolution) ভূবিজ্ঞান বিঘোষিত পেলিওজোইক স্তরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিতে পারি। তৎপরবর্ত্তী মেসোজোইক স্তরে স্তন্যপায়ী প্রাণীর উৎপত্তি হয়। ইহার প্রতিভূ বরাহ। সুতরাং বরাহযুগকে (Mammalian evolution) মেসোজোইক স্তরের নামান্তর বলা যাইতে পারে। তৎপরবর্ত্তী কাইনোজোইক স্তরের মাইওসিন বিভাগে মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট বানর এবং প্লাইওসিন বিভাগে মানবের আবির্ভাব হয়। সুতরাং পুরাণোক্ত নৃসিংহ এবং বামনযুগকে ভূবিজ্ঞানের কাইনোজোইক স্তরের অন্তর্গত বলিয়াই ধর্ত্তব্য। পরশুরাম, রাম এবং কৃষ্ণ যে যে যুগের প্রতীক-সত্তা বা কেন্দ্রপুরুষরূপে পরিকীর্ত্তিত, সেই সেই যুগ ভূবিজ্ঞান ঘোষিত আধুনিক বা পোষ্ট-গ্লেশিয়াল যুগেরই অন্তর্ভুক্ত।

ভাগবত শেষাবতার সম্পর্কে প্রথম স্কন্ধে সংক্ষেপে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন :—

"অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যু-প্রায়েষু রাজসু
জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ॥"

ইহার ভাবার্থ এই যে, যুগসন্ধিতে পৃথিবী অত্যাচারে প্রপীড়িত হইলে বিশ্বপ্রতীকরূপে জগৎপতি কল্কি আবির্ভূত হইবেন; মোটকথা, তখন যুগধর্ম্মের আর একটি ক্রম অভিব্যক্তি লাভ করিবে।

মোটামুটিভাবে ভূবিজ্ঞানের স্তর-পারম্পর্য্যের সহিত নিম্নোক্তভাবে পুরাণোক্ত যুগসমূহের সমন্বয় সাধন করা যাইতে পারে :—

ভূবৈজ্ঞানিক যুগ		পৌরাণিক যুগ
পেলিওজোইক	=	মৎস্য ও কূর্ম্ম যুগ
মেসোজোইক	=	বরাহ যুগ
কাইনোজোইক	=	নৃসিংহ ও বামন যুগ
আধুনিক বা পোষ্ট গ্লেশিয়াল	=	পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি যুগ

যোনি-ভ্রমণ সম্বন্ধে বৃহৎবিষ্ণুপুরাণ বলেন—

"স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নব লক্ষকং।
কূর্ম্মাশ্চ নবলক্ষঞ্চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ ॥
ত্রিংশ লক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ ॥
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য তৎ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥"

—প্রথমে স্থাবর (বৃক্ষাদি), পরে ক্রমিকরূপে জলজ (মৎস্যাদি), কূর্ম্ম (জলচর ও স্থলচর), পক্ষী ও পশুজন্ম ; তৎপর বানরজন্ম এবং বানরজন্মের পর মানবজন্ম অভিলব্ধ হয়।

ডারুইন তাঁহার 'অরিজিন্ অব স্পেসিস্' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "I believe that animals are descended from, at most, only four or five progenitors, and plants from an equal or lesser number. Analogy would lead me one step further, namely, to the belief that animals or plants are descended from one prototype."

তাৎপর্য্য—জঙ্গমজগৎ ঊর্দ্ধসংখ্যায় চার পাঁচ রকমের আদি শ্রেণী এবং স্থাবরজগৎ তৎসংখ্যক বা আরও কম সংখ্যক আদিশ্রেণী হইতে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। স্থাবর-জঙ্গমের সাদৃশ্য

আমাকে আরও এক পদ অগ্রসর করিয়া দিতেছে, অর্থাৎ আমাকে এই বিশ্বাসে লইয়া যাইতেছে যে, স্থাবর এবং জঙ্গম দুই আদি শ্রেণী হইতে জন্ম লাভ করে নাই, উহারা একই আদি শ্রেণী হইতে ক্রমাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

আর্য্যঋষির যোনি-ভ্রমণ-তত্ত্বের মূলদেশের সহিত ডারুইন ঘোষিত এই তত্ত্ব সামঞ্জস্যবিহীন নহে।

বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠত্ব

আর্য্যশাস্ত্র মানবদেহকে প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—নির্ম্মল চৈতন্যদেশ (Spiritual region), ব্রহ্মাণ্ড (Region of universal mind) এবং পিণ্ড (Material region) ; অপর ভাষায়—চৈতন্য, মন ও জড় অথবা কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল। খৃষ্টধর্ম্মগ্রন্থ নিউ টেষ্টামেন্টের প্রথমেই আছে,—"In the beginning there was the word, word was with God and word was God"—আদিতে একমাত্র শব্দ ছিল, শব্দ ঈশ্বরে প্রোথিত ছিল এবং ঈশ্বর শব্দরূপে ব্যক্ত হইয়াছিলেন। উপনিষদের সারতত্ত্বও তাহাই। যে আদি শব্দ চৈতন্য, মন ও জড়ের সৃষ্টি করিয়াছে, সেই শব্দের বিপরীত ধারা অবলম্বনে অর্থাৎ জড়, মন ও চৈতন্যের অতিক্রমণে আমাদিগকে সেই শব্দে প্রত্যাগমন করিতে হইবে, ইহাই সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রগ্রন্থের মূল কথা। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই যুগে যুগে মানব মহত্তর উপলব্ধিকে লাভ করিয়াছেন। বৃদ্ধ মাতৃস্মৃতি-কেন্দ্র হইতে দূরতম স্থানে চলিয়া যায় বটে, কিন্তু বাল্য যৌবন, প্রৌঢ়—এই তিন অবস্থার সম্মিলিত জ্ঞানের বিকাশ তাহাতেই মূর্ত্তিমান্ হয়। সেইরূপ বর্ত্তমান যুগ শব্দ-কেন্দ্র হইতে দূরতম স্থানে অধিষ্ঠিত বলিয়া উহা পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু সৃষ্টির বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়—এই তিন অবস্থার সম্মিলিত জ্ঞানের বিকাশ তাহাতেই মূর্ত্তিমান্ হইবে। এই জন্যই পুরাণকার বর্ত্তমান কলি-যুগের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। অভিব্যক্তিবাদের অলঙ্ঘ্য বিধানানুসারে পুরাণকারের এই অভিমতকে কিছুতেই উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না।